সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-ক-খ

ভাসিলি ক্রাপিভিন

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী

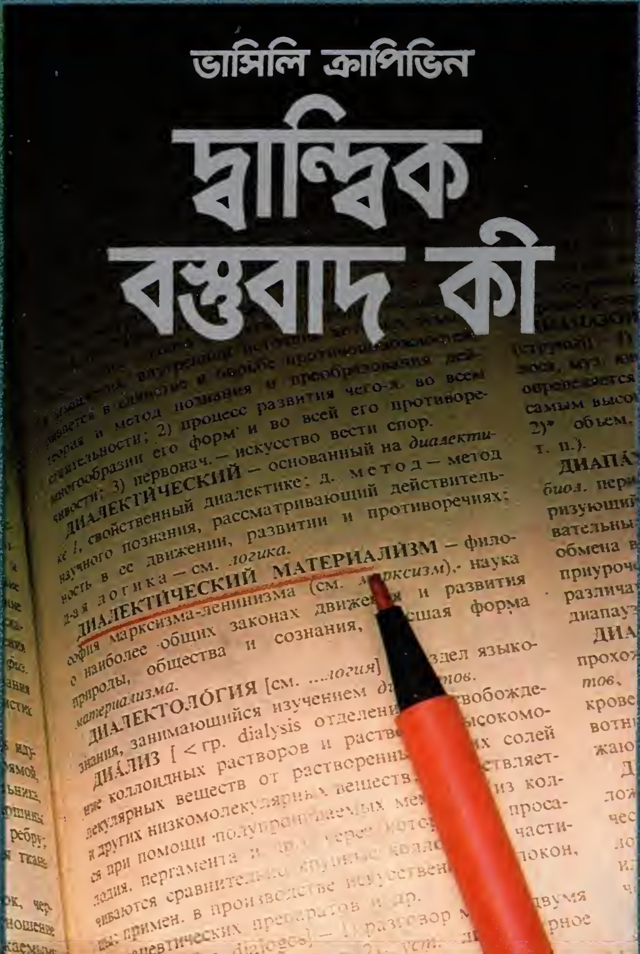

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ·আ·ক·খ

ভাসিলি ক্রাপিভিন

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: প্রফুল্ল রায়

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলী: ফ. ভলকভ (প্রধান সম্পাদক), ইয়ে. গুবস্কি (প্রধান সহসম্পাদক), ফ. বুর্লাৎস্কি, ভ. জোতভ, ভ. ক্রাপিভিন, ইউ. পোপভ, ভ. সোবলেভ, ফ. ইউরলভ

АВС социально-политических знаний

В. Крапивин

ЧТО ТАКОЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛИЗМ

на языке бенгали

ABC of Social and Political Knowledge

V. Krapivin

WHAT IS DIALECTICAL MATERIALISM?

In Bengali

© Progress Publishers, 1985

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৯

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

К $\frac{0301040100-741}{014(01)-88}$ 242 —89

ISBN 5-01-001402-5

সূচী

মুখবন্ধ ৭

প্রসঙ্গ ১। দর্শন, তার উপজীব্য বিষয় ও সমাজে তার ভূমিকা ১৪
১। এক বিজ্ঞান হিসেবে দর্শন ১৪
২। দর্শনের বুনিয়াদী প্রশ্ন ১৮
৩। পদ্ধতির ধারণা। বিপরীত দার্শনিক পদ্ধতি হিসেবে ডায়ালেকটিকস ও অধিবিদ্যা . ২৩
৪। মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের বিষয়বস্তু . ২৬
৫। দর্শনের পক্ষভুক্তিমূলক চরিত্র ২৯

প্রসঙ্গ ২। দর্শনের ইতিহাস — বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস ৩৪
১। বস্তুবাদ ও ভাববাদের উৎস, তাদের নিয়ত সংগ্রাম ৩৪
২। দাস-মালিক সমাজে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংগ্রাম ৩৮

৩। মধ্যযুগীয় দর্শনে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংগ্রাম ৫০
৪। উদীয়মান পুঁজিবাদের যুগে বস্তুবাদ, এবং ধর্ম ও ভাববাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম . ৬৩
৫। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ও ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ক্লাসিকাল জার্মান দর্শন . . ৭৩
৬। ১৯শ শতাব্দীর রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের দর্শন ৭৯

প্রসঙ্গ ৩। মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের আত্মপ্রকাশ ও তার বিকাশের প্রধান প্রধান পর্যায় ৮৩
১। মার্কসীয় দর্শনের আত্মপ্রকাশের পূর্বশর্ত ৮৩
২। দর্শনে মার্কস ও এঙ্গেলস-কৃত বিপ্লবের সারমর্ম ৯৩
৩। মার্কসীয় দর্শনের সৃষ্টিশীল চরিত্র . ৯৬

প্রসঙ্গ ৪। বস্তু ও তার অস্তিত্বের রূপগুলি ১০৩
১। বস্তু কী? ১০৩
২। গতি — বস্তুর অস্তিত্বের ধরন ১১০
৩। গতিশীল বস্তুর অস্তিত্বের রূপ হিসেবে স্থান ও কাল ১১৪
৪। পৃথিবীর বস্তুগত ঐক্য ১১৮

প্রসঙ্গ ৫। চৈতন্য, তার উদ্ভব ও সারমর্ম ১২২
১। চৈতন্য সম্বন্ধে প্রাক-মার্কসীয় প্রত্যয়গুলি ১২২
২। প্রতিফলনের সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে চৈতন্য ১২৪
৩। চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ ১৩০
৪। চৈতন্যের সারমর্ম ১৩৬
৫। চৈতন্য ও ভাষার ঐক্য ১৪১

প্রসঙ্গ ৬। সার্বিক সংযোগ ও বিকাশের মতবাদ হিসেবে ডায়ালেকটিকস ১৪৬

১। একটি বিজ্ঞান হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস ১৪৬
২। ডায়ালেকটিকসের মূল নীতিগুলি . . ১৫৩
৩। বাস্তবের অবধারণা ও রূপান্তরের বিশ্বজনীন পদ্ধতি হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস . ১৬১

প্রসঙ্গ ৭। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের নিয়মগুলি . ১৭২
১। বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রামের নিয়ম . ১৭২
২। পরিমাণের গুণে রূপান্তরের নিয়ম . . ১৮৪
৩। নিরাকরণের নিরাকরণ সংক্রান্ত নিয়ম . ১৯৪

প্রসঙ্গ ৮। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের মূল প্রত্যয়গুলি ২০৬
১। একক, সুনির্দিষ্ট ও সামান্য (সার্বিক) . ২০৭
২। আধেয় ও আধার ২১২
৩। অন্তঃসার ও প্রতিভাস ২২০
৪। কার্য ও কারণ ২২৫
৫। আবশ্যিকতা ও আকস্মিকতা ২৩১
৬। সম্ভাবনা ও বাস্তব ২৩৭

প্রসঙ্গ ৯। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্ব ২৪৩
১। অবধারণা: মানবচৈতন্যে বাস্তবের প্রতিফলনের একটি প্রক্রিয়া ২৪৩
২। অবধারণার দ্বান্দ্বিকতা ২৪৫
৩। সত্য সম্বন্ধে মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদ ২৫৪
৪। অবধারণায় কর্মপ্রয়োগের ভূমিকা . . ২৬০

প্রসঙ্গ ১০। বৈজ্ঞানিক অবধারণার পদ্ধতি ২৬৪
১। বৈজ্ঞানিক অবধারণার পদ্ধতি-তন্ত্র . . ২৬৪
২। অবধারণার অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি . . ২৭০
৩। অবধারণার তত্ত্বগত পদ্ধতি ২৭৬

উপসংহার ২৯৮
প্রচলিত কয়েকটি দার্শনিক পরিভাষা ৩০৬

মুখবন্ধ

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, মানবজাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীরা মহাবিশ্বকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া ও ব্যাপারগুলির রহস্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন।

পৃথিবী সম্বন্ধে এক বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধির দিকে যাওয়ার জন্য মানবজাতির পথটা ছিল দীর্ঘ ও সর্পিল। অজ্ঞতা আর রহস্যবাদিতার বিরুদ্ধে, সুপ্রাচীন ধর্মীয় মতান্ধতা আর ভাববাদী অভিমতের বিরুদ্ধে এক তিক্ত সংগ্রামে মানবজাতি প্রকৃত জ্ঞানের কণিকাগুলি সঞ্চয় করেছে, পারিপার্শ্বিক জগতের — প্রকৃতি, সমাজ ও জ্ঞানের, মানুষের অন্তঃসার ও পৃথিবীতে তার স্থানের এক সত্যকার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার

আরও কাছাকাছি এসেছে। এক শতাব্দীর মাত্র অল্প কিছুকাল বেশি হল, মানবজাতির অন্বেষণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

অতীতের বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক কৃতিত্বগুলির সমালোচনাত্মক ও সৃষ্টিশীল বিশ্লেষণের সাহায্যে কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস এক অখণ্ড ও সুসংগতভাবে বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ সূত্রায়িত করেন, তার তাত্ত্বিক ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দর্শন। মার্ক্স ও এঙ্গেলস-সৃষ্ট দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন: 'মার্ক্সের দর্শন এক পরিপূর্ণ দার্শনিক বস্তুবাদ, যা মানবজাতিকে, ও বিশেষত শ্রমিক শ্রেণীকে জ্ঞানের শক্তিশালী হাতিয়ার যুগিয়েছে।'*

দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠাতারা প্রমাণ করেন যে পুঁজিবাদের অধীনে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি শ্রমিক শ্রেণীর ও অন্য সমস্ত শোষিত জনসাধারণের স্বার্থ ও ঐতিহাসিক কর্মব্রতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, একমাত্র শেষোক্তরাই সমাজের এক বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনে আগ্রহী এবং, ফলত, আগ্রহী দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী দর্শনে, যা 'সারমর্মে সমালোচনাত্মক ও বৈপ্লবিক'।** সেই জন্যই প্রলেতারিয়েত মার্ক্সীয় দর্শন গ্রহণ করেছে তার আত্মিক অস্ত্র হিসেবে।

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 19, Progress Publishers, Moscow, 1977, p. 25.

** Karl Marx, *Capital,* Vol. 1, Progress Publishers, 1974, p. 29

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন-কর্তৃক সৃষ্টিশীলভাবে বিকশিত মার্কসীয় দর্শন ইতিহাসে সর্বপ্রথম হয়ে উঠেছে শ্রমজীবী জনসাধারণের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, পৃথিবীর বৈপ্লবিক পুনর্নবায়নের এক তত্ত্বগত হাতিয়ার।

আমাদের কালে, পৃথিবীর বৈপ্লবিক পুনর্নবায়ন এক সত্যকার আবিশ্ব প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে। সামাজিক জীবনে, বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় মহিমময় বৈপ্লবিক রূপান্তরগুলি সকল মহাদেশের সকল জাতির সামাজিক বিকাশকে প্রভাবিত করেছে। শেষ শোষণমূলক ব্যবস্থা পুঁজিবাদ তার অবশ্যম্ভাবী অবসানের নিকটবর্তী হয়েছে। অতীত প্রজন্মগুলি মনশ্চক্ষে যাকে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমানতার এক সমাজ হিসেবে কল্পনা করেছিল, সেই সমাজতন্ত্র এখন এক বাস্তব শক্তি হয়ে উঠেছে, এবং বিশ্ব বিকাশের সমগ্র গতিধারার উপরে আরও বেশি নিয়ামক প্রভাব বিস্তার করছে।

রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের জয় বিশ্ব ইতিহাসে নিয়ে এসেছিল এক নবযুগ, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে উত্তরণের যুগ। সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও আভ্যন্তরিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামে, সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী জনগণের সমর্থনপুষ্ট সোভিয়েত শ্রমজীবী জনগণ প্রথমতম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ফাশিবাদ ও জাপানী সমরবাদের পরাজয়ের ফলে — যে পরাজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন্দ্রী ভূমিকা পালন করেছিল — এবং শ্রমিক শ্রেণীর

আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের ফলেও, শ্রমজীবী জনগণ বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং বছরের পর বছর শক্তিশালী হচ্ছে, সারা পৃথিবীকে দিচ্ছে এক বৈপ্লবিক প্রেরণা। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন গতিবেগ সঞ্চয় করছে। পুঁজিবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং তার ধ্বংসস্তূপের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কয়েক ডজন স্বাধীন রাষ্ট্র। আরও অধিকতর সংখ্যক এই সমস্ত রাষ্ট্র পুঁজিবাদকে বাতিল করে সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীনতা বেছে নিচ্ছে। জোট-বহির্ভূত আন্দোলনের ভিতরকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলি বিশ্ব রাজনীতিতে ক্রমেই বৃহত্তর ভূমিকা পালন করছে।

বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের এবং জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক শৃঙ্খল-মোচনের জন্য জাতিসমূহের আন্দোলনের সাফল্যগুলি বিতর্কাতীত। কিন্তু সেইসমস্ত সাফল্য অর্জিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদ বহু রণাঙ্গনে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছে এবং নিজের অবস্থানগুলি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তা সামরিক বিপদের উর্বর ক্ষেত্রগুলিকে জীইয়ে রাখছে এবং 'ঠাণ্ডা যুদ্ধের' নিকৃষ্টতম দিনগুলির আবহাওয়া ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। নিজেদের দেশে বর্ধিষ্ণু প্রতিক্রিয়া আর অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরিক বিষয়ে

স্থূল হস্তক্ষেপের সাফাই গাওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শবাদীরা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে 'মানবাধিকার রক্ষার' আর 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের' বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধ্বনি তুলে চলেছে। ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় পরিশীলিততম ও জঘন্যতম অতিবিধ্বংসী অস্ত্রের বিকাশ ঘটিয়ে পুঁজিবাদ মনুষ্যবিরোধী উদ্দেশ্যসাধনে বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতির অপব্যবহার বাড়িয়ে তুলেছে, এবং পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক নজির থেকে দেখা যায় যে জাতিসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তার সংগ্রামে সমাজতন্ত্রই প্রধান শক্তি, সমাজতন্ত্রই মানবজাতির সামনের বুনিয়াদি সমস্যাগুলি সমাধান করতে সক্ষম। তাই, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাব-ধারণা যে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে, তা খুবই স্বাভাবিক। সেই জন্যই সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি ও কোটি কোটি মানুষ আরও বেশি জানতে চেষ্টা করছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ সম্পর্কে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আর তার বিশ্ববীক্ষাগত ও পদ্ধতিতত্ত্বগত ভিত্তি: দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দার্শনিক মততন্ত্রের মর্মবস্তু। বিশ্বজনীন নিয়মগুলিকে এবং প্রকৃতি, সমাজ ও জ্ঞানের গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলিকে বেষ্টন করে দার্শনিক সামান্যীকরণের সর্বোচ্চ স্তর তাতে মূর্ত।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের প্রশ্নটি সারগতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষে, মার্কস ও এঙ্গেলস যখন তার মূল নীতিগুলি সূত্রবদ্ধ করেছিলেন। সেই প্রশ্নটি সম্বন্ধে বিতর্ক একটা তীব্র মোড় নিয়েছিল আমাদের শতাব্দীর শুরুতে, যখন ভাববাদীরা বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের বিরুদ্ধে সামনাসামনি আক্রমণ চালিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে, যখন বিষয়ীমুখ ভাববাদকে মার্কসবাদের দর্শন বলে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে জেনেভায় একটি লেকচার আলোচিত হচ্ছিল, তখন লেনিন লিখেছিলেন: 'লেকচারার কি স্বীকার করেন যে মার্কসবাদের দর্শন হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ?'* বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের প্রশ্নটি আজকের দিনের বিজ্ঞানের পক্ষে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে মানবজাতির উত্তরণের গতিপথে সমগ্র সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মপ্রয়োগের পক্ষে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিপ্লবের বিকাশ এবং সব শেষে, পৃথিবীতে ভাবাদর্শগত সংগ্রামে কেন্দ্রী বিষয় হয়ে উঠেছে।

আজকের দিনের সব রকমের বিজ্ঞানী, রাজনীতিক ও ভাবাদর্শবাদীরা এবং আধুনিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রের ব্যবহারজীবীরা বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির অন্তঃসার হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের শরণাপন্ন হচ্ছেন। কেউ তাকে গণ্য করেন অবধারণার এক নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলে, যা

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 14, 1977, p. 15.

আজকের দিনের বিষয় ও ঘটনাগুলি বুঝতে এবং বিজ্ঞান ও কর্মপ্রয়োগের দ্বারা উপস্থাপিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর পেতে সাহায্য করে। অন্যরা বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের শরণ নেন তার বনিয়াদগুলিকে দুর্বল করার জন্য, এটা দেখানোর জন্য যে তার উপরে অবলম্বন করে যে মতবাদ ও সামাজিক আদর্শগুলি দাঁড়িয়ে আছে এবং সেগুলি বাস্তবায়নের উপায় ও পদ্ধতিগুলি ত্রুটিপূর্ণ। অন্যরা আবার চেষ্টা করেন তাঁদের নিজেদের ধারণাগুলি খাড়া করার জন্য, সেগুলিকে একটা বিজ্ঞানসম্মত চেহারা দিয়ে আরও চিত্তাকর্ষক করার জন্য বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের কোনো কোনো প্রতিজ্ঞাকে ব্যবহার করতে।

এই বইটির উদ্দেশ্য হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের একটি জনবোধ্য সংক্ষিপ্তসার দেওয়া, বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের মূল নীতি, নিয়ম ও সংজ্ঞাগুলি ব্যাখ্যা করা এবং বিবেচিত সমস্যাগুলির এক দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী সমাধানের বিশ্ববীক্ষাগত ও পদ্ধতিতত্ত্বগত গুরুত্ব দেখানো।

এই বইটির রচনাকালে সাহায্য, গঠনমূলক মন্তব্য ও পরামর্শের জন্য গ্রন্থকার কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির অধীনস্থ পার্টি-অভ্যন্তরস্থ শিক্ষা বিভাগের কর্মিবৃন্দ, এমপিএলএ — শ্রম পার্টির ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক শিক্ষা বিভাগের কর্মিবৃন্দ, ফ্রেলিমো পার্টির ভাবাদর্শগত বিভাগের কর্মিবৃন্দ, ড. অগস্তিনহো নেত্তো জাতীয় পার্টি স্কুল ও ফ্রেলিমো পার্টির কেন্দ্রীয় পার্টি স্কুলের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চান।

প্রসঙ্গ ১।

দর্শন, তার উপজীব্য বিষয় ও সমাজে তার ভূমিকা

১। এক বিজ্ঞান হিসেবে দর্শন

দর্শন হল প্রাচীনতম বিজ্ঞানগুলির অন্যতম। তা অন্য সমস্ত বিজ্ঞানের অনুরূপ এই দিক দিয়ে যে তা পারিপার্শ্বিক জগৎকে অধ্যয়ন করে, কিন্তু অন্য বিজ্ঞানগুলি থেকে তার তফাৎ হল পৃথিবী অধ্যয়নের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিতে: তার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিতে।

প্রতিটি বিশেষ বিজ্ঞান পারিপার্শ্বিক জগতের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ বা এলাকা, তার কতকগুলি সংযোগ ও সম্পর্ক অধ্যয়ন করে। যেমন, জীববিদ্যাগত বিজ্ঞানগুলি অধ্যয়ন করে জীবন ও তার নিয়মগুলিকে, উদ্ভিদ ও জীবজগতের বৈশিষ্ট্যগুলিকে। অর্থনৈতিক বিজ্ঞানগুলি বিবেচনা করে উৎপাদিকা শক্তি ও

উৎপাদন-সম্পর্ক বিকাশের চরিত্র, উৎপাদন ও বণ্টনের রূপ। শিক্ষাবিজ্ঞান হল লালনপালন ও শিক্ষার বিজ্ঞান, ইত্যাদি।

দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তা সর্বদাই চেষ্টা করেছে সামগ্রিকভাবে পারিপার্শ্বিক জগৎকে, তার প্রকৃতি ও অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে।

পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষেরই আছে নিজস্ব অভিমত, আর সেই অভিমত প্রায়শই টুকরো-টুকরো পরস্পরবিরোধী ধারণা দিয়ে তৈরি, পক্ষান্তরে দর্শন প্রকৃতি, সমাজ, মানুষ ও পৃথিবীতে তার স্থান সম্বন্ধে অভিমত, ভাবনা ও ধারণার একটা মততন্ত্র, নিতান্ত সেগুলির যোগফল নয়। অর্থাৎ, দর্শন একটা বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিস্বরূপ।

বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হল সেই সমস্ত নীতি, অভিমত ও প্রত্যয়ের সামগ্রিকতা, যেগুলি বাস্তব ও নিজের প্রতি মানুষের মনোভাবকে, প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ, সামাজিক গোষ্ঠী, শ্রেণী বা সামগ্রিকভাবে সমাজের ক্রিয়াকলাপের গতিমুখ নির্ধারণ করে। বিজ্ঞানসম্মত এক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হল বাস্তব সম্বন্ধে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-ভিত্তিক এক মততন্ত্র এবং ব্যক্তিমানুষকে তা বাস্তবের প্রতি সঠিক মনোভাব গ্রহণে সক্ষম করে তোলে। বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিমানুষের জ্ঞানকে পরিণত করে এক অখণ্ড ও সুসমঞ্জস মততন্ত্রে এবং তাকে যোগায় অবধারণার ও সমাজবিকাশের প্রয়োজনানুগ ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্মের এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল

বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতত্ত্বের ভিত্তি। বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সমস্ত নীতি, প্রতিজ্ঞা ও চাহিদার একটা পদ্ধতিতত্ত্বগত মাত্রা আছে। পদ্ধতিতত্ত্ব হল বাস্তবের অবধারণা ও রূপান্তরের পদ্ধতিসমূহ সম্বন্ধে এক দার্শনিক মতবাদ; অবধারণার ক্ষেত্রে, সাধারণভাবে সৃষ্টিশীল আত্মিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে ও কর্মপ্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির নীতিগুলির প্রয়োগ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতত্ত্ব হল বুনিয়াদি ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক সমস্যাবলীর সমাধানে প্রযুক্ত দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি। মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের সমস্ত পদ্ধতিতত্ত্বগত নীতি ও প্রতিজ্ঞা, নিজেদের দিক দিয়ে, বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পর্কিত।

দার্শনিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির একটা তত্ত্বগত চরিত্র আছে। এর মানে এই যে প্রধান প্রধান প্রতিজ্ঞা, ভাব ও ধারণা বৈধ বলে প্রতিপন্ন হয় ও সমর্থিত হয় বাস্তব ঘটনা, মানুষের অভিজ্ঞতা আর বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের যোগানো তথ্য দিয়ে।

বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্যে আছে অবৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, যা নির্ভর করে হয় পৃথিবী সম্বন্ধে এক স্বতঃস্ফূর্ত সজাগতার উপরে (তথাকথিত প্রাত্যহিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি), না হয় ভ্রান্ত ধারণার উপরে (বিভিন্ন ভাববাদী ধারণা), আর তা না হয় পৃথিবী সম্বন্ধে এক ধর্মীয়-পৌরাণিক অভিমতের উপরে (ধর্মীয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি)।

প্রগতিশীল-মনস্ক লোকেদের পক্ষে অর্থনৈতিক,

রাজনৈতিক ও আত্মিক জীবনের জটিল সমস্যাগুলির রহস্যোদ্ঘাটনে সক্ষম হতে পারা, নিজেদের অবস্থান সূত্রবদ্ধ করতে ও সমগ্র সমাজবিকাশের ধারার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হওয়া সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির মধ্যে বেষ্টিত থাকা উচিত শুধু বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বুনিয়াদি সমস্যাগুলিই নয়, বরং দৈনন্দিন মানবিক ক্রিয়াকলাপও। যেমন, বিভিন্ন কুসংস্কার, পূর্বাহ্লে-কৃত ধারণা ও কিছু কিছু সেকেলে অচল ঐতিহ্য যে নির্দোষ, ক্ষতিহীন মোটেই তা নয়। সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সেগুলির ফলে শুধু যে অক্রিয় অবস্থান, নিজের শক্তিতে আস্থাহীনতা বা আকস্মিক দৈব ঘটনার উপরে নির্ভরশীলতা দেখা দিতে পারে তাই নয়, বিকৃত অভিমত ও ধারণাও জন্মাতে পারে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান-ভিত্তিক এক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিই নিয়ত পরিবর্তমান পৃথিবীতে একজন ব্যক্তিকে তার স্থিতিনির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে। লেনিন বলেছিলেন যে মার্কসীয় তত্ত্বের পথ অনুসরণ করেই আমরা বিষয়গত সত্যের আরও কাছাকাছি আসব, পক্ষান্তরে অন্য যে কোনো পথ মিথ্যা আর বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য।

বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হল ব্যক্তিমানুষের চৈতন্যের মর্মমূল, এবং তাই শিক্ষা প্রক্রিয়ায় তা নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিই নির্ধারণ করে ব্যক্তিমানুষের আত্মিক গুণ, রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ। তা হল একটা ত্রিশির কাচ,

যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানুষ পারিপার্শ্বিক বাস্তবকে দেখে ও প্রতিসরিত করে।

বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিমানুষের আত্মিক গড়নকে সংবদ্ধ করে এবং বাস্তব সম্পর্কে, রাজনীতির সমস্যাবলী, আত্মিক ও দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাবলী সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকে তত্ত্বগত ও পদ্ধতিতত্ত্বগত নীতিসমূহ যোগায়।

ব্যক্তিমানুষের আত্মিক গড়নের উপরে বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের গভীর প্রভাব পড়ে। তাই, ব্যক্তিমানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ তার সামাজিক অবস্থান ও ঘটনাপ্রবাহের উপরে নির্ভর করলেও, এগুলি একটা দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়াতে পারে শুধু তখনই, যখন সে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে, কেননা একমাত্র এরূপ এক দৃষ্টিভঙ্গিই সামাজিক সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও আদর্শগুলি সম্বন্ধে, তার উপায় ও পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে তাকে জ্ঞান দেয়।

বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হল, প্রথমত, দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের বস্তুবাদী উত্তর এবং, দ্বিতীয়ত, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। তা সর্বদাই বস্তুবাদী ও দ্বান্দ্বিক।

২। দর্শনের বুনিয়াদী প্রশ্ন

পারিপার্শ্বিক জগতে বিভিন্ন বস্তু, প্রক্রিয়া ও ব্যাপারগুলি সযত্নে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে সে সবগুলিই হয় বস্তুগত, না হয় ভাবগত, আত্মিক।

বস্তুগত হল সেইগুলি, যেগুলির অস্তিত্ব আছে বিষয়গতভাবে, অর্থাৎ মানব-চৈতন্যের বাইরে ও মানব-চৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে (যেমন মহাবিশ্ব, পৃথিবী, বিভিন্ন জীবগত, পদার্থগত, সামাজিক ব্যাপার, প্রভৃতি), আর যেগুলির অস্তিত্ব মানুষের চৈতন্যে এবং সংযুক্ত থাকে তার মানসিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে (চিন্তা, অনুভূতি, ভাবাবেগ, ইত্যাদি) সেগুলি হল ভাবগত বা আত্মিক। পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু, প্রক্রিয়া বা ব্যাপার নেই যা বস্তুগতও নয়, ভাবগতও নয়, অর্থাৎ যা বস্তুগত ও ভাবগত উভয় থেকেই পৃথক।

বস্তুগত ও ভাবগত, আত্মিক হল ভিন্ন ভিন্ন বাস্তব। কিন্তু সেগুলির মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও, এই বাস্তবগুলির মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সংযোগ, একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কের সারমর্মের প্রশ্নটি, বস্তু ও চৈতন্যের মধ্যে, বস্তুগত ও ভাবগতর মধ্যে সম্পর্কের সারমর্মের প্রশ্নটিই দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্ন। অন্য সমস্ত দার্শনিক সমস্যার সমাধান হয় সেই প্রশ্নের উত্তরসাপেক্ষে।

দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের দুটি দিক আছে। প্রথম, তা হল পৃথিবীর সারগত প্রকৃতি সম্পর্কে, মুখ্য কী — বস্তু না চৈতন্য সে সম্পর্কে: বস্তু চৈতন্যের জন্ম দেয় না তার উল্টো, সে সম্পর্কে প্রশ্ন। দ্বিতীয়, তা হল পৃথিবী অবধারণাযোগ্য কি না, মানবমন পারিপার্শ্বিক জগৎকে অনুধাবন করতে ও তার বিকাশের নিয়মগুলি আবিষ্কার করতে পারে কি না, সেই প্রশ্ন।

দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের প্রথম দিকটি বিবেচনা করা যাক।

বহু শতাব্দী ধরে বড় বড় চিন্তকরা অসংখ্য তত্ত্ব সূত্রায়িত করে ও বহুবিধ ধারা চালু করে (যেগুলি নিজেদের মধ্যে সর্বদাই ঘোরতর লড়াই করেছে) পৃথিবীর সারগত প্রকৃতি বুঝতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সমস্ত প্রভেদ সত্ত্বেও, তাঁদের নিয়েই মূলত গঠিত হয় দুটি বড় শিবির: বস্তুবাদী আর ভাববাদী।

যে দার্শনিকরা মনে করেন যে বস্তুই, প্রকৃতিই মুখ্য, আর চৈতন্য গৌণ এবং তা বস্তুগত সত্তার উপরে নির্ভর করে, তাঁদের নিয়ে বস্তুবাদীদের শিবিরটি গঠিত। তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তু চিরন্তন। তা কারও দ্বারা কোনো কালে সৃষ্ট হয় নি এবং পৃথিবীতে কোনো অতিপ্রাকৃত, দৈব শক্তি নেই। চৈতন্যের কথা বলতে গেলে, তা হল বস্তুর ঐতিহাসিক বিকাশের ফল। মানুষের উদ্ভবের সঙ্গে তা উদ্ভূত ও বিকশিত হয়।

যে দার্শনিকরা মনে করেন যে চৈতন্য, আত্মিক জীবনই মুখ্য, তাঁদের নিয়ে গঠিত ভাববাদী শিবিরটি। তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে, চৈতন্যের অস্তিত্ব রয়েছে বস্তু-নিরপেক্ষভাবে, চৈতন্যই বস্তুগত জগৎকে 'সৃষ্টি' করে ও নিয়ন্ত্রণ করে। চৈতন্য কীভাবে জগৎকে 'সৃষ্টি' করে, সে ব্যাপারে ভাববাদীদের মধ্যে মতভেদ আছে। বিষয়ীমুখ ভাববাদীরা মনে করেন যে জগৎ 'সৃষ্ট' হয় ব্যক্তিমানুষের, বিষয়ীর চৈতন্যের দ্বারা, পক্ষান্তরে বিষয়-মুখ ভাববাদীরা মনে করেন যে জগৎ 'সৃষ্ট' হয় কোনো এক ধরনের বিষয়গত চৈতন্যের দ্বারা, পৃথিবীর ও

স্বয়ং মানুষের বহিঃস্থ আত্মিক শক্তির দ্বারা।

তাই, দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের প্রথম দিকটির উত্তরসাপেক্ষে সব দার্শনিকই বিভক্ত দুটি শিবিরে: বস্তুবাদী ও ভাববাদী। দর্শনের সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যা সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে সর্বদাই এক আপোসহীন সংগ্রাম চলেছে ও চলছে। দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার যে কোনো প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য, ঠিক যেমন ব্যর্থ হতে বাধ্য বস্তুবাদ ও ভাববাদের ঊর্ধ্বে ওঠার কিংবা তাদের মধ্যে আপোস করাবার যে কোনো প্রচেষ্টা। এরূপ যে কোনো প্রচেষ্টা, লেনিনের কথায়, 'এক জাল ও ঘৃণ্য এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল'।*

বস্তুবাদ সর্বদাই ছিল প্রাগ্রসর, বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি। তা উপস্থিত করে পৃথিবীর এক সঠিক চিত্র, পৃথিবীকে দেখায় তা বাস্তবে যা সেইভাবে, এবং সমাজের প্রগতিশীল শ্রেণীগুলি তাকে ব্যবহার করেছে মানবজাতির প্রগতির স্বার্থে, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বার্থে।

ভাববাদ উপস্থিত করে পৃথিবীর, পারিপার্শ্বিক জগতের অবৈজ্ঞানিক, বেঠিক ব্যাখ্যা। ভাববাদ সর্বদাই ব্যবহৃত হয়েছে সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির দ্বারা। তা শোষকদের সেবা করেছে ও এখনও করে শ্রমজীবী জনগণের আত্মিক দাসত্ববন্ধনের হাতিয়ার হিসেবে, তাদের নিজেদের শাসনের যাথার্থ্যপ্রমাণ ও শক্তিবৃদ্ধি করার উপায় হিসেবে।

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 29, 1965, p. 505.

দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের দ্বিতীয় দিকটির উত্তর দিতে গিয়েও দার্শনিকরা দুটি বিপরীত শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। সুসংগত বস্তুবাদীরা যুক্তি দেন— এবং তাঁদের যুক্তি প্রতিপাদন করেন — যে জগৎ অবধারণাযোগ্য। তাঁরা মনে করেন যে পারিপার্শ্বিক জগতে বিষয়সমূহ, প্রক্রিয়াসমূহ ও ব্যাপারসমূহের সারমর্ম মানবমন উপলব্ধি করতে পারে। পৃথিবীর ব্যবহারিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে মানবজাতির কৃতিত্বগুলিই সবচেয়ে ভালোভাবে দেখায় যে তা পৃথিবী সম্বন্ধে এক সঠিক জ্ঞান লাভ করছে এবং সেই জ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছে।

বহু অধিবিদ্যা-মনস্ক বস্তুবাদী ও ভাববাদী এটা অস্বীকার করেন যে জগৎ জ্ঞেয়, কিংবা মনে করেন যে জ্ঞান সীমিত। এ'দের বলা হয় অজ্ঞাবাদী (agnostics)।* অন্য ভাববাদীরা এটা অস্বীকার করেন না যে জগৎ জ্ঞেয়, কিন্তু তা নিছক মৌখিক কথা ছাড়া আর কিছু নয়। পারিপার্শ্বিক জগৎকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করার পরিবর্তে, বিষয়ীমুখ ভাববাদীরা নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবাবেগের অবধারণার দিকে, এবং বিষয়মুখ ভাববাদীরা এক অস্তিত্বহীন অতিপ্রাকৃত 'জগতাত্মা', এক অতীন্দ্রিয়বাদী 'পরম ভাব', ইত্যাদির দিকে যান। আজকের দিনের গোটা বুর্জোয়া দর্শনই কিছুটা পরিমাণে অজ্ঞাবাদী। অজ্ঞাবাদ হল তাদের হাতে একটা অস্ত্র, যারা শোষণমূলক সমাজের পক্ষ

---

* গ্রীক agnōstos (অজ্ঞেয়) থেকে। — সম্পাঃ

সমর্থন ও তাকে রক্ষা করে, কেননা জগৎ যদি অজ্ঞেয় হয়, তবে তার বিকাশের নিয়মগুলি আবিষ্কারের চেষ্টা করা অর্থহীন। আর এই নিয়মগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞতা পৃথিবীর ব্যবহারিক বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনে বাধা দেয়, এবং এইভাবে শোষক শ্রেণীগুলির লাভের কারণ হয়।

৩। পদ্ধতির ধারণা। বিপরীত দার্শনিক পদ্ধতি হিসেবে ডায়ালেকটিকস ও অধিবিদ্যা

দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা সর্বদাই আরও একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন: পৃথিবীর ক্ষেত্রে কী ঘটছে? আজ যেমন তেমনই কি তা চিরকাল ছিল, না কি কোনোভাবে উদ্ভূত হয়েছে এবং পরিবর্তিত, পুনর্নবায়িত ও বিকশিত হয়ে চলেছে? ইতিহাসে সেই প্রশ্নটির যত উত্তর দেওয়া হয়েছে সেগুলি পড়ে দুটি বিপরীত গোষ্ঠীর মধ্যে: দ্বান্দ্বিক ও আধিবিদ্যক, এবং তৎসংশ্লিষ্ট দুটি পদ্ধতিকে বলা হয় ডায়ালেকটিকস ও অধিবিদ্যা।

পদ্ধতি কী? অবধারণা ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ চালানোর মধ্য দিয়ে লোকে নিজেদের সামনে নির্দিষ্ট কতকগুলি লক্ষ্য নির্ধারণ করে ও বিভিন্ন কর্তব্যকর্ম স্থির করে। এই সমস্ত লক্ষ্য অর্জন ও এই সমস্ত কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের উপায়, নির্দিষ্ট নীতিসমূহের এবং তত্ত্বগত গবেষণা ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ ধরনের সমাহার — এই সব মিলিয়েই হয় একটি পদ্ধতি।

একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহার না করে, কোনো বৈজ্ঞানিক বা ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান করা যায় না। পদ্ধতি এখানে এমন সমস্ত উপায়ের নিতান্ত একটা গুচ্ছ নয়, যেগুলি যে কোনো ঘটনাচক্রে কাজে লাগে। পদ্ধতির সারবস্তু অনেকখানি নির্ভর করে বিবেচ্য বস্তু বা ব্যাপারগুলির চরিত্রের উপরে, সেগুলির বিশিষ্ট সদৃশতার উপরে।

একটি দার্শনিক পদ্ধতি যে দিক দিয়ে বিশিষ্ট, তা এই যে ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার সর্বক্ষেত্রে, বিশ্বজনীন সমস্যাগুলির ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য, শুধু কিছু বিশেষ বিশেষ সমস্যা বা বাস্তবের ক্ষেত্রেই নয়।

পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডায়ালেকটিকসের অধিবক্তারা প্রথমত ধরে নেন যে সমস্ত পদার্থ, প্রক্রিয়া ও ব্যাপার পরস্পরসম্পর্কিত, সেগুলির মিথষ্ক্রিয়া ঘটে এবং সেগুলি পরস্পরকে শর্তাবদ্ধ করে; এবং দ্বিতীয়ত, সেগুলি রয়েছে নিয়ত গতি ও বিকাশের অবস্থায়। সেই বিশ্বজনীন পরস্পরসম্পর্কের মধ্যে ছাড়া, গতি ও বিকাশের মধ্যে ছাড়া কিছুই পৃথিবীতে থাকতে পারে না। বিকাশকে তাঁরা দেখেন পরিমাণগত পরিবর্তনগুলির এক সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া ও ফল হিসেবে, এবং গুণগত পরিবর্তনে সেগুলির রূপান্তরকে দেখেন কতকগুলি পদার্থ ও ব্যাপারের অন্য পদার্থ ও ব্যাপারে গুণগত পরিবর্তন হিসেবে; যা সেকেলে ও মরণোন্মুখ তার বিনাশ হিসেবে; এবং নতুনের উৎপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও শক্তিবৃদ্ধি হিসেবে। বিকাশের উৎস হল আভ্যন্তরিক

দ্বন্দ্ব, প্রতিটি পদার্থ ও ব্যাপারের সহজাত বিপরীত দিক বা প্রবণতাগুলির মধ্যে সংগ্রাম। ডায়ালেকটিকস এই মত পোষণ করে যে প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশের কারণ বা উৎস রয়েছে সেগুলির অভ্যন্তরে, বাইরে থেকে তা ঢোকানো হয় না।

বিপরীতপক্ষে, অধিবিদ্যার অধিবক্তারা প্রথমে ধরে নেন যে জগৎ সারগতভাবেই পরিবর্তনাতীত, প্রকৃতি কখনও পরিবর্তিত হয় না; এবং দ্বিতীয়ত, বস্তু ও ব্যাপারগুলির একটির অপরটির সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই, অর্থাৎ সেগুলির অস্তিত্ব থাকে বিচ্ছিন্নভাবে। পরিবর্তন ও বিকাশের প্রক্রিয়াকে তাঁরা দেখেন যা ইতিমধ্যেই রয়েছে তার মধ্যে নিছক বৃদ্ধি বা হ্রাস হিসেবে। তাঁদের কাছে বিকাশের উৎস রয়েছে হয় বিভিন্ন পদার্থের এক বাহ্যিক সংঘর্ষের মধ্যে, না হয় এক অতিপ্রাকৃত, দৈব শক্তির মধ্যে।

ডায়ালেকটিকস পৃথিবীকে দেখে তা বাস্তবিকই যেমন, সেইভাবে। উন্নয়নের প্রক্রিয়াসমূহ, সেগুলির কারণ ও রূপ ব্যাখ্যা করে, এবং নতুন যে অবশ্যম্ভাবীরূপেই জয়ী হবে তা দেখিয়ে, ডায়ালেকটিকস প্রগতিশীল বৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে সাহায্য করে সেকেলে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের জন্য তাদের সংগ্রামে।

বিপরীতপক্ষে, অধিবিদ্যা বিকাশের প্রগতিশীল চরিত্র ও নতুনের অবশ্যম্ভাবী বিজয়কে স্বীকার করে না, প্রগতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির স্বার্থের সেবা করে। তা

সংশোধনবাদ ও মতান্ধতার এক তত্ত্বগত বনিয়াদ যোগায়।

দৈনন্দিন জীবন, বিজ্ঞান ও সামাজিক কর্মপ্রয়োগ ডায়ালেকটিকসের সত্যতাকে এবং অবধারণা ও কর্মপ্রয়োগের এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে তাকে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করে। ডায়ালেকটিকসের প্রাণবত্তা সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশিত হয় আজকের দিনের সমাজবিকাশের দ্বারা। জাতিসমূহের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন, জাতীয় বিকাশের কর্তব্যকর্মগুলির রূপায়ণ, আত্মিক জীবনে গভীর পরিবর্তন, বহু যুগের পশ্চাৎপদতা থেকে বহু জাতির, গোটা মহাদেশের স্বাধীন ও প্রগতিশীল বিকাশের আধুনিক রূপগুলির দিকে অগ্রগমন এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট সব দৃষ্টান্ত।

৪। মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের বিষয়বস্তু

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, একটি বিজ্ঞান হিসেবে দর্শনের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। প্রথমে, তার আওতায় ছিল পৃথিবী সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞান। এঙ্গেলস যেমন বলেছিলেন, প্রাচীন দার্শনিকরা প্রকৃতিবিজ্ঞানীও, জায়মান বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞও ছিলেন।

পৃথিবী ও তার বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে অবধারণার ফলে উদ্ভব হয়েছিল বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের: জ্যোতির্বিদ্যা, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন,

জীববিদ্যা ও অন্যান্য। সেই সঙ্গেই, এই বিজ্ঞানগুলি থেকে দর্শন পৃথক হয়ে গিয়েছিল, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানতন্ত্রে তার ক্রিয়া ও স্থান সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত, দর্শনকে দেখা হত 'সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান' হিসেবে, অন্যান্য বিজ্ঞানের উপরে নিজের প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্তগুলি চাপিয়ে দেওয়ার স্বীকৃত অধিকার ছিল তার। দর্শনের বিষয়বস্তু, অন্যান্য বিজ্ঞানের মধ্যে তার স্থান ও সমাজে তার ভূমিকা সম্পর্কে বহুযুগের বিতর্কের বিজ্ঞানসম্মত মীমাংসা ঘটিয়েছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস, যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দর্শন।

দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠাতারা ধরে নিয়েছিলেন যে পারিপার্শ্বিক জগতের অবধারণা দর্শন ও অন্যান্য, নির্দিষ্ট বিজ্ঞান উভয়েরই উদ্দেশ্য। দর্শন ও নির্দিষ্ট, বিশেষ বিজ্ঞানগুলি, উভয়েই একই জগৎকে অধ্যয়ন করে। কিন্তু তাদের গবেষণার লক্ষ্যবস্তুতে একটি প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ এই ঘটনার দরুন যে পৃথিবীতে বিশ্বজনীন ও সুনির্দিষ্ট উভয়প্রকার নিয়মই আছে, যেগুলি যুগপৎ ক্রিয়া করে একই ব্যাপার ও প্রক্রিয়াসমূহের অভ্যন্তরে। প্রকৃতির পৃথক পৃথক ক্ষেত্র ও সমাজ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নিয়মগুলি অধীত হয় নির্দিষ্ট, বিশেষ বিজ্ঞানগুলির দ্বারা, আর বিশ্বজনীন নিয়মগুলি হল দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী দর্শনের উপজীব্য বিষয়।

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন হল বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণ তত্ত্বগত ভিত্তি। লোককে তা

যোগায় প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার নিয়মগুলি সম্পর্কে একটা জ্ঞান, পৃথিবীর ব্যবহারিক বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য যা প্রয়োজন। তাই, মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন হল এক বিজ্ঞান, যা দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের এক বস্তু-বাদী উত্তরের ভিত্তিতে বস্তুগত পৃথিবীর বিকাশের সবচেয়ে সাধারণ, দ্বান্দ্বিক নিয়মগুলিকে, তার অবধারণা ও বৈপ্লবিক রূপান্তরের উপায়কে প্রকাশ করে।

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের অন্যতম সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল বিশেষ বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে ও সামাজিক কর্মপ্রয়োগের সঙ্গে তার আন্তঃসম্পর্ক। এক দিকে, তা বিশেষ বিজ্ঞানগুলিকে ও সামাজিক কর্মপ্রয়োগকে পারিপার্শ্বিক জগতের অস্তিত্বের মূল নীতিসমূহ ও বিকাশের মূল নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান যোগায়। সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মানুষদের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপকে তা চালিত করে একমাত্র সঠিক পথটিতে। অন্য দিকে, তা সমৃদ্ধ ও মূর্ত-নির্দিষ্ট হয় বিশেষ বিজ্ঞানগুলির উপাত্ত ও সামাজিক কর্মপ্রয়োগ দিয়ে। বিরাট বিরাট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর প্রগাঢ় সামাজিক রূপান্তরগুলির এই যুগে মার্কসীয়-লেনিনীয় দার্শনিক প্রশিক্ষণ ব্যতীত সুসংগতভাবে বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক অবস্থান গ্রহণ করা অসম্ভব। সেই জন্যই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি শ্রমজীবী জনগণের ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক শিক্ষার দিকে এবং তাদের কর্মীদের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী তালিমের দিকে এত মনোযোগ নিয়োজিত করে। বিশ্ববীক্ষাগত ও পদ্ধতিতত্ত্বগত প্রশিক্ষণ নির্ভর করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও তার

তত্ত্বগত ভিত্তি: দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অধ্যয়নের উপরে। পৃথিবীর বিকাশ-নিয়ামক নিয়মগুলি ও সমাজবিকাশের নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান উদ্ভূত সমস্যাগুলিকে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকসমাজের স্বার্থে, সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে সমাধান করার কাজে সাফল্যের এক নিশ্চিতি।

৫। দর্শনের পক্ষভুক্তিমূলক চরিত্র

প্রাচীন কাল থেকে, অসংখ্য দার্শনিক তত্ত্ব পৃথিবীতে ছিল এবং এখনও রয়েছে। এগুলির প্রত্যেকটি, তার সারমর্ম ও অন্তর্বস্তুর দিক দিয়ে, হয় বস্তুবাদী, না হয় ভাববাদী। এগুলির প্রত্যেকটি একটি বিশেষ শ্রেণী বা সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানেই রয়েছে তার পক্ষভুক্তিমূলক, শ্রেণী চরিত্র।

দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠী সমাজে তাদের স্থানগত মর্যাদা এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তব সম্বন্ধে, তার ভিতরকার প্রক্রিয়াসমূহ সম্বন্ধে নিজেদের মনোভাব তত্ত্বগতভাবে প্রতিপাদন করে। সেই বিশেষ শ্রেণীটির বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হিসেবে, দর্শন সেই শ্রেণীর মানসিকতা, আচরণ ও আদর্শগুলিকে গড়ে তোলে।

বস্তুবাদ সর্বদাই ছিল প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, আর ভাববাদ ছিল প্রতিক্রিয়াশীল

শ্রেণীগুলির বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি। সমাজে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী ও শক্তিগুলির মধ্যে সংগ্রাম দর্শনে সর্বদাই প্রতিফলিত হয়েছে ও হচ্ছে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে, ডায়ালেকটিকস ও অধিবিদ্যার মধ্যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। যেমন অতীতে তেমন এখনও বস্তুবাদ ও ভাববাদই দর্শনে দুটি বুনিয়াদি, সংগ্রামরত প্রতিপক্ষ রয়ে গেছে। লেনিন লিখেছেন, 'দর্শন দু হাজার বছর আগে যেমন ছিল, সাম্প্রতিক দর্শন তেমনই পক্ষভুক্তিমূলক।'*

দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের দ্বারা দর্শনে পক্ষ নীতির সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক চিন্তার অন্যতম মহৎ অর্জন, কেননা সেই নীতির দরুন সম্ভবপর হয় সমাজের জীবনে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের স্থান ও ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্ণয় করা এবং ভাববাদের যুক্তিহীন ও প্রতিক্রিয়াশীল সারমর্ম উদ্ঘাটন করা, এই ঘটনাটা প্রকাশ করা যে ভাববাদ ঐতিহাসিকভাবে প্রস্থানোদ্যত শ্রেণীগুলির ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির স্বার্থ ও প্রয়োজনকে রক্ষা করে।

আজকের দিনের বুর্জোয়া দর্শন তার পক্ষভুক্তিমূলক চরিত্র অস্বীকার করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে প্রতিঘাত হানার উদ্দেশ্যে তা এক 'অ-পক্ষভুক্ত', 'শ্রেণী-অতিগ'** ও 'ভাবাদর্শ-বর্জিত'***

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 14, p. 358.

** কোনো শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

*** কোনো ভাবাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

তত্ত্বের থিসিস উপস্থিত করে। এর প্রতিনিধিরা বলেন যে পক্ষ নীতি বৈজ্ঞানিক বিষয়মুখিতার সঙ্গে বেমানান।

লেনিন প্রত্যয়জনকভাবে দেখিয়েছেন যে বুর্জোয়া সমাজে অ-পক্ষভুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির ধারণাটা মিথ্যা ও শঠতাপূর্ণ এবং তার উদ্দেশ্য হল বুর্জোয়া পক্ষভুক্ত ভাবাদর্শ আবৃত করা। সেই আবরণের আড়ালে, জনসাধারণের মধ্যে ছড়ানো হয় বুর্জোয়া ভাবাদর্শ, যার উদ্দেশ্য হল জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করা, শোষণ ও নিপীড়ন সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী করা।

সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের সেবায় নিযুক্ত বুর্জোয়া ভাবাদর্শবাদীরা তাঁদের দার্শনিক তত্ত্বগুলির পক্ষভুক্তিমূলক চরিত্র গোপন করতে বাধ্য। সেগুলির পক্ষপাতিত্ব ঢেকে রাখা দরকার, কেননা পুঁজিবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদকে বজায় রাখার ব্যাপারে শোষকদের স্বার্থ তাতে প্রতিফলিত হয় এবং কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক বিষয়মুখিতা বাতিল করা হয়। বুর্জোয়া পক্ষভুক্তি বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে চালিত করে বিশ্ব ও সামাজিক বিকাশকে এমন এক আলোকে উপস্থিত করতে, যা শোষকদের কাজে লাগে। সেই জন্যই বুর্জোয়া ভাবাদর্শবাদীরা এক বিকল্পের সম্মুখীন হন: হয় পক্ষপাতিত্বের নীতি, না হয় বৈজ্ঞানিক বিষয়মুখিতার নীতি।

কিন্তু, এক দিকে, শোষণ ও নিপীড়নের ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের আনুগত্য তাঁরা খোলাখুলি স্বীকার করতে পারেন না, কারণ তা হলে তাঁরা এসে পড়বেন জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক বন্ধন-মোচনের জন্য

সংগ্রামরত সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের, সকল জাতির বিরুদ্ধে। অন্য দিকে, তাঁরা স্বীকার করতে পারেন না যে তাঁদের তত্ত্বগুলি অবৈজ্ঞানিক, কেননা এরূপ এক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কাউকে নিজের দিকে টেনে আনা সুদূরপরাহত।

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনে, পক্ষ নীতিটিকে দেখা যায় একেবারে ভিন্নভাবে। শ্রমিক শ্রেণীর নিজের অবস্থানগুলিকে গোপন করার কোনো প্রয়োজন হয় না। তার লক্ষ্য হল সমস্ত শোষণ ও নিপীড়ন দূর করা ও সমাজতন্ত্র নির্মাণ করা, এবং এই লক্ষ্য মানবজাতির সামাজিক বিকাশের প্রবণতার সঙ্গে মিলে যায়। শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতি কৃষকসমাজ ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবিসমাজের সামনেকার সমস্যাগুলির সফল সমাধান নির্ভর করে বাস্তব সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের গভীরতার উপরে এবং তার নিয়মগুলিকে গণ্য করা ও প্রয়োগ করার সামর্থ্যের উপরে। সেই জন্যই, শ্রমিক শ্রেণীর ভাবাদর্শের তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনে পক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক বিষয়মুখিতার নীতি মিলে যায় এবং পরস্পরকে শর্তাবদ্ধ করে।

সমাজতন্ত্র দ্বারা পুঁজিবাদ প্রতিস্থাপিত হওয়ার যে আবশ্যিকতা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিপাদন করেছে, তা শোষক শ্রেণীগুলির মধ্যে ভীতি ও ঘৃণা উদ্রেক করে। শ্রমিক শ্রেণী, কৃষকসমাজ, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবিসমাজ ও শ্রমজীবী জনগণের অন্য সমস্ত অংশের কথা বলতে গেলে, এই আবশ্যিকতা তাদের

অনুপ্রাণিত করে আশা দিয়ে এবং পৃথিবীর বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য আকাঙ্ক্ষা দিয়ে। সেই জন্যই মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন প্রগাঢ়ভাবে বৈপ্লবিক, খোলাখুলিভাবে পক্ষভুক্ত, এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শ, ধর্মীয় ও ভাববাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি আর অতীতের জেরগুলির প্রতি আপোসহীন।

প্রসঙ্গ ২।

দর্শনের ইতিহাস — বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস

১। বস্তুবাদ ও ভাববাদের উৎস, তাদের নিয়ত সংগ্রাম

পৃথিবী সম্বন্ধে এক মততন্ত্র হিসেবে, এক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে, দর্শন গড়ে উঠেছিল দাস-মালিক সমাজে। আদিম-সম্প্রদায়গত সমাজে, দার্শনিক চিন্তন ছিল ভ্রূণাবস্থায়। মানবদেহের গঠনকাঠামো, মৃত্যুর কারণ, স্বপ্ন, প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনো বিজ্ঞানসম্মত ধারণা সেই সমাজের লোকেদের ছিল না, তারা বিশ্বাস করত যে চিন্তন ও সংবেদন হল আত্মার জাতক, সেই আত্মা একটি বিশেষ উপাদান যা মানবদেহকে সঞ্জীবিত রাখে এবং মানুষের মৃত্যু হলে সেই দেহ ছেড়ে চলে যায়। এঙ্গেলস লিখেছেন: ‘সত্তার সঙ্গে চিন্তনের সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরাত্মার সম্পর্কের প্রশ্নটির — সমগ্র দর্শনের প্রধানতম প্রশ্নটির — মূল রয়েছে, সমস্ত ধর্মের মতোই,

বর্বরদশার সংকীর্ণমনস্ক ও অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণাগুলির মধ্যে।'*

তাই, ভাববাদী অভিমতের, ঠিক ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির মতোই, মূল প্রোথিত রয়েছে এই ধারণার মধ্যে যে চিন্তন, ভাবগুলির অস্তিত্ব থাকে বস্তু-নিরপেক্ষভাবে। পৃথিবী সম্বন্ধে সাধারণ অভিমতের প্রারম্ভিক রূপ ছিল ধর্মীয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, যার জন্ম হয়েছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আদিম মানুষের অক্ষমতা থেকে, প্রকৃতির রহস্যময় ভৌতিক শক্তিগুলি সম্পর্কে তার ভয় থেকে। আদিম মানুষের একটা বিকৃত ধারণা ছিল প্রকৃতির উপরে তার নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে, প্রকৃতির সামনে সে তার অসহায়তা প্রকাশ করত অদ্ভুত সব প্রতিরূপের মধ্যে।

সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে, দাস ও দাস-মালিকে, বিভক্ত হওয়ায়, ধর্মীয় ও ভাববাদী অভিমতও জন্ম নিয়েছিল শাসন-অসাধ্য সামাজিক শক্তিগুলির উপরে মানুষের নির্ভরশীলতা থেকে; সেই শক্তিগুলি প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মতোই অদম্য ছিল।

কিন্তু, এমন কি আদিম-সম্প্রদায়গত সমাজেও মানুষ পৃথিবী সম্বন্ধে একটা সাদাসিধা বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে শুরু করছিল। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, ব্যবহারিক কাজ, ও অনুসন্ধিৎসা মানুষকে পৃথিবীর বিষয়গত অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট স্বাভাবিক

* Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works* in three volumes, Vol. 3, Progress Publishers, Moscow, 1976, p. 346.

একটা ধারণা দিয়েছিল, সাদাসিধা রূপে প্রকাশিত হলেও। দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ মানুষকে দেখিয়েছিল যে অন্যান্য মানুষ, উদ্ভিদ ও পশুপাখি এক বিষয়গত বাস্তব এবং নিজের আত্ম-নিরপেক্ষভাবে বিদ্যমান। প্রথম সাদাসিধা স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদী ধ্যানধারণার, এক স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম উপাদানগুলির এটাই ছিল উদ্ভব।

আদিম মানুষের চৈতন্যে, কাজ ও কর্মপ্রয়োগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদী প্রবণতাগুলি আর প্রকৃতির সামনে মানুষের অক্ষমতা যাতে প্রতিফলিত হল, সেই ধর্মীয়-ভাববাদী প্রবণতা-গুলির মধ্যে একটা সংগ্রাম চলেছিল।

অল্পবিস্তর সংবদ্ধ বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে, বস্তুবাদ ও ভাববাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল ও আকৃতি লাভ করেছিল দাস-মালিক সমাজে। দাসপ্রথার বিকাশ, কায়িক শ্রম থেকে মানসিক শ্রমের পৃথগ্‌ভবন, এবং রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটায়, মানুষের ধারণাগুলিও তদনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছিল। দেবগণকে বেশির ভাগই ব্যবহার করা হত প্রকৃতির শক্তিগুলির মূর্ত প্রতিমা হিসেবে; তারা সামাজিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে লাগল এবং সামাজিক শক্তিগুলির মূর্ত প্রতিমা হয়ে উঠতে লাগল, সেই শক্তিগুলি প্রকৃতির ভৌতিক শক্তিগুলির মতোই সমান ভীতিজনক ও দুর্বোধ্য ছিল। নতুন ঈশ্বরতত্ত্বগত মতবাদগুলি রাজা ও দাস-মালিক উপরমহলের লোকদের উপরে দেবত্বারোপ করেছিল এবং দাসপ্রথার গুণগান করেছিল। অন্যান্য

মতবাদ জগৎকে ব্যাখ্যা করত 'ঐশ্বরিক ইচ্ছার' মূর্ত রূপ বলে, এবং ভগবানদের দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি, পার্থিব অস্তিত্বের অচিরস্থায়ী চরিত্র ও 'আত্মার' অমরত্ব প্রচার করত। সেই সঙ্গে, উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ — কৃষি ও সেচকর্মের বৃদ্ধি, প্রাচীন প্রাচ্যে নির্মাণ সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ, উৎপাদনের অন্যান্য শাখার আত্মপ্রকাশ — গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যাগত জ্ঞানকে, এবং বলবিদ্যা, রসায়ন ও বস্তু-উপকরণ নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কৃৎকৌশলের কিছু কিছু তথ্যকেও সঞ্চিত ও প্রণালীবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। হস্তশিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের বিকাশসাধনের জন্য, এবং দাস-মালিক উপরমহলের যে রক্ষণশীল অভিজাত গোষ্ঠীগুলির সামাজিক বদ্ধাবস্থা বজায় রাখায় স্বার্থ ছিল তাদের বিরুদ্ধে দাস-মালিক সমাজের প্রগতিশীল শক্তিগুলির সংগ্রামে সঞ্চিত প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠেছিল বস্তুবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি।

বস্তুবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, প্রতিক্রিয়াশীল দাস-মালিক উপরমহলের প্রতিনিধিরা পৃথিবীতে ঘটমান প্রক্রিয়াগুলির বস্তুবাদী ব্যাখ্যার বিপ্রতীপে ধর্মের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করার জন্য ভাববাদী ধারণাগুলিকে বিশদ করতে শুরু করেছিল। তাই, বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে অন্তহীন, অপ্রশমিত সংগ্রাম চলছে সেগুলির উদ্ভবের সময় থেকেই।

২। দাস-মালিক সমাজে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংগ্রাম

পৃথিবী সম্বন্ধে বস্তুবাদী অভিমতের মূল রয়েছে অতি প্রাচীনকালে। খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় সহস্রাব্দের শেষে ও ২য় সহস্রাব্দের শুরুতে তা মিশর ও ব্যাবিলোনিয়ায় রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছিল।

দাস-মালিক উপরমহলের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির উপরে প্রগতিশীল চিন্তন একেবারে গোড়ার দিকে যে আঘাত-গুলি হেনেছিল, সেগুলি চালিত ছিল মৃত্যুর ওপারে জীবনের ধর্মীয় মতান্ধতার বিরুদ্ধে, সেকালের সমগ্র সমাজব্যবস্থার অবিচারের বিরুদ্ধে। প্রাচীন মিশরীয় সংস্কৃতির স্মারক নিদর্শনগুলি থেকে দেখা যায় যে কিছু কিছু চিন্তক প্রাকৃতিক ব্যাপারসমূহের বস্তুবাদী উৎসগুলি সম্বন্ধে তখনই আন্দাজ করতে শুরু করে-ছিলেন। তাই, কেউ কেউ সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর উৎস হিসেবে ঠাণ্ডা জলের কথা উল্লেখ করেছিলেন, অন্যরা বলেছিলেন যে স্থান ও সমস্ত জিনিস বায়ুতে পরিপূর্ণ।

প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলোনিয়ায় যে আদিতম স্বতঃস্ফূর্তভাবে বস্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদী অভিমত গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, তা প্রচলিত ধর্মীয়-ভাববাদী অভিমতে আচ্ছন্ন থাকলেও, প্রাচীন পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী চিন্তার পরবর্তী বিকাশের উপরে সেগুলির ফলপ্রসূ প্রভাব নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

প্রাচীন ভারত ও চীনে দর্শনে বস্তুবাদী ও ভাববাদী ধারা গ্রহণ করেছিল আরও সংবদ্ধ রূপ।

প্রাচীন ভারতে দর্শনের উদ্ভব হয় খ্রীঃ পূঃ প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগ নাগাদ। ধর্মীয় ও পৌরাণিক অভিমতের প্রাধান্যের সেই সময়েও — **বেদ*** ও **উপনিষদে** যার প্রতিফলন ঘটেছে — দার্শনিক চৈতন্যের প্রথম উপাদানগুলি আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল এবং আদিতম দার্শনিক মতবাদগুলি — ভাববাদী ও বস্তুবাদী উভয়বিধ — রূপ পরিগ্রহ করছিল।

ভারতে প্রাচীনতম বস্তুবাদী দার্শনিক ধারা ছিল ঋষি বৃহস্পতির প্রতিষ্ঠিত লোকায়ত (বা চার্বাকপন্থীদের ধারা)। চার্বাকপন্থীরা মনে করতেন যে পৃথিবী বস্তুগত এবং চারটি মৌল উপাদানে গঠিত: অগ্নি, জল, বায়ু, মৃত্তিকা ('তেজ, অপ্, মরুৎ, ক্ষিতি')। মানুষ সমেত সমস্ত জীবন্ত প্রাণীও এই উপাদানগুলি দিয়ে গঠিত বলে তাঁরা মনে করতেন। মৃত্যুর পর জীবদেহগুলি নষ্ট হয়ে এই উপাদানসমূহে মিশে যায়। চার্বাকপন্থীরা এক ঈশ্বর, আত্মার অমরত্ব ও পরলোক সংক্রান্ত ধর্মীয় ধারণাগুলির সমালোচনা করেছিলেন, এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে শরীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যও অদৃশ্য হয়। সেই জন্যই তাঁরা পুনর্জন্মের মতবাদও বাতিল করেছিলেন।

---

* **বেদ** — ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন, তাতে ধর্মীয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং পৃথিবী, মানুষ ও নৈতিক জীবনধারা সম্বন্ধেও কিছু দার্শনিক চিন্তা অভিব্যক্ত হয়েছে। **উপনিষদ** — দার্শনিক অংশ, খ্রীঃ পূঃ ১০০০ সাল নাগাদ সংযোজিত।

চার্বাকপন্থীদের বস্তুবাদ তাঁদের নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। তাঁরা একটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন এবং মনে করতেন যে পৃথিবী কোনোরূপ দৈব তত্ত্বাবধাননিরপেক্ষ এবং তা বিকশিত হয় তার স্বকীয় নিমিত্তগত সংযোগ অনুযায়ী। এক অতি-পার্থিব স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব তাঁরা অস্বীকার করতেন, এই মত পোষণ করতেন যে স্বর্গ হল সুখভোগ, আর নরক — কষ্টভোগ। চার্বাকপন্থীরা তাঁদের নীতিশাস্ত্রে* অনুমান করে নিয়েছিলেন যে কষ্টভোগ পুরোপুরি দূর করা যায় না, কিন্তু ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনা যায়, পক্ষান্তরে সুখ বাড়িয়ে তোলা যায় চরম মাত্রা পর্যন্ত। কিন্তু তাঁদের নীতিশাস্ত্রের মর্মবস্তু মোটেই ইন্দ্রিয়সুখসন্ধান ছিল না, বরং ছিল সকলের সুখের জন্য এক যুক্তিসংগত দাবি।

প্রাচীন ভারতের অন্যান্য চিন্তাধারাতেও বস্তুবাদী প্রবণতাগুলি কিছুটা পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছিল। যেমন, কপিল ঋষি-কর্তৃক ৬০০ খ্রীঃ পূঃ নাগাদ প্রতিষ্ঠিত সাংখ্য-দর্শন জগৎকে ব্যাখ্যা করেছিল এক বস্তুগত উৎস থেকে। এর প্রতিনিধিরা পৃথিবীকে দেখেছিলেন বস্তুগত হিসেবে, এক বিশ্বজনীন আদি বস্তু-নিদান (প্রকৃতি) থেকে ক্রমে ক্রমে বিকাশমান

---

* **নীতিশাস্ত্র** — সামাজিক চৈতন্যের একটি রূপ হিসেবে, মানবিব ক্রিয়াকলাপের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে ও সমাজ-জীবনের এক সুনির্দিষ্ট ব্যাপার হিসেবে নৈতিকতাকে যে শাস্ত্রে বিবেচনা করা হয়।

হিসেবে। সাংখ্য-দর্শনের সূত্রায়িত অন্যতম প্রতিজ্ঞা — এই প্রতিজ্ঞা যে গতি, স্থান ও কাল বস্তুর গুণ-ধর্ম এবং বস্তু থেকে অবিচ্ছেদ্য — প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে একটি বড় কৃতিত্ব ছিল। কিন্তু আমাদের যুগের শুরুতে সেই দর্শনধারা ভাববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নতিস্বীকার করেছিল। তাই, আপোস হিসেবে তা বস্তু-নিরপেক্ষ পৃথক পৃথক আত্মার (পুরুষ) অস্তিত্ব মেনে নিয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, মৌল উপাদানসমূহের (অগ্নি, বায়ু, জল ও মৃত্তিকা) মিলন হিসেবে বস্তু সম্বন্ধে ধারণাগুলি প্রতিস্থাপিত হয়েছিল পৃথিবীর এক পারমাণবিক গঠনকাঠামো সংক্রান্ত আরও বিকশিত বস্তুবাদী ধারণাসমূহ দিয়ে।

ন্যায় ও বৈশেষিক দার্শনিক ধারা এই ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছিল যে ঈথর, স্থান ও কালে অন্তর্গত জল, বায়ু, অগ্নি ও মৃত্তিকার গুণগতভাবে বহুবিধ কণিকা (**অণু**) দিয়ে পৃথিবী গঠিত। তাদের কাছে **অণু** হল চিরন্তন, অসৃজনীয় ও অবিনশ্বর, আর সেগুলি যে সমস্ত পদার্থ গঠন করে তা পরিবর্তনীয়, অস্থির ও অচিরস্থায়ী।

এমন কি গোঁড়া ধর্মীয় ও ভাববাদী ধারা ও মতবাদের উপরেও (মীমাংসা, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইত্যাদি) বস্তুবাদী ভাব-ধারণাগুলির প্রবল প্রভাব পড়েছিল। যেমন, ভাববাদী ধর্মীয় দার্শনিক ধারা মীমাংসা বৈদিক আচারপরায়ণতা, ধর্মানুষ্ঠান, আত্মার অমরত্ব, প্রভৃতিকে সমর্থন করলেও পৃথিবীর বাস্তবতাকে

স্বীকার করেছিল, যে পৃথিবীর অস্তিত্বের জন্য কোনো স্রষ্টা দরকার হয় নি, তার অস্তিত্ব সর্বদাই ছিল এবং তা 'কর্ম'-এর স্বতন্ত্র নিয়ম-শাসিত অণুগুলি দিয়ে গঠিত।

ভারতে দাস-মালিক ব্যবস্থার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভাববাদের চরম অতীন্দ্রিয়বাদী রূপগুলির বিস্তৃতি ঘটে।

প্রাচীন চীনে, ভারতের মতোই, দাসপ্রথার উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গঠিত হয়েছিল দুটি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি: বস্তুবাদী ও ভাববাদী।

কনফুসিয়াস (খ্রীঃ পূঃ ৫৫১-৪৭৯) চৈনিক সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। এক নীতিশাস্ত্রগত-রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি বিখ্যাত। তাঁর মতবাদের ভিত্তি ছিল **জেন-এর** (মানবিকবাদ) নীতিশাস্ত্রগত ধারণা, যা সমাজে ও পরিবারে মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ককে নির্ধারণ করত, এবং বয়সে তথা সামাজিক মর্যাদায় জ্যেষ্ঠদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কথা বলত। কনফুসিয়াস বলেছিলেন যে প্রত্যেক মানুষের উচিত কঠোরভাবে তার সামাজিক স্থান-মর্যাদা অনুযায়ী কাজ করা; তিনি পারস্পরিক মহানুভবতা এবং জ্ঞান ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মোৎকর্ষসাধনের কথা বলেছিলেন।

ব্যক্তিত্বের নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে, খন্ড-বিখন্ডিত চীনের একীকরণ সম্বন্ধে, ও জ্ঞানের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর যুক্তিসহ চিন্তা এক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু তাঁর মতবাদের প্রগতিশীল

ধ্যানধারণার পাশাপাশি, তিনি পূর্বপুরুষ পূজা প্রচার করেছিলেন, ঐতিহ্যগত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির পক্ষ সমর্থন করেছিলেন, এবং বিশ্বাস করতেন যে মানুষের ভবিষ্যৎ পূর্বেই নিয়তিনির্ধারিত।

মো ত্জু (খ্রীঃ পূঃ ৪৭৯-৩৮১) ছিলেন প্রাচীন চীনের আরেকজন মহান চিন্তানায়ক। কনফুসীয়পন্থীদের প্রতিতুলনায়, তিনি এই মত পোষণ করতেন যে নিয়তি বলে কিছু নেই। রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের তিনি নিন্দা করেছিলেন এবং রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে শান্তির কথা বলেছিলেন।

মো ত্জুর অবধারণার তত্ত্বেই বস্তুবাদের কিছু কিছু উপাদান ছিল, পরে সেগুলির বিকাশ ঘটান তাঁর অনুগামীরা।

পরবর্তীকালে, লাও ত্জু (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ-৫ম শতাব্দী) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাওবাদের দর্শনে বস্তুবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো হয়। লাও ত্জু ও তাঁর অনুগামীরা পৃথিবীকে চিরন্তন বলে দেখতেন এবং মনে করতেন যে তা রয়েছে নিয়ত গতি ও পরিবর্তনের অবস্থায়। তাঁরা মনে করতেন, সেই গতি নির্ধারিত ও পরিচালিত হয় প্রকৃতির নিয়ম, তাও দিয়ে।

সাদাসিধা বস্তুবাদী ভাবধারণার আরও বিশদীকরণ করেন অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কনফুসীয়পন্থী হ্সুন ত্জু (আনু. খ্রীঃ পূঃ ২৯৮-২৩৮)। অন্য কনফুসীয়পন্থীদের বিপরীতে, তিনি মনে করতেন যে গগনের কোনো চৈতন্য নেই এবং তা প্রকৃতির অংশ;

এই প্রকৃতির মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ঋতু, আলো-অন্ধকার, বায়ু ও বৃষ্টিকেও। তিনি মনে করতেন, গাগনিক ব্যাপারগুলি ঘটে নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী, এবং গগনের এমন কোনো 'ইচ্ছাশক্তি' নেই যা মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। হ্সুন ত্জু এই মত পোষণ করতেন যে, জীবজন্তুর প্রতিতুলনায়, মানুষ তাদের প্রচেষ্টা একত্র করতে পারে ও সামাজিক জীবন যাপন করতে পারে। লোকেরা জন্মগতভাবেই অহংবাদী, তাই প্রত্যেকটি মানুষকে কনফুসীয় নীতিশাস্ত্রের মর্মচেতনায় শিক্ষিত করাই মহাজ্ঞানীর কর্তব্য। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা এই যে মানুষ পারিপার্শ্বিক জগৎকে অবধারণা করতে পারে এবং সেই জ্ঞানকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। অবধারণা শুরু হয় সংবেদন থেকে, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রিত হয় চিন্তনের দ্বারা, যা ক্রিয়া করে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী।

আমাদের যুগের শুরুতে, প্রাচীন চৈনিক সমাজ গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, যা ধর্ম, অতীন্দ্রিয়বাদ, ইন্দ্রজাল ও ভাগ্য-গণনার অবস্থানগুলিকে শক্তিশালী করেছিল। ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বস্তুবাদও বিকশিত হয়েছিল। যেমন, সেই সময়ের অসামান্যতম বস্তুবাদী ওয়াং চুং (২৭-১০৪ খ্রীঃ) বলেছিলেন যে পৃথিবী চিরন্তনভাবে চলমান এক বস্তুগত পদার্থ, চ্'ই দিয়ে গঠিত, আর তাও হল খোদ প্রকৃতিরই ধরন। সকল জিনিসেরই জন্ম হয় দুটি চ্'ই-র মিথষ্ক্রিয়ার দ্বারা: পৃথিবীর বিভিন্ন পদার্থের

রূপের মধ্যে তা থাকে তন্দ্ভূত, গাণিনক ও ঘনীভূত। মানুষকে তিনি দেখেছিলেন বস্তুগত পদার্থ দিয়ে গঠিত এক প্রাকৃতিক সত্তা হিসেবে। রক্ত সঞ্চলনের মধ্য দিয়ে মানবদেহে এক প্রাণশক্তি, বা পরমাত্মা, উৎপন্ন হয়। একজন লোকের মৃত্যু হলে তার অস্তিত্বের অবসান ঘটে। ওয়াং চুং-এর বস্তুবাদ ছিল সাদাসিধা ও আধিবিদ্যক।

তাই, মানবেতিহাসে দর্শন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রাচীন প্রাচ্যের দেশগুলিতে: মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, ভারত ও চীনে। শুরু থেকেই তা বিভক্ত ছিল বস্তুবাদী ও ভাববাদী ধারায়। প্রাচীন দার্শনিকদের স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদী অভিমতের মূল নিহিত ছিল আদিম মানুষের 'সাদাসিধা বাস্তববাদের' মধ্যে। প্রাচীন প্রাচ্যের ভাববাদী মতবাদগুলি আভ্যন্তরিকভাবে পরস্পরবিরোধী ছিল, তার মধ্যে প্রায়শই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত দ্বান্দ্বিক চিন্তনের উপাদানসমূহ।

খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে দর্শনের অত্যন্ত দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল প্রাচীন গ্রীসে। সেখানেও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আত্মপ্রকাশ করেছিল ধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের মধ্যে এবং তাতে প্রতিফলিত হয়েছিল দাস-মালিক শ্রেণীটির প্রগতিশীল স্তরগুলির স্বার্থ। প্রাচীন গ্রীক বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মিলেসীয় ধারার প্রতিনিধিরা: মিলেটাসের টেলস (আনু. খ্রীঃ পূঃ ৬২৪-৫৪৭), আনাক্সিমান্দর (আনু. খ্রীঃ পূঃ ৬১০-৫৪৬) ও আনাক্সিমেনিস (আনু. খ্রীঃ পূঃ ৫৮৫-৫২৫)।

টেলসের মতে, জল হল সমগ্র মহাবিশ্বের একটিমাত্র বস্তুগত উপস্তর। জলই সকল জিনিসের উৎস, এবং সব কিছু শেষ পর্যন্ত জলে পরিণত হয়।

আনাক্সিমান্দর পৃথিবীর উৎপত্তি-নির্ণয় করেছিলেন, তিনি যাকে বলেছিলেন 'আপেইরন' (অনন্ত), তাই থেকে; এই অনন্ত এক অনির্দিষ্ট পদার্থ, যা বস্তুনিচয় ও ব্যাপারসমূহের জন্ম দেয় গতির মধ্য দিয়ে এবং 'শুষ্ক' ও 'সিক্ত', 'তপ্ত' ও 'শীতলের' মতো বিপরীত গুণগুলিতে পৃথগ্ভবনের মধ্য দিয়ে। বস্তুনিচয় কিছু কালের জন্য আত্মপ্রকাশ করে ও বিদ্যমান থাকে, তার পর একই কারণে নষ্ট হয়ে যায় ও অদৃশ্য হয়, আবার পরিণত হয় অনন্তে। আনাক্সিমান্দরের মতে, পৃথিবীতে এক অবিরাম সঞ্চলন আছে, সেই সঞ্চলন চলাকালে কিছু কিছু বস্তু অনন্ত থেকে উদ্ভূত হয়, এবং অন্যগুলি আবার নষ্ট হয়ে অনন্তে মিলিয়ে যায়। তাই, আনাক্সিমান্দর তাঁর বস্তুবাদী যুক্তিধারা অনুসরণ করতে গিয়ে পৃথিবীকে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছিলেন এক দ্বান্দ্বিক আলোকে, গতির মধ্যে।

ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুনিচয়ের চরিত্র সম্বন্ধে আনাক্সিমেনিসও অনুরূপ মত পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন যে পৃথিবীতে বিদ্যমান সব কিছুরই মূল নির্মাণ-উপাদানটি হল বায়ু, যার গতির ফলে পৃথক পৃথক বস্তু আবির্ভূত ও অদৃশ্য হয়।

আরেকজন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক, ইফিসাসের হেরাক্লিটাস (আনু. খ্রীঃ পূঃ ৫৩০-৪৭০) পৃথিবী সম্বন্ধে বস্তুবাদী অভিমতের বিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট

অবদান রেখেছিলেন। তিনি পৃথিবীর উৎপত্তি-নির্ণয় করেছিলেন অগ্নি থেকে, যার ফলে বস্তুনিচয়ের আত্মপ্রকাশ ও বিলুপ্তি ঘটে। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবী কারও দ্বারা সৃষ্ট নয়, তার অস্তিত্ব আছে বাহ্যিকভাবে, কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি-নিরপেক্ষভাবে। তা কোনো ভগবান বা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হয় নি, ছিল, আছে এবং থাকবে 'পরিমাপানুগ প্রজ্বলিত ও পরিমাপানুগ নির্বাপিত এক চিরজীবন্ত অগ্নি' হিসেবে।

হেরাক্লিটাস বার বার জোর দিয়েছিলেন এই ধারণাটার উপরে যে পৃথিবী রয়েছে নিয়ত গতি ও পরিবর্তনের মধ্যে, 'বিবাদ' হল গতির উৎস, এবং বিপরীতসমূহ একটি অপরটিতে পরিবর্তিত হতে পারে। তিনি দ্বান্দ্বিক নীতির ধরনে একটা কিছু সূত্রবদ্ধ করেছিলেন, তাতে প্রকৃত অবস্থা কিছুটা পরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছিল, যদিও সেগুলি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-ভিত্তিক ছিল না।

পরে, বস্তুবাদী দর্শনকে সবচেয়ে গভীরভাবে বিকশিত করেন ডেমোক্রিটাস (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী), তিনি বস্তুর গঠনকাঠামোর পারমাণবিক তত্ত্ব সূত্রবদ্ধ করেন। তিনি বলেন, পৃথিবী গঠিত পরমাণু দিয়ে এবং যে স্থানের (শূন্য) মধ্য দিয়ে সেগুলি যায় সেই স্থান দিয়ে। সেই শূন্যে চলতে চলতে পরমাণুগুলি মিলিত হয় এবং একত্র সংবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন পদার্থ গঠন করে। যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সে সবই পরমাণুগুলি দিয়ে গঠিত। মানবাত্মাও নির্দিষ্ট কতকগুলি পরমাণুর সম্মিলন এবং শরীরের মৃত্যু

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগর্লি অদৃশ্য হয়ে যায়। শরীর ও আত্মার মৃত্যু হল অঙ্গ-উপাদান পরমাণ্যগর্লির বিনষ্টি।

ডেমোক্রিটাস ও অন্যান্য দার্শনিকের বস্তুবাদী অভিমতের বিরোধিতা করেছিলেন প্রাচীন গ্রীসের ভাববাদী দার্শনিক প্লেটো (খ্রীঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭)। তাঁর তত্ত্বে পৃথিবীকে বিভক্ত করা হয়েছিল পরম ভাব দিয়ে গঠিত এক বাস্তব পৃথিবীতে এবং এক অবাস্তব পৃথিবীতে, যে পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত হল পৃথক পৃথক সংবেদজ পদার্থ, এবং যা বাস্তব পৃথিবীর এক ছায়া মাত্র, ভাবধারণার জগৎ।

তিনি মনে করতেন, ভাবধারণার জগৎটি 'পরম শুভ'-এর ধারণা দিয়ে একটিমাত্র সমগ্রে সংবদ্ধ এবং চিরন্তন, পক্ষান্তরে পৃথক পৃথক পদার্থ ও ব্যাপারগর্লি অচিরস্থায়ী ও সাময়িক। কোনো ভাবের সঙ্গে তার মিলনের ফলে সেগর্লির উদ্ভূত হয় আকারহীন, অনির্দিষ্ট বস্তু থেকে, এবং সেই ভাব যে পদার্থটিকে গঠন করেছিল সেটি ছেড়ে চলে যাওয়া মাত্রই সেগর্লি লোপ পায়। প্লেটোর মতে, প্রকৃত বস্তুনিচয় ও ব্যাপারসমূহ সৃষ্ট হয় ভাবের দ্বারা, যার সর্বশেষ উৎস ঈশ্বর। প্লেটোর দর্শন ও ধর্মের মধ্যে সংযোগ, তার ভাববাদী চরিত্র সুস্পষ্ট।

প্রাচীন গ্রীক দর্শন তার চরম শিখরে পৌঁছেছিল আরিস্টটলের (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) রচনায়। তার আগেকার চিন্তকরা যা কিছু করেছিলেন, তার সব কিছুর সারসংক্ষেপ করেছিলেন ও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন

আরিস্টটল। তাঁর রচনাগুলি বেষ্টন করেছে বাস্তবের সমস্ত দিককে: প্রকৃতি, মানবসমাজ ও জ্ঞানকে।

আরিস্টটল মনে করতেন যে সমস্ত জিনিসের উদ্ভব হয় এক বস্তুগত উপস্তর থেকে, সেই উপস্তর আকৃতিহীন ও অনির্দিষ্ট, অর্থাৎ, অস্তিত্বের এক নিহিত শক্তির চেয়ে কার্যত বেশি কিছু নয়। সেই নিহিত শক্তি একটি প্রকৃত সংবেদজ জিনিসে পরিণত হয় একমাত্র তখনই, যখন বস্তু তার সংজ্ঞা-নিরূপক কোনো রূপের সঙ্গে মিলিত হয়।

সেই অভিমতটি সারগতভাবে বস্তুবাদী, কিন্তু তার গুরুতর ত্রুটিও আছে। আরিস্টটল বস্তুগত উপস্তরকে গতি থেকে পৃথক করেছিলেন, যে গতি বাইরে থেকে প্রবিষ্ট হয়েছিল রূপের দ্বারা। বস্তুর রূপান্তরণ, এক অনির্দিষ্ট অবস্থা থেকে নির্দিষ্ট অবস্থায় পরিবর্তন, এবং তার পর এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় পরিবর্তনের চূড়ান্ত উৎস হল গতির প্রথম কারণ হিসেবে ঈশ্বর। এই সব কিছুই দেখায় যে আরিস্টটলের তত্ত্ব ছিল অসংগতিপূর্ণ এবং ডায়ালেকটিকসের উপাদান আর বস্তুবাদী প্রবণতার পাশাপাশি তাতে ছিল আধিবিদ্যক ও ভাববাদী প্রবণতার উপাদানগুলি।

আরিস্টটলের মৃত্যুর পরে প্রাচীন গ্রীক দর্শনের অবনতি ঘটে, তার কারণ ছিল দাস-মালিক রাষ্ট্রের সাধারণ সংকট এবং বস্তুবাদ ভাববাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদকে স্থান ছেড়ে দিতে থাকে।

৩। মধ্যযুগীয় দর্শনে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংগ্রাম

মধ্যযুগে ধর্মের ছিল সর্বময় কর্তৃত্ব, সমাজে আত্মিক জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রের উপরেই তার ছাপ ছিল। সেই যুগে দর্শন অধঃপতিত হয়ে পরিণত হয়েছিল ঈশ্বরতত্ত্বের সেবাদাসীতে। তার উদ্দেশ্য ছিল যাজকীয় আপ্তবাক্যগুলির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করা, সেগুলির সত্যতা ও অপরিবর্তনীয়তা প্রমাণ করা। সেই জন্যই সমস্ত দার্শনিক সমস্যারই ছিল একটা ধর্মীয় আভা।

মধ্যযুগীয় দার্শনিকরা সামান্য ভাবধারণা ও সংবেদজ জগতের স্বতন্ত্র পদার্থগুলির মধ্যে পরস্পরসম্পর্কের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। সেই সময়ে দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা এবং বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যেকার সংগ্রাম সংযুক্ত ছিল সামান্য ও স্বতন্ত্রের মধ্যে, সামান্য ভাবধারণা ও স্বতন্ত্র পৃথক পদার্থের মধ্যে পরস্পরসম্পর্কের প্রশ্নের সঙ্গে।

ভাববাদীরা দাবি করতেন যে সামান্যের অস্তিত্ব থাকে স্বতন্ত্র পদার্থগুলি থেকে নিরপেক্ষভাবে, এবং স্বতন্ত্র পদার্থগুলির আগে, তা সংযুক্ত ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে। বিভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থের কথা বলতে গেলে, সেগুলি শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর-কর্তৃক সৃষ্ট। সেই অভিমতের অধিবক্তাদের বলা হত বাস্তববাদী, কেননা তাঁরা সামান্য

ধারণাগুলির বাস্তব অস্তিত্ব ধরে নিয়েছিলেন এবং তা প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছিলেন।

বস্তুবাদীরা ঘোষণা করেছিলেন যে সামান্য একটা বাস্তব হিসেবে থাকতে পারে না, কিংবা, অধিকন্তু, স্বতন্ত্রের আগে তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাঁরা বলতেন, বাস্তবিকই যেগুলির অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলি শুধু স্বতন্ত্র পদার্থ, আর সামান্য একটা নামের চেয়ে বেশি কিছু নয়, যা কোনো কিছুকে প্রতিফলিত করে না এবং তাই বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই। সেই অভি-মতের অধিবক্তাদের অভিহিত করা হত সংজ্ঞাবাদী বলে, কেননা তাঁরা সামান্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন এবং বলতেন যে তা একটা সংজ্ঞার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

১৩শ শতাব্দীর কয়েকজন স্কল্যাস্টিক* সংজ্ঞাবাদী আর বাস্তববাদীদের মধ্যেকার ব্যবধান কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। যেমন, মধ্যযুগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় স্কল্যাস্টিক টমাস আকুইনাস (১২২৫-১২৭৪) তাঁর সত্তার মতবাদে বলেছিলেন যে সমস্ত সত্তা — প্রকৃত ও বিভব উভয়তই — শুধু পৃথক, স্বতন্ত্র বস্তুনিচয়েরই সত্তা হতে পারে। এরূপ সত্তাকে তিনি বলেছিলেন সত্ত্ব। তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী, বস্তু রূপ-নিরপেক্ষভাবে থাকতে পারে না, অথচ রূপ থাকে বস্তু-নিরপেক্ষভাবে। প্রাকৃতিক জগতের ভৌতিক বস্তুনিচয়

---

* স্কল্যাস্টিসিজম — এক ধরনের ধর্মীয় দর্শন, তাতে প্রাধান্য ছিল ঈশ্বরতত্ত্বের।

সর্বদাই বস্তুর সঙ্গে রূপের এক যুগ্মতা। যা বস্তুগত তা পরম রূপ, অর্থাৎ ঈশ্বর-নিরপেক্ষভাবে থাকতে পারে না।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব 'প্রদর্শন' করতে গিয়ে, টমাস আকুইনাস ঈশ্বরের ধারণা থেকে শুরু করেন নি, শুরু করেছিলেন এই ঘটনা থেকে যে প্রত্যেক ব্যাপারেরই নিজস্ব কারণ থাকে। তিনি বলেছিলেন, কারণগুলির সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে আমরা এসে পৌঁছই সমস্ত বাস্তব প্রক্রিয়া ও ব্যাপারের পরম কারণ ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উপলব্ধিতে।

টমাস আকুইনাসের মতে, বিচারবুদ্ধি সংবেদনগুলির সঙ্গে সংযুক্ত, তাই একমাত্র ভৌত জগৎকে জানাই সম্ভব, অথচ অতিভৌত জগৎ অজ্ঞেয়, বস্তুনিচয়ের অন্তঃসার মানুষের বোধাতীত। চিন্তা ও বাস্তবের মধ্যে পর্যাপ্ত কোনো আদান প্রদান হতে পারে না। সামান্য হল আমাদের মনের জাতক, কিন্তু তা মনের বাইরে বিদ্যমান বাস্তবের সঙ্গে সংযুক্ত। তাই, তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সামান্য থাকে স্বকীয়ভাবে।

ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে দর্শনের সহায়ক ভূমিকাকে টমাস আকুইনাস তত্ত্বগতভাবে প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে, দর্শন ঈশ্বরতত্ত্বের মতো একই কাজ সম্পন্ন করে, যথা, তা ধর্মীয় মতগুলি অনুমান ও প্রতিপাদন করে, কিন্তু ভিন্নভাবে। ঈশ্বরতত্ত্ব এই ধর্মমতগুলি পায় সরাসরি ঈশ্বরের কাজ থেকে, আর দর্শন পায় ঈশ্বরের সৃষ্টি থেকে, বস্তুগত পদার্থসমূহ থেকে।

এই যুগের সন্ধিক্ষণে অনেকগুলি প্রাচ্য দেশ যে গভীর সংকটের কবলিত হয়েছিল, সেই সংকট প্রাচ্যের দার্শনিক চিন্তার বিকাশের উপরে ছাপ ফেলেছিল। ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে, চীনে কনফুসীয় ভাবাদর্শের প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছিল, পক্ষান্তরে তাওবাদী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদ দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ ঘটছিল। বৌদ্ধরা প্রচার করতেন যে সত্তা মায়াময় ও অসত্তাই বাস্তব, তাঁরা আত্মার অমরত্ব ও দেহান্তর প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করতেন, এবং মনে করতেন যে শাশ্বত আত্মিক শান্তি অর্জন করা যেতে পারে নিজের আত্ম-চৈতন্যের উৎকর্ষসাধনের মধ্য দিয়ে। সে যুগের প্রগতিশীল চিন্তকরা অতীন্দ্রিয়বাদ ও ভাববাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। যেমন, ফান চেন (৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী) মনে করতেন যে পরলোক নেই এবং মানবাত্মা দেহের অস্তিত্বের একটি রূপ, মানুষের মৃত্যুতে তা লুপ্ত হয়।

বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, ৭ম, ৮ম ও ৯ম শতাব্দীর কনফুসিয়াসপন্থীরা কিছু কিছু বস্তুবাদী প্রতিজ্ঞা উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু, পরে, তাঁরা আরেকবার বস্তুবাদের এই সমস্ত প্রতিজ্ঞা বর্জন করে ভাববাদ প্রচার করতে থাকেন। চু হ্সির (১১৩০-১২০০) নয়া-কনফুসীয় ভাববাদী মতবাদে লোককে টুঁ-শব্দ না-করে তাদের দুঃখকষ্ট সহ্য করতে বলা হয়েছিল এবং শাসক শ্রেণীর কাছে সম্পূর্ণ বশ্যতা প্রচার করা হয়েছিল; সেটাই হয়ে উঠেছিল সর-

কারি ভাবাদর্শ এবং শুধু চীনেই নয়, কোরিয়ায় ও পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশেও বহুলপ্রচলিত হয়েছিল।

নয়া-কনফুসিয়াসপন্থীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বস্তুবাদ-মনস্ক দার্শনিক ছিলেন চাং ত্সাই (১০২০-১০৭৭)। স্বর্গ ও মর্ত বিষয়ীমুখ সংবেদনসমূহের এক সাকল্য — এই ভাববাদী ধারণা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর মতবাদ অনুযায়ী, বাস্তব মহাবিশ্ব এক বস্তুগত পদার্থের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই পদার্থ বহুবিধ রূপ ধারণ করে। তার আদি অবস্থায় সেই বস্তুগত পদার্থ হল অদৃশ্য বিকীর্ণ কণাসমূহে পূর্ণ এক অসীম শূন্যতা। এই কণাগুলি ঘনীভূত হলে সেগুলি গঠন করে 'মহা সামঞ্জস্য' নামক এক নীহারিকাবৎ পুঞ্জ, তা অক্রিয় ও সক্রিয় কণাসমূহে গঠিত। এই কণাগুলির মিথষ্ক্রিয়া সকল জিনিসের উদ্ভব ঘটায়। পরিবর্তন ও বিকাশের কথা বলতে গিয়ে, চাং ত্সাই বর্ণনা করেছিলেন দুই প্রস্ত নিয়ম, বা নীতি: সকল জিনিস নিয়ামক সামান্য নিয়ম, ও স্বতন্ত্র বস্তুনিচয়ের বৈশিষ্ট্যসূচক বিশেষ নিয়ম। তিনি দেখিয়েছিলেন যে সমস্ত জিনিসই পরস্পর শর্তাবদ্ধ ও আন্তঃসংযুক্ত, ব্যাপারসমূহের বিকাশের প্রক্রিয়ার দুটি রূপ আছে — ক্রমান্বিত ও অতর্কিত — এবং সমগ্র বিকাশ প্রক্রিয়া প্রকাশিত হয় বিপরীত শক্তিসমূহের, সক্রিয়তা ও স্থিরতার, এক সংগ্রামে। কিন্তু, এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বান্দ্বিক প্রতিজ্ঞা থেকে তিনি অধিবিদ্যাগত সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন, বলেছিলেন যে বিপরীত শক্তিসমূহের

সংগ্রামের ফলে শেষ পর্যন্ত সেগুলির পুনর্মিলন ঘটে, যেটা সকল গতির ভিত্তি।

১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে বস্তুবাদী ভাবধারণা ও প্রতিজ্ঞাগুলির আরও বিকাশসাধন ও আরও গভীরভাবে প্রতিপাদন করা হয়েছিল। যেমন, ওয়াং চুয়াং-শান (১৬১৯-১৬৯২) বলেছিলেন যে প্রকৃতি নিয়ত গতির মধ্যে রয়েছে এবং গতিই নতুন নতুন জিনিস ও ব্যাপারের জন্ম দেয়। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে অবধারণা একান্তভাবেই মানবিক সামর্থ্য, এবং উপলব্ধি ঘটে একমাত্র তখনই, যখন ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যিক জগতের বস্তুনিচয়ের সংস্পর্শে আসে। তাঁর মতবাদ অনুযায়ী, সংবেদজ উপলব্ধি অবধারণার যাত্রা-বিন্দু ও ভিত্তি মাত্র, পক্ষান্তরে সারমর্ম উপলব্ধ হয় চিন্তনের দ্বারা।

প্রকৃতির বস্তুগততা ও বিকাশের নিয়মগুলির সম্বন্ধে ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন ও প্রতিপাদন করেছিলেন গোঁড়া দর্শন-ধারার দার্শনিক তাই চেনও (১৭২৩-১৭৭৭)। কিন্তু সামাজিক বিষয়গুলিতে, বিশ্বকোষসুলভ পাণ্ডিত্যের অধিকারী সেই দার্শনিক, তাঁর ১৭শ শতাব্দীর বস্তুবাদী পূর্বসূরীদের মতোই, ভাববাদী ধারণাগুলির গণ্ডির বাইরে যান নি; মানুষের আত্ম-শিক্ষার মধ্যেই তিনি সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তির পথ দেখেছিলেন।

অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও সামন্ততন্ত্রে উত্তরণ ধর্ম ও ভাববাদের প্রসার ঘটিয়েছিল।

মধ্যযুগের গোড়ার দিকে (৯ম-১১শ শতাব্দী) গোঁড়া মততন্ত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত এবং, গোঁড়া নয় এমন মততন্ত্রগুলির মধ্যে ছিল চার্বাক (লোকায়ত), জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ও তার চারটি মতধারা: বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক, ও যোগাচার। যোগ, বেদান্ত এবং বৌদ্ধ মতধারা মাধ্যমিক ও যোগাচার ছিল সুসংগতভাবে ভাববাদী এবং একমাত্র চার্বাক-পন্থীরাই সুসংগতভাবে এক বস্তুবাদী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, আর বাকি মততন্ত্রগুলিতে বস্তুবাদ ও ভাববাদ উভয়েরই উপাদানসমূহ ছিল।

সেই কালপর্বে, প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচ্য দর্শনের আত্তীকরণের ভিত্তিতে আরব্য দর্শন গড়ে উঠেছিল ও বিকাশের উচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছিল। ১০ম-১৩শ শতাব্দীতে তার প্রতিনিধিত্ব করত এই আন্দোলনগুলি: ১) প্রাচ্য পেরিপেটিটিক মততন্ত্র (আরিস্টটলবাদ); ২) 'নির্মলতা ভ্রাতৃবৃন্দ' মতবাদ; ৩) সুফীবাদ, ও ৪) গোঁড়া মুসলিম দর্শন।

১০ম শতাব্দীর মাঝামাঝি উদ্ভূত এক গুপ্ত ধর্মীয়-দার্শনিক সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ — 'নির্মলতা ভ্রাতৃবৃন্দ' তাঁদের মতবাদ আহরণ করেছিলেন যুক্তিবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যায় আরিস্টটল থেকে এবং চিকিৎসাবিদ্যা ও মনোবিদ্যায় গালেন থেকে। সাধারণ দার্শনিক প্রশ্নগুলির ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন নয়া-প্লেটোপন্থী ও নয়া-পিথাগোরাসপন্থী। 'নির্মলতা ভ্রাতৃবৃন্দ' সমস্ত ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদকে মেলাতে চেয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানের ভিত্তিতে, যে জ্ঞান ধর্মকে তার ভুল ধারণাগুলি থেকে মুক্ত করবে। তাঁরা দাবি

করতেন, ত্রুটিহীনতা অর্জনের জন্য গ্রীক দর্শন ও মুসলিম শরিয়তকে (কোরান-ভিত্তিক ধর্মীয়, দৈনন্দিন ও নাগরিক নিয়মকানুনগুলিকে) মেলানো দরকার।

প্রাচ্য পেরিপেটিটিক মততন্ত্র (৯ম-১১শ শতাব্দী) দার্শনিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রথম যে আরব দার্শনিক আরিস্টটলবাদের পথ প্রশস্ত করেছিলেন, তিনি হলেন আল-কিন্দি (৮০০-৮৭৯)। তাঁর রচনাগুলিকে তিনি প্রকৃতি ও সামাজিক ব্যাপারসমূহের, সেগুলির নিয়ম-শাসিত চরিত্রের কার্য-কারণ সম্বন্ধ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি বিশদ করেছিলেন। ঈশ্বরকে তিনি স্বীকার করেছিলেন সকল ব্যাপারের শুধু 'দূরবর্তী কারণ' হিসেবে। 'পৃথিবীর দেহ' সসীম ও ঈশ্বর-কর্তৃক সৃষ্ট, এই মত পোষণ করে আল-কিন্দি যুক্তিসিদ্ধভাবে তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোরান ও কিছু কিছু ধর্মীয় অন্ধমত সম্পর্কে তিনি সংশয়পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। অবধারণাকে তিনি যে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছিলেন, সেটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বলেছিলেন যে অবধারণার প্রথম পর্যায় (যুক্তিবিদ্যা ও গণিত) নিয়ে যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের (প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ) দিকে, এবং তার পর তৃতীয় পর্যায়ের (অধিবিদ্যাগত সমস্যাসমূহ) দিকে।

সুফীবাদ ও গোঁড়া ধর্মীয়-অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শন ছিল সেই কালে বস্তুবাদ ও যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া। সুফীবাদ হল নয়া-প্লেটোবাদের কাছাকাছি

এক মতবাদ। সুফীবাদীরা সংবেদজ ও যুক্তিসহ উভয়প্রকার অবধারণারই সত্যতা অস্বীকার করতেন, এবং কঠোর তপশ্চর্যা ও পৃথিবীর ভোগ-পরিত্যাগের কথা প্রচার করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে সত্যকার জ্ঞান হল দৈব আলোকদর্শনের ফল, মানবাত্মা যখন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয় তখনই সেটা ঘটে। সুফীবাদের ধর্মীয় বহিরাবরণের আড়ালে প্রাচ্যের চিন্তকরা প্রায়শই মানবিক, এমন কি ধর্মবিরোধী ভাবধারণাও প্রকাশ করতেন।

১৩শ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের সাধারণভাবে স্বীকৃত দর্শন ছিল আল-আশারির মততন্ত্র; ধর্মীয় গোঁড়া মতগুলিকে তিনি বুদ্ধিবাদী যুক্তিতর্ক দিয়ে বলবান করতে চেষ্টা করেছিলেন। আল-আশারির মতে, বস্তুজগৎ পরিমাপহীন পরমাণুসমূহ দিয়ে গঠিত, এক শূন্যাবস্থার দ্বারা সেই পরমাণুগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। স্থান, কাল ও গতিরও এক পারমাণবিক গঠনকাঠামো আছে। কাল পৃথক পৃথক মুহূর্ত দিয়ে গঠিত, সেগুলির পরস্পরের সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই: পরবর্তী প্রতিটি মুহূর্ত পূর্ববর্তী মুহূর্তটির দ্বারা শর্তাবদ্ধ নয়। তিনি মনে করতেন, পৃথিবীতে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে এবং যা কিছু ঘটছে, সে সবেরই একমাত্র কারণ ঈশ্বর। আল-আশারি ও তাঁর অনুগামীরা পৃথিবীর চিরন্তনতা ও তার সমানুবর্তিতাকে অস্বীকার করতেন, তাঁরা জোর দিয়ে বলতেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পৃথিবীকে শুধু সৃষ্টিই করে নি, এখনও তা চালিকা শক্তি।

বস্তুনিচয়ের কোনো স্থির গুণ-ধর্ম নেই, সে সবই ঈশ্বরের দ্বারা নতুনভাবে সৃষ্ট হয়েছে।

১১শ শতাব্দীর শেষার্ধে, পেরিপেটিটিক মততন্ত্রের সমালোচনা করেছিলেন আল-গাজালি (১০৫৯-১১১১)। পৃথিবীর চিরন্তনতা ও তার সমানুবর্তিতার মতবাদ তিনি অস্বীকার করেছিলেন। আল-গাজালির মতে, পৃথিবী ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে নাস্তি থেকে এবং দৈব দূরদর্শিতা ও সদয় তত্ত্বাবধান ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ত নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতিতে কার্য-কারণ সম্বন্ধও তিনি অস্বীকার করেছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ বলে যা পরিচিত তা কালে রীতিগত ঘটনা পরম্পরা মাত্র।

পেরিপেটিটিক মততন্ত্রের আরও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন ইব্‌ন বাজ্জা (১১শ শতাব্দীর শেষ-১১৩৮), ইব্‌ন তুফাইল (আনু. ১১১০-১১৮৫), ও ইব্‌ন রুশ্‌দ (১১২৬-১১৯৮)।

ইব্‌ন রুশ্‌দ আরিস্টটলের ভাবধারণাগুলিকে আদ্যোপান্ত নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে বস্তুজগৎ কালে চিরন্তন কিন্তু স্থানে সীমিত। এই ধর্মীয় মতবাদ তিনি অস্বীকার করেছিলেন যে পৃথিবী 'নাস্তি থেকে' ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী, ঈশ্বর হলেন বাস্তবের চিরন্তন উৎস, এবং বস্তু — সত্তার একমাত্র ভিত্তি — নিহিত শক্তির চিরন্তন উৎস। বস্তু ও রূপ একটি অপরটি থেকে পৃথকভাবে থাকে না। তিনি বলেন, বস্তু হল গতির বিশ্বজনীন ও চিরন্তন উৎস। গতি চিরস্থায়ী ও ধারাবাহিক, কেননা

প্রতিটি গতির জন্ম হয় পূর্ববর্তী গতির দ্বারা। তাই, তাঁর দর্শনে বস্তুবাদী উপাদানগুলি ভাববাদের সঙ্গে মিলিত ছিল। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে অস্তিত্বশীল সব কিছুই একটা সোপানবৎ বিন্যাস, যার শীর্ষদেশে আছেন ঈশ্বর, সত্তার চূড়ান্ত কারণ।

'সত্যের দ্বৈত চরিত্র' সম্বন্ধে ইব্‌ন রুশ্‌দের মতবাদ দর্শনের পরবর্তী বিকাশকে প্রভাবিত করেছিল। এই মতবাদে বলা হয়েছিল যে দার্শনিক সত্যগুলি ধর্মীয় সত্যগুলিকে খণ্ডন করে না; ধর্ম মানুষের ক্রিয়াকে নির্ধারণ করে, আর দর্শন তাকে চালিত করে পরম সত্যজ্ঞানের দিকে।

সার্বিকসমূহ, বা বর্গীয় ধারণাগুলি সম্বন্ধে এই দার্শনিকের অভিমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই বিষয়ে তাঁর অভিমত ছিল বস্তুবাদী। তিনি মনে করতেন যে একমাত্র মূর্ত জিনিসগুলিই বাস্তব, আর সার্বিকসমূহ এক বাস্তব ভিত্তি সহ সেগুলির নাম মাত্র। তিনি বলেছিলেন যে সার্বিকসমূহ সম্বন্ধে চেতনাই অবধারণার লক্ষ্য। যুক্তির সাহায্যে অবধারণা সংবেদন ও ইন্দ্রিয়োপলব্ধি থেকে সত্যের এক মানসিক ধারণালাভের দিকে যায়। তিনি মনে করতেন, পরম সত্য জ্ঞেয়, কিন্তু তা নিজেকে উন্মোচন করে ক্রমে ক্রমে।

মধ্যযুগীয় দর্শনের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রগতিশীল চিন্তানায়করা: আল-ফারাবি (আনু.৮৭০-৯৫০), আল-বিরুনি (আনু. ৯৭৩-১০৪৮), ইব্‌ন

সিনা, যিনি আভিসেন্না নামেও পরিচিত (আনু. ৯৮০-১০৩৭), এবং ওমর খৈয়াম (১০৪০-১১২৩)। এই দার্শনিকরা প্রায়শই ভাববাদী অবস্থান ত্যাগ করে বস্তুবাদী অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। যেমন, আল-ফারাবি মনে করতেন যে বস্তুজগৎ ছয়টি প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে গঠিত (সরল মৌল উপাদানসমূহ, খনিজ পদার্থ, উদ্ভিদ, পশু, মানুষ ও গ্রহনক্ষত্র)। তিনি বলেছিলেন, অবধারণার উৎস হল ইন্দ্রিয়গুলি, মনন ও অনুধ্যান। প্রকৃতির বিষয়মুখিতা ও তার সমানুবর্তিতাগুলি সম্বন্ধে আল-বিরুনিরও কোনো সন্দেহ ছিল না। তিনি বলেছিলেন, প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্তন ও বিকাশের অবস্থায় রয়েছে, খোদ বস্তু সব জিনিসের রূপ সৃষ্টি ও পরিবর্তন করছে। তাঁর কাছে আত্মা ছিল দেহেরই একটি গুণ-ধর্ম।

অসামান্য জ্ঞানকোষ-রচয়িতা ইব্‌ন সিনা দর্শনকে দেখেছিলেন সামগ্রিকভাবে সত্তার এক বিজ্ঞান হিসেবে। দর্শনকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন: পদার্থবিদ্যা (প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদ), যুক্তিবিদ্যা (প্রকৃতি ও মানুষের অবধারণা বিষয়ক মতবাদ) ও অধিবিদ্যা (সামগ্রিকভাবে সত্তার অবধারণা বিষয়ক মতবাদ)। বস্তুবাদী অভিমত গ্রহণ করে তিনি প্রকৃতির বিষয়গত অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন, নির্ভর করেছিলেন বাস্তব তথ্য ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপরে। ইব্‌ন সিনা তাঁর যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক মতবাদে আরিস্টটলের সঙ্গে অনেকাংশে একমত হয়েছিলেন। যুক্তিগত চিন্তনের নিয়ম ও রূপগুলি বিবৃত করতে

গিয়ে তিনি এগ্নলিকে খোদ সত্তারই বৈশিষ্ট্যসম্ভহ থেকে আহরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। যুক্তিবিদ্যাকে যাঁরা নিতান্তই একটি কলা বলে কল্পনা করতেন, মধ্যযুগের সেই মুসলিম স্কল্যাস্টিকদের প্রতিতুলনায় তিনি এই মত পোষণ করতেন যে যুক্তিবিদ্যাগত বর্গসমূহ ও নীতিসমূহ বস্তুনিচয়ের সঙ্গে, অর্থাৎ বিষয়গত পৃথিবীর সমানুবর্তিতাগুলির সঙ্গে মেলা উচিত।

বাস্তববাদী ও সংজ্ঞাবাদীদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার দিকে ইব্‌ন সিনার বড় অবদান ছিল। তিনি বলেছিলেন যে সামান্য আছে স্বতন্ত্র পদার্থগুলির মধ্যে, সামান্যই সেগুলির সারমর্ম। চিন্তনে, সামান্য থাকে বাস্তব স্বতন্ত্র বস্তুনিচয়ের অবধারণার ভিত্তির উপরে। তিনি বলেছিলেন, সামান্য হল একটি বিমূর্তন, আর মহাবিশ্ব স্বতন্ত্র বস্তুনিচয় দিয়ে গঠিত। ইব্‌ন সিনা পদার্থবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার মধ্যে আন্তঃসংযোগ প্রকাশ করেন। তিনি দেখান যে পদার্থবিদ্যা যুক্তিবিদ্যাকে সমৃদ্ধ করে কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিষয়ে ধারণা দিয়ে, আর যুক্তিবিদ্যা পদার্থবিদ্যাকে পদ্ধতি যোগায়।

ইব্‌ন সিনার অধিবিদ্যার অবলম্বন ছিল উদ্ভবের তত্ত্ব, তাতে বলা হয়েছিল যে পৃথিবী ঈশ্বর-কর্তৃক সৃষ্ট হয় নি, তাঁর কাছ থেকে উদ্ভূত হয়েছে স্বাভাবিকভাবে, অর্থাৎ তাঁর জন্ম-দেওয়া এক প্রস্তু 'বুদ্ধিমত্তার' মধ্য দিয়ে উদ্ভব হিসেবে। যে নিহিত শক্তিগুলির উৎস অসৃজনীয় ও চিরন্তন বস্তু, সেগুলির অস্তিত্ব ব্যতীত

ঈশ্বর কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন না। তাই, ঈশ্বর যদি চিরন্তন হন, তবে পৃথিবীও চিরন্তন, কেননা কার্য ও কারণ সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত: যদি একটা কারণ থাকে, তা হলে একটা কার্যও থাকবে। চিরন্তন বস্তুজগতের ধারণাটা ধর্মীয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি দুর্বল করেছিল। ইব্‌ন সিনার বস্তুবাদী অভিমত প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে উভয় স্থানেই বিজ্ঞান ও দর্শনের পরবর্তী বিকাশের উপরে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল।

৪। উদীয়মান পুঁজিবাদের যুগে বস্তুবাদ, এবং ধর্ম ও ভাববাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম

পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের উৎপত্তি ও বিকাশ সমগ্র উৎপাদনী ক্রিয়াকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল, প্রেরণা যুগিয়েছিল শিল্প ও বাণিজ্যের আত্মপ্রকাশ ও বিকাশে। তার জন্য দরকার হয়েছিল পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে মূর্ত-নির্দিষ্ট জ্ঞান এবং তাই প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করা ও বোঝা দরকার হয়েছিল। এ সবই দর্শনের বিকাশের উপরে একটা ছাপ ফেলেছিল; দর্শনকে ঘোষণা করা হয়েছিল এক বিজ্ঞান বলে, যার উদ্দেশ্য হল সেই সমস্ত সত্য প্রতিপাদন করা, যেগুলি মানুষকে তাদের ব্যবহারিক জীবনে সাহায্য করবে এবং বৈষয়িক মূল্য সৃষ্টিতে তাদের ক্রিয়াকলাপকে চালিত করবে।

মধ্যযুগীয় দর্শনের সামান্য প্রতিজ্ঞাগুলিকে ও তার পদ্ধতিকে ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলে বাতিল করা হয়েছিল। উপস্থিত করা হয়েছিল গবেষণার নতুন নতুন উপায়, অবধারণার নতুন নতুন পদ্ধতি।

দর্শনে সেই প্রবণতার সূত্রপাতকারীদের মধ্যে ছিলেন ফ্র্যান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৫)। একেবারে প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ অবধি ভাববাদী দর্শনের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি তার সমালোচনা করেছিলেন ঈশ্বরতত্ত্বের সেবাদাসীতে পরিণত হওয়ার জন্য, ধর্মীয় অন্ধমত দিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞাগুলিকে সমর্থন করার মতো নিচে নামার জন্য। তিনি বিচারের দূরকল্পী চরিত্রেরও সমালোচনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তার প্রতিজ্ঞাগুলি শূন্যগর্ভ ও অর্থহীন।

অভিজ্ঞতাকে অবধারণার ভিত্তি হিসেবে উপস্থিত করে, বেকন মানবচৈতন্যকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন বিবিধ পূর্বাহ্ণে-কৃত ধারণা থেকে, যেগুলি সত্য অবধারণার পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। তিনি বলেছিলেন যে বস্তুজগতের কোনো শুরু বা শেষ নেই; তার অস্তিত্ব চিরকাল ছিল ও থাকবে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে গতি হল চিরন্তনভাবে বিদ্যমান বস্তুর অন্যতম প্রধান গুণ-ধর্ম, যদিও একে তিনি কতকগুলি রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিলেন।

বেকনের অবধারণার পদ্ধতিও আধিবিদ্যক ও অধিযন্ত্রবাদী ছিল। তখনও পর্যন্ত তিনি এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে একটা বোধে উপনীত হতে পারেন নি যে

পদার্থগুলি কোনো স্থির গুণের নিতান্ত এক যান্ত্রিক সম্মিলন নয়, বরং এক সুসংবদ্ধ সমষ্টি, যেখানে বিভিন্ন গুণ ও দিক আন্তঃসংযুক্ত ও একটি অপরটিতে পরিবর্তিত-রূপান্তরিত হয়, একটি জিনিসকে তার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তথ্যকে যান্ত্রিকভাবে সম্মিলিত করে বোঝা যায় না।

বেকনের মতবাদে কিছু কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও, দর্শনের বিকাশে তা ছিল সামনের দিকে বেশ বড় একটা পদক্ষেপ, দার্শনিক বস্তুবাদের এক নতুন রূপের আত্মপ্রকাশকে তা চিহ্নিত করেছিল।

ইংরেজ বুর্জোয়া দার্শনিক টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আরও বিকাশ ঘটান। তিনি মনে করতেন, প্রকৃতি হল দুটি মূল গুণ-ধর্মের অধিকারী পদার্থসমূহের সাকল্য: বিস্তৃতি ও আকার। গতির সমস্ত বহুবিধ রূপকে তিনি পর্যবসিত করেছিলেন একটিমাত্র রূপে: যান্ত্রিক গতি। এরূপ গতিকে তিনি কল্পনা করেছিলেন শুধু স্থানে অবস্থিতির এক পরিবর্তন হিসেবে।

তাঁর মতবাদ অনুযায়ী, অবধারণার একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হল গাণিতিক পদ্ধতি, যোগ ও বিয়োগের মতো গাণিতিক ক্রিয়াগুলি তার ভিত্তি।

পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁর বস্তুবাদী মতবাদ বিশদ করতে গিয়ে হবস নিরীশ্বরবাদী সিদ্ধান্তসমূহ সূত্রবদ্ধ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে ধর্ম হল মানুষের অজ্ঞতার জাতক, অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের শঙ্কার ফল। তিনি বলেছিলেন, বিজ্ঞানের সঙ্গে তার কোনোই

মিল নেই বটে, কিন্তু তা প্রয়োজন, কেননা তা লোককে শৃঙ্খলার সীমার মধ্যে রাখতে সাহায্য করে।

রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) পৃথিবীর যথেষ্ট বস্তুবাদধর্মী এক চিত্র উপস্থিত করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুকণা দিয়ে প্রকৃতি গঠিত, সেগুলির আয়তন, রূপ ও গতির দিক পৃথক। পদার্থসমূহের সমস্ত বৈচিত্র্য উদ্ভূত হয় স্বাভাবিকভাবে, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আদি উপাদান থেকে, যেগুলি দিয়ে গোড়ায় অসীম মহাবিশ্ব গঠিত ছিল: অগ্নি-সদৃশ, বায়ু-সদৃশ ও মৃত্তিকা-সদৃশ। এই সমস্ত উপাদান গতির মধ্যে রয়েছে, তৈরি করছে বহু ঘূর্ণি। প্রথম ধরনের উপাদানগুলির ঘূর্ণ্যমান গতি সূর্য ও নক্ষত্ররাজির উদ্ভব ঘটিয়েছিল, দ্বিতীয় ধরনের উপাদান-গুলির ঘূর্ণ্যমান গতি আকাশের উদ্ভব ঘটিয়েছিল এবং তৃতীয় ধরনের উপাদানগুলির ঘূর্ণ্যমান গতি পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের উদ্ভব ঘটিয়েছিল।

সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে সেই সাদাসিধা বস্তুবাদী মতবাদ চালিত ছিল পৃথিবীর দৈব সৃজন সম্পর্কে ধর্মীয় মতগুলির বিরুদ্ধে, তাই সেই সময়ে তা ছিল এক প্রগতিশীল মতবাদ।

দেকার্ত পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্ভর করেছিলেন বিজ্ঞানের উপরে: বলবিদ্যা ও গণিতের উপরে। তাঁর মতবাদকে সেটা স্বভাবতই প্রভাবিত করেছিল, তাকে করে তুলেছিল অনেকাংশে অধিযন্ত্রবাদী। জীবন্ত জীবদেহ আর অচেতন প্রকৃতির পদার্থগুলির মধ্যে কোনো গুণগত প্রভেদ তিনি দেখতে

পান নি। পশুদের, এমন কি মানুষকেও তিনি দেখেছিলেন বিভিন্ন জটিলতার যন্ত্র হিসেবে। বস্তুর গতির সমস্ত বিবিধ রূপকেও তিনি স্থানে গতিতে পর্যবসিত করেছিলেন।

দেকার্ত সুসংগত বস্তুবাদী ছিলেন না। স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক ব্যাপারসমূহ বিবেচনা করার সময়ে তিনি ছিলেন বস্তুবাদী। কিন্তু যখন তিনি সত্তা ও অবধারণার মূল নীতিগুলির দিকে গিয়েছিলেন, তখন বস্তুবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনি দার্শনিক সমস্যাগুলি সমাধান করতে চেষ্টা করেছিলেন এই অনুমিতির ভিত্তিতে যে ঈশ্বর, আত্মা হল সত্তার একমাত্র উৎস। ভাষান্তরে, দেকার্তের দার্শনিক অভিমত ছিল দ্বিত্বমূলক।

তাঁর অবধারণার তত্ত্ব ও পদ্ধতি এসেছিল বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধি থেকে, কেননা তিনি মনে করতেন যে অবধারণার প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না, সেখানে নির্ভর করা উচিত একমাত্র বিচারবুদ্ধির উপরে, তার অন্তর্জাত নীতি ও ভাবধারণা হিসেবে যা দেখা যাচ্ছে তার উপরে।

ওলন্দাজ দার্শনিক বেনেদিক্ত স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭) আরও গভীর এক বস্তুবাদী মতবাদ বিশদ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে পৃথিবী মূলত অখণ্ড এবং তার ভিত্তি হল, তাঁর ভাষায়, সত্ত্ব (substance*)। চিন্তনের কথা বলতে গেলে, তা হল বস্তুর অন্যান্য গুণের — যেমন বিস্তৃতি — পাশাপাশি

---

* লাতিন substantia (সত্ত্ব) শব্দ থেকে।

বস্তুর অন্যতম একটি গুণ মাত্র। প্রকৃতি চিরন্তন, কোনোকালে তা সৃষ্ট হয় নি, এবং তার চিরন্তন ও চিরস্থায়ী অস্তিত্বের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় খোদ প্রকৃতিরই মধ্যে। তিনি বলেছিলেন, প্রকৃতি চিরন্তন বলে নিজেকে তা প্রকাশ করে তার গুণ-ধর্ম ও অবস্থাগুলির মধ্য দিয়ে, যে সমস্ত গুণ-ধর্ম ও অবস্থা সংখ্যায় অগণন। এই গুণ-ধর্মগুলির একটি, গতি, অসীম, অর্থাৎ, প্রকৃতির সমস্ত অবস্থার বৈশিষ্ট্যসূচক।

পৃথিবীকে তার নিজের কারণ বলে ঘোষণা করে, স্পিনোজা মহাবিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরকে বাদ দিয়েছিলেন, তাঁকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন প্রকৃতির মধ্যে। তাঁর কাছে ধর্ম ছিল মানুষের অজ্ঞতা আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কার ফল।

১৭শ শতাব্দীর বস্তুবাদী মতবাদগুলি প্রগতিশীল ছিল, যদিও অধিবিদ্যামূলক বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্যসূচক কিছু কিছু দোষত্রুটি সেগুলির ছিল। সেগুলি প্রকাশ করেছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ, যে শ্রেণী ১৭শ শতাব্দীতে ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল ছিল। সেই শতাব্দীতে বস্তুবাদ ছিল সমাজে রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্য সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতায় এসে নিজের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গেই, বস্তুবাদ থেকে দূরে সরে যেতে এবং ভাববাদের কাছাকাছি চলে আসতে শুরু করেছিল।

ইংরেজ বিশপ জর্জ বার্কলি (১৬৮৪-১৭৫৩) তাঁর বিষয়ীমুখ ভাববাদের দর্শনের বিকাশ ঘটান এবং

ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) তাঁর অজ্ঞাবাদের বিকাশ ঘটান। এই দার্শনিক মততন্ত্রগুলি শুধু অ-বস্তুবাদী চিন্তকদের উপরেই নয়, যাঁদের বস্তুবাদ অধিবিদ্যাগত ও অধিযন্ত্রবাদী ছিল তাঁদের উপরেও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কিন্তু বস্তুবাদী ভাবধারণার বিকাশ ও প্রসার বন্ধ করা যায় নি। বস্তুবাদ বিকশিত হয়ে চলেছিল এবং ধর্ম ও ভাববাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম আরও তীব্র হয়েছিল; তা চরম শিখরে গিয়ে পেঁছেছিল এই সমস্ত ফরাসী বস্তুবাদীদের রচনায়: পল আঁরি হলবাক, ক্লদ আদ্রিয়েন হেলভেতিয়াস, দেনি দিদেরো, জুলিয়েন অফ্রয় দ্য লামেত্রি, প্রমুখ।

ফরাসী বস্তুবাদীরা ধর্ম ও যাজকসম্প্রদায়ের সমালোচনা করেছিলেন কঠোর ও সুসংগতভাবে। তাঁদের নিরীশ্বরবাদী লেখাগুলি আমাদের কালেও প্রাসঙ্গিক।

তাঁরা দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের আরও সুসংগত এক উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে প্রকৃতির অস্তিত্ব আছে বিষয়গতভাবে, চিরন্তনভাবে, এবং তার কোনো ঈশ্বরের দরকার নেই। তাঁদের কাছে প্রকৃতি ছিল বস্তুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার (পরমাণু বা অণু) বহুবিধ সম্মিলনের এক সাকল্য, সেগুলির বিস্তৃতি, ওজন, পরিমাণ, গতি ও অন্যান্য গুণ-ধর্ম আছে। গতিকে তাঁরা দেখেছিলেন বস্তুর বুনিয়াদি গুণ বা ধর্ম হিসেবে। কিন্তু, গতি বস্তুরই আভ্যন্তরিক, সহজাত গুণ-ধর্ম — এই মত সঠিকভাবে পোষণ

করলেও, ফরাসী বস্তুবাদীরা তখনও পর্যন্ত গতির উৎস, তার কারণ আবিষ্কার করেন নি। এও তাঁরা উপলব্ধি করেন নি যে গতির গুণগতভাবে বিবিধ রূপ থাকে কিংবা প্রকৃতির বিকাশ ঘটে নিম্নতর থেকে উচ্চতর রূপগুলিতে; তাঁরা লাফগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন, ইত্যাদি।

অবধারণার ক্ষেত্রে, ফরাসী বস্তুবাদীরা মনে করতেন যে সমস্ত ভাব ও ধারণা উদ্ভূত হয় অভিজ্ঞতা থেকে, রূপ পরিগ্রহ করে অবধারণার প্রক্রিয়ায়। সংবেদজ অবধারণার উপরে, সংবেদনগুলির উপরে তাঁরা জোর দিয়েছিলেন, সেগুলিকে তাঁরা দেখেছিলেন মানুষের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসেবে। কিন্তু, সংবেদনগুলিই বাহ্যিক পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস — এই বিশ্বাস সঠিকভাবে করলেও, ফরাসী বস্তুবাদীরা চিন্তনের ভূমিকার উনমূল্যায়ন করেছিলেন, যদিও তাঁরা বলেছিলেন যে সত্য সম্বন্ধে অবধারণার জন্য তা প্রয়োজন। তাই, ঠিক তাঁদের পূর্বসূরীদের মতোই, তাঁরা সংবেদজ অবধারণা আর চিন্তনের মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্ক সম্বন্ধে একটা একপেশে দৃষ্টি তখনও গ্রহণ করেছিলেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বস্তুবাদকে এক আপোসহীন সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল বিভিন্ন ভাববাদী ও ধর্মীয় মতধারার বিরুদ্ধে। তাদের কতকগুলির মধ্যে অবশ্য প্রগতিশীল ধ্যানধারণাও ছিল। যেমন, ১৬শ-১৮শ শতাব্দীতে বহুলপ্রচলিত ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা, ভারতীয় কবি তুলসীদাস

(১৫৩২-১৬২৪) জাতিভেদ প্রথা, সামাজিক অসাম্য ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন; অসামান্য ভারতীয় চিন্তানায়ক রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষার পক্ষ-সমর্থনে ও বিকাশসাধনে এবং ভারতীয় জনগণের ঐতিহ্যসমূহ অধ্যয়ন ও অব্যাহত রাখার ব্যাপারে প্রচুর কাজ করেছিলেন। সেই সময়ের সবচেয়ে প্রাগ্রসর ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে একটি গোষ্ঠী গঠন করেছিলেন, যার ভাবাদর্শগত নেতা হেনরি এল. ডিরোজিও (১৮০৭-১৮৩১) বস্তুবাদী অভিমত প্রচার করতেন। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকামী বহু গোষ্ঠী ও সমিতি সারা ভারত জুড়ে গঠিত হয়েছিল।

রুশ চিন্তানায়করা, বিশেষত, মিখাইল লমোনোসভ (১৭১১-১৭৬৫) ও আলেক্সান্দর রাদিশ্চেভ (১৭৪৯-১৮০২) প্রমুখ ১৮শ শতাব্দীতে দর্শনে বস্তুবাদী ধারার বিকাশসাধনে বিপুল অবদান রেখেছিলেন।

লমোনোসভ দার্শনিক প্রতিজ্ঞাগুলির গভীরতম প্রতিপাদন উপস্থিত করেছিলেন, সেগুলির সিদ্ধতা প্রতিপাদন করেছিলেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তথ্যাদি দিয়ে। সকল পদার্থ ও ব্যাপার এক বস্তুগত চরিত্রের — এই মত পোষণ করে তিনি দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের এক বস্তুবাদী উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বস্তু পরমাণুসমূহ দিয়ে গঠিত, সেগুলি একত্র সংযোজিত হয়ে অণু বা 'সূক্ষ্ম কণিকা' গঠন করে এবং সেগুলি দিয়েই সমস্ত 'সংবেদজ পদার্থ' গঠিত।

এই সর্বপ্রথম লমোনোসভ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাহায্যে বস্তু ও গতির চিরন্তনতা ও অবিনশ্বরতা প্রতিপাদন করেছিলেন, বস্তু ও গতির অক্ষয়তার নিয়ম আবিষ্কার করে। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে বস্তু ও গতির মধ্যেকার সংযোগ অবিচ্ছেদ্য, এবং বস্তু রয়েছে নিয়ত গতির অবস্থায়। অন্য সমস্ত অধিযন্ত্রবাদী বস্তুবাদীদের মতো, তিনিও গতিকে স্থানে পদার্থসমূহের গতিবিধিতে পর্যবসিত করেছিলেন, কিন্তু তাকে বিভক্ত করেছিলেন দুটি ধরনে: বাহ্যিক, যখন পদার্থটি অন্যান্য পদার্থের ব্যাপারে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে; এবং আভ্যন্তরিক, যখন সেই বিশেষ পদার্থটির গঠনকারী কণাগুলির অবস্থানে পরিবর্তন ঘটে।

অবধারণার তত্ত্বে, লমোনোসভ ধরে নিয়েছিলেন যে পৃথিবী জ্ঞেয়। তিনি মনে করতেন যে ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা পদার্থ ও ব্যাপারসমূহের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং তার পরে তত্ত্বগত চিন্তনক্রমে সংবেদজ তথ্যগুলির প্রক্রিয়ণের মধ্য দিয়ে অবধারণা ঘটে। অভিজ্ঞতা ও তত্ত্বগত চিন্তনের উপরে তিনি সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আরোপ করেছিলেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে সত্য সম্বন্ধে অবধারণা সম্ভব একমাত্র সেগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ আন্তঃসংযোগে।

তাই, ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের বস্তুবাদী অভিমতগুলি প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু এর সবগুলিই কিছুটা পরিমাণে চিহ্নিত ছিল অধিবিদ্যা দিয়ে, কিংবা বিকাশের, গুণগত প্রভেদের, প্রকৃতিতে দ্বন্দ্ব, প্রভৃতির অস্বীকৃতি দিয়ে, এবং এক অধিযন্ত্রবাদী

দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েও, অথবা গতির বহুবিধ রূপকে যান্ত্রিক রূপে, স্থানে পদার্থগুলির গতিবিধিতে পর্যবসিত করা দিয়ে, গুণগত প্রভেদগুলির বহুরূপতাকে যান্ত্রিক নিয়মগুলির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা দিয়ে। নিঃসন্দেহে তার কারণ ছিল সেই সময়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্তর, যে সময়ে শুধু জ্যোতির্বিদ্যা আর পদার্থবিদ্যা, প্রধানত বলবিদ্যার ক্ষেত্রে, মোটামুটি সুবিকশিত ছিল।

৫। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ও ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ক্লাসিকাল জার্মান দর্শন

ক্লাসিকাল জার্মান দর্শনের প্রতিনিধিরা বস্তুবাদ ও ডায়ালেকটিকসের সমস্যাগুলি আগেকার যেকোনো সময়ের চেয়ে আরও গভীরতার সঙ্গে বিশদ করেছিলেন।

ক্লাসিকাল জার্মান দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইমানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪)। অন্যান্য জিনিস ছাড়াও, যেটা তিনি করেছিলেন তা হল অবধারণা বিষয়ক তত্ত্বের কতকগুলি সমস্যাকে সূত্রায়িত করা এবং ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে অনেকখানি হারিয়ে-যাওয়া ডায়ালেকটিকসে আগ্রহ পুনর্জাগ্রত করা।

কাণ্ট প্রথমে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমস্যাগুলির প্রতি যথেষ্ট মনোনিবেশ করেছিলেন। যেমন, বিকীর্ণ বস্তুর মৌলিক পুঞ্জসমূহ থেকে সৌরজগতের প্রকৃতি গঠন সম্বন্ধে একটি প্রকল্প তিনি বিশদ করেছিলেন।

এঙ্গেলসের কথায়, সেই প্রকল্পটি পৃথিবী সম্বন্ধে আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা ফাটল তৈরি করেছিল।

পরে, কাণ্ট বিশুদ্ধ দার্শনিক সমস্যাগুলির দিকে মনোযোগ দেন। তাঁর দার্শনিক মততন্ত্র 'ভাববাদের সঙ্গে বস্তুবাদের সমন্বয়সাধন, দুটির মধ্যে এক আপোস, একটি মততন্ত্রের মধ্যে নানাধর্মী ও বিপরীত দার্শনিক মতধারাগুলির মিলন'।*

কাণ্ট বস্তুর বিষয়গত অস্তিত্ব স্বীকার করতেন, কিন্তু মনে করতেন যে পৃথিবী বিশৃঙ্খলাময়, সেখানে কোনো সমানুবর্তিতা নেই, এবং একমাত্র মানুষই সমস্ত ব্যাপারকে স্থান ও কালে বিন্যস্ত করে এবং সেগুলিকে আবশ্যিকতা, সমানুবর্তিতা ও কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রদান করে অবধারণার প্রক্রিয়ায় সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছু শৃঙ্খলা প্রবর্তন করে। তাঁর মতে, মানুষ নিজেই প্রপঞ্চময় জগৎকে এবং সেই জগতে ক্রিয়াশীল নিয়মগুলি সৃষ্টি করেছে। এখানে আমরা বস্তুবাদী থেকে ভাববাদী অবস্থানে চলে যাওয়া দেখতে পাই। কাণ্ট সংবেদনকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলে স্বীকার করতেন বটে, কিন্তু মনে করতেন যে বস্তুনিচয় ও ব্যাপারসমূহের সারমর্ম, 'স্বরূপী সত্তা', অজ্ঞেয়। কাণ্ট এইখানেই এক অজ্ঞাবাদী অবস্থানে এসে পড়েছিলেন।

গেওর্গ ভিলহেল্ম ফ্রিডরিখ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) ছিলেন ক্লাসিকাল জার্মান দর্শনের মহত্তম

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 14, p. 198.

প্রতিনিধি। তিনি এক দার্শনিক মততন্ত্র বিশদ করেছিলেন, যাতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সঙ্গে পৃথিবী সম্বন্ধে ভাববাদী অভিমতকে মেলানো হয়েছিল। হেগেল মনে করতেন যে পৃথিবীর অন্তঃসার ও ভিত্তি হল এক পরম ভাব, বা পরমাত্মা, যার অস্তিত্ব মানুষের বাইরে ও মানুষ-নিরপেক্ষভাবে। হেগেলের পরম ভাব কার্যত খোদ মানব চৈতন্য, মানুষ থেকে পৃথক এবং অতিপ্রাকৃত বিচারশক্তি হিসেবে স্থাপিত।

পরম ভাবের আত্ম-বিবর্তনের মধ্যে হেগেল নির্ণয় করেছিলেন তিনটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে, তিনি পরম ভাবের ধারণা করেছিলেন মানুষের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত আত্ম-বিবর্তনশীল এক ধারণাতন্ত্রের রূপে চিন্তন হিসেবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, পরম ভাব চলে যায় তার 'অপর সত্তার' মধ্যে এবং প্রকৃতিতে অঙ্গীভূত হয়, প্রকৃতি স্বয়ং বিকাশ-অক্ষম; হেগেলের কাছে, প্রকৃতি স্থানে আত্মোদ্ঘাটন করে শুধু মনশ্চক্ষে। তৃতীয় পর্যায়ে, প্রকৃতিতে অঙ্গীভূত পরম ভাব জন্ম দেয় মানবমন ও সামাজিক জীবনের।

হেগেলের মততন্ত্র ছিল বিষয়গত ভাববাদের মততন্ত্র, তাতে ছিল ধর্মের এক সূক্ষ্ম সাফাই, এবং বস্তুজগৎকে তাতে গণ্য করা হয়েছিল গৌণ একটা কিছু হিসেবে, ভাবগতর এক ব্যুৎপত্তিলব্ধ হিসেবে। কিন্তু সেই অবৈজ্ঞানিক মততন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে, হেগেল ডায়ালেকটিকসকে এমন প্রগাঢ় ও বিস্তৃতভাবে বিশদ করেছিলেন, যা আগে কোনো দার্শনিক কখনও করেন নি।

বিকাশের ধারণাটা হেগেলের সমস্ত দর্শনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তিনি মনে করতেন, যে কোনো ব্যাপারকেই দেখা উচিত তার আত্মপ্রকাশ, পরিবর্তন ও বিলুপ্তির অবস্থান থেকে। তিনি ডায়ালেকটিকসের বুনিয়াদি নিয়মগুলি আবিষ্কার ও সূত্রবদ্ধ করেছিলেন, এই ধারণাটা বিশদ করেছিলেন যে বিকাশের উৎস হল বিপরীতের সংগ্রাম, বস্তুনিচয় ও ব্যাপারসমূহের সহজাত আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বগুলি সকল গতি ও জীবনের মূল। অবধারণা সম্বন্ধেও তিনি এক দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন, বলেছিলেন যে সত্য একটি প্রক্রিয়া।

স্বভাবতই, হেগেলের ভাববাদী মততন্ত্র ও তার রক্ষণশীল রাজনৈতিক অভিমত তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির উপরে একটা প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছিল।

হেগেলের পদ্ধতির ত্রুটিগুলি কাটিয়ে ওঠা যেত এবং তাকে আরও বিকশিত করা যেত একমাত্র বস্তুবাদেরই ভিত্তিতে, যা নির্ভর করবে বিজ্ঞানের উপরে এবং পরক কোনো সংযোজন ছাড়াই পৃথিবীকে উপস্থিত করবে তা বস্তুতই যেমন, তেমনভাবে। সেই জন্যই, সেই সময়ে দার্শনিকদের সামনে বিষয়গত দাবি ছিল বস্তুবাদী অবস্থানসমূহের দিকে যাওয়া, এবং এক বস্তুবাদী ভিত্তিতে হেগেলের ভাববাদী দর্শনের কৃতিত্বগুলির সমালোচনাত্মক পর্যালোচনা করা।

জার্মান দার্শনিক লুডভিগ ফয়েরবাখ (১৮০৪-১৮৭২) সেই ঐতিহাসিক কাজটি আংশিকভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। বস্তুবাদের পক্ষ সমর্থনে এক দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে হেগেলের পরম

ভাব মানবমন ছাড়া আর কিছুই নয়, সেই মানবমনকে তার বাহন — মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বাহ্যিক পৃথিবীর এক স্বতন্ত্র সৃষ্টিশীল উৎসে পরিণত করা হয়েছে। তিনি দেখান যে হেগেলের দর্শনে পরম ভাব যে-ভূমিকা পালন করে, ঈশ্বরতত্ত্বে সেই ভূমিকা পালিত হয় ঈশ্বরের দ্বারা। তিনি বলেছিলেন, পরম ভাব ঈশ্বর থেকে ভিন্ন কিছু নয়, এবং হেগেলের দর্শন ঈশ্বরতত্ত্বেরই আরেকটি প্রকারভেদ মাত্র। ফয়েরবাখের মতে, চিন্তন মানুষের বাইরে ও মানুষ-নিরপেক্ষভাবে থাকতে পারে না, কেননা তা হল মানবমস্তিষ্কের, একটি গুণ-ধর্ম, তার ক্রিয়া, সেই ক্রিয়ায় আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরসম্পর্কিত। সুতরাং, হেগেল যেমন মনে করতেন তেমনভাবে চিন্তা (আধ্যাত্মিক) মুখ্য নয়, গৌণ, বস্তু, প্রকৃতির ব্যুৎপত্তিলব্ধ।

ফয়েরবাখ তাঁর দর্শনের মূল কেন্দ্র করেছিলেন মানুষকে এবং মানুষ যে প্রকৃতির একটি অংশ ও যে প্রকৃতি তাকে উৎপন্ন করেছে সেই প্রকৃতিকে; এবং তাঁর বস্তুবাদী অভিমত বিশদীকরণে নৃতত্ত্ববাদকে (anthropologism*) তাঁর প্রধান নীতি, প্রস্থান-বিন্দু করেছিলেন।

মানুষ যে প্রকৃতির একটি অংশ, আর তার চৈতন্য, তার চিন্তন যে প্রকৃতির এক গুণ-ধর্ম, তার উপরে সেই নীতি অনুযায়ী সঠিকভাবে জোর দিলেও, ফয়েরবাখ উপেক্ষা করেছিলেন অন্য দিকটি, এই

---

* গ্রীক anthropos (মানুষ) শব্দ থেকে।

ঘটনাটি যে মানুষ প্রকৃতির একটি অংশ বলে, একই সঙ্গে সামাজিক জীবনেরও একটি উৎপাদ, এবং তার চৈতন্য নির্ধারিত হয় শুধু তার দেহযন্ত্রে, বিশেষত তার মস্তিষ্কে ঘটমান শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াসমূহের দ্বারাই নয়, সামাজিক সম্পর্কের দ্বারাও, মানবজীবনের বৈষয়িক অবস্থার দ্বারাও।

বস্তু না চৈতন্য, কোনটি মুখ্য — এই প্রশ্নের এক বস্তুবাদী উত্তর দেওয়া ছাড়াও, ফয়েরবাখ সমানভাবে সঠিক এক উত্তর দিয়েছিলেন দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের দ্বিতীয় দিকটির: তিনি জগৎকে জ্ঞেয় বলে গণ্য করেছিলেন এবং কাণ্টের অজ্ঞাবাদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

সংবেদনগুলিকে তিনি দেখেছিলেন অবধারণার প্রক্রিয়ায় প্রস্থান-বিন্দু হিসেবে। তিনি মনে করতেন, এগুলি মানুষকে বিষয়গত বাস্তব সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য যোগায়। কিন্তু, চিন্তনও এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। ভাষান্তরে, সংবেদন ও চিন্তনের মধ্যে, সংবেদজ ও যুক্তিসহর মধ্যে ঘনিষ্ঠ আন্তঃসংযোগ ফয়েরবাখ বুঝতে পেরেছিলেন।

ফয়েরবাখ ধর্মের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার সমালোচনা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে ঈশ্বর অতিপ্রাকৃত কিছু নয়, ঈশ্বর মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল তাদের নিজেদের প্রতিরূপে ও সাদৃশ্যে। ঈশ্বরের প্রতি আরোপিত সমস্ত গুণ ও লক্ষণ যে রীতিমত মানবিক, এবং সেগুলি হয় ব্যক্তিমানুষের না হয় সামগ্রিকভাবে মানবজাতির গুণ

ও লক্ষণ, তা দেখিয়ে তিনি ধর্মের পার্থির শিকড়-গ্নলি উদ্ঘাটন করেছিলেন, ঈশ্বরকে স্বর্গ থেকে টেনে নামিয়েছিলেন মর্তে।

কিন্তু ফয়েরবাখ ধর্মের শ্রেণীগত সারমর্ম বোঝেন নি, ঈশ্বর ও লোকান্তরে বিশ্বাসের পিছনকার সামাজিক কারণগ্নলিও দেখান নি। সেই জন্যই ধর্মের সঙ্গে লড়াই করার কোনো বাস্তব উপায় তিনি দেখাতে পারেন নি। অধিকন্তু, তিনি ধর্মের সব কিছ্নরই বিরোধী ছিলেন না, আক্রমণ করেছিলেন শ্নধ্ন প্রথাগত ধর্মকে, যে ধর্মে ঈশ্বরকে এক অতিপ্রাকৃত সত্তা বলে ধারণা করা হয়। তিনি এক নতুন ধর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন, যার মধ্যে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করবে মান্নষ স্বয়ং, এবং যার প্রধান নীতি হবে আরেকজন মান্নষের প্রতি একজন মান্নষের ভালোবাসা।

ফয়েরবাখের কৃতিত্ব ছিল এই যে তাঁর দর্শন বস্তুবাদী নীতিসম্নহকে প্ননঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, যদিও প্নরনো অধিবিদ্যাগত ভিত্তির উপরে, ডায়ালেকটিকস ছাড়া, যাকে বর্জন করা হয়েছিল হেগেলের ভাববাদের সঙ্গে।

৬। ১৯শ শতাব্দীর র্নশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের দর্শন

অধিবিদ্যাবাদী বস্তুবাদের বহ্ন ত্র্নটি কাটিয়ে উঠেছিলেন র্নশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা, যাঁরা ১৮৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে নিজেদের দার্শনিক অভিমত

উপস্থিত করেছিলেন এবং কয়েক দশক ধরে সেই সব অভিমত বিশদ করেছিলেন; এঁরা হলেন: ভিস্‌সারিওন বেলিনস্কি (১৮১১-১৮৪৮), আলেক্সান্দর গের্ৎসেন (১৮১২-১৮৭০), নিকোলাই চের্নিশেভস্কি (১৮২৮-১৮৮৯), নিকোলাই দব্রোলিউবভ (১৮৩৬-১৮৬১), প্রমুখ।

রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা তাঁদের দার্শনিক অভিমতের ব্যাপারে নির্ভর করেছিলেন, এক দিকে, তাঁদের রুশ পূর্বসূরী লমোনোসভ ও রাদিশ্চেভের বস্তুবাদী দর্শনের উপরে, এবং অন্য দিকে, হেগেলের ডায়ালেকটিকস ও ফয়েরবাখের বস্তুবাদের উপরে। সেই সঙ্গে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমসাময়িক কৃতিত্বগুলির কিছুটা সামান্যীকরণ করেছিলেন তাঁরা।

ফয়েরবাখের প্রতিতুলনায়, রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা হেগেলের সমালোচনা করেছিলেন তাঁর ডায়ালেকটিকসকে বর্জন না করে এবং চেষ্টা করেছিলেন বস্তুবাদের সঙ্গে তাকে মেলাতে, তার একটা বস্তুবাদী ভাষ্য দিতে।

যেমন, গের্ৎসেন উচ্চ মূল্যায়ন করেছিলেন হেগেলের ডায়ালেকটিকসের, যা সাধারণভাবে গতির নিয়মগুলি এবং প্রকৃতি ও চিন্তনের বিকাশের নিয়মগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করেছিল, কিন্তু তিনি তাঁর সমালোচনা করেছিলেন অত্যধিক বিমূর্ত হওয়ার জন্য, বাস্তবের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে সংস্পর্শহীন হওয়ার জন্য, ভাববাদের জন্য। গের্ৎসেনের মতে, যার প্রকৃত, বাস্তব অস্তিত্ব আছে, সেটা শুদ্ধ সত্তা নয়, বস্তুগত

পদার্থসমূহ, যা দিয়ে প্রকৃতি তৈরি। অধ্যাত্মা আর চিন্তার কথা বলতে গেলে, সেগুলি হল প্রকৃতির বিকাশের পরিণতি, যে বস্তুগত সত্তাগুলি বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরে গিয়ে পোঁছেছে সেগুলির এক গুণ-ধর্ম।

রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের মতে, বাস্তবের সীমাহীন সংখ্যক গুণাবলী আছে এবং তা আছে এক চিরস্থায়ী, অন্তহীন গতি ও বিকাশের অবস্থায়। তাঁরা মনে করতেন, বিকাশের উৎস হল বিপরীতের সংগ্রাম ও পরিবর্তন রূপান্তর। তাঁরা এও উপলব্ধি করেছিলেন যে গতি ও প্রকৃতির বিকাশ চলাকালে পরিমাণের এক রূপান্তর ঘটে গুণে, আগে যা ছিল তা থেকে একটা কিছু নতুন ও ভিন্ন জিনিস আত্মপ্রকাশ করে। বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা, বিশেষত চের্নিশেভস্কি, বিভিন্ন কোণ থেকে প্রকৃতিতে ও সমাজে নিরাকরণের নিরাকরণের নিয়মের ক্রিয়াটি প্রদর্শন করেছিলেন, যা রূপসমূহের নিয়ত পরিবর্তন এবং পরে এক উচ্চতর স্তরে অতীতের প্রত্যাবর্তন, পুনরাবৃত্তির ব্যাখ্যা করে।

তাই, রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা অধিযন্ত্রবাদী ও অধিবিদ্যাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশে বর্জন করেছিলেন এবং ডায়ালেকটিকসকে বস্তুবাদের সঙ্গে মেলানোর ব্যাপারে, বস্তুবাদী ধারায় ডায়ালেকটিকসকে ব্যাখ্যা ও তার সিদ্ধতা প্রমাণ করার ব্যাপারে সামনের দিকে একটা পদক্ষেপ করেছিলেন।

রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের আরেকটি কৃতিত্ব ছিল অজ্ঞাবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের দৃঢ়পণ সংগ্রাম।

চের্নিশেভস্কি খোদ মানবজীবনের দিকে, মানুষের কর্মপ্রয়োগের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে অজ্ঞাবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, বলেছিলেন যে জগৎ জ্ঞেয় এবং আমাদের সংবেদজ প্রত্যক্ষণ বাস্তবের এক সঠিক প্রতিফলন।

রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা দার্শনিক তত্ত্বগুলির অনুধ্যানমূলক চরিত্র কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারেও কিছু অগ্রনীতি করেছিলেন। তাঁরা পৃথিবীকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গের্ৎসেন ডায়ালেকটিকসকে দেখেছিলেন 'বিপ্লবের বীজগণিত' হিসেবে।

তাঁদের সামাজিক অভিমতের কথা বলতে গেলে, রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা কিছু কিছু বস্তুবাদী বক্তব্য সত্ত্বেও ভাববাদীই থেকে গিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গ ৩।

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের আত্মপ্রকাশ ও তার বিকাশের প্রধান প্রধান পর্যায়

১। মার্কসীয় দর্শনের আত্মপ্রকাশের পূর্বশর্ত

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের আত্মপ্রকাশ হল বৈজ্ঞানিক চিন্তার ও সামগ্রিকভাবে সমাজের বিকাশের এক অনিবার্য ফল।

কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) কর্তৃক দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দর্শন সৃষ্টি এক বিরাট বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব ছিল। লেনিন যে কথা বলেছেন, বৈপ্লবিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস সত্যকার এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপহার দিয়েছিলেন, শ্রমিক শ্রেণীকে তার ঐতিহাসিক কর্মব্রত বুঝতে শিখিয়েছিলেন এবং তার পক্ষে শোষণমূলক সমাজ নিশ্চিহ্ন করে সমাজতন্ত্র গড়ার বাস্তব উপায়ের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন।

মার্কসীয় দর্শনের আত্মপ্রকাশ আপতিক ঘটনা ছিল না, বরং মানবজাতির প্রগতির ফল ছিল। সমগ্র মার্কসবাদের মতোই, মার্কসীয় দর্শন বিশদীকৃত হতে পারত একমাত্র সমাজের, দর্শনের এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানগুলির দীর্ঘ বিকাশেরই ফলে। মার্কস ও এঙ্গেলস তা সূত্রবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কারণ তার জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানগত ও তত্ত্বগত পূর্বশর্তসমূহ ইতিমধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

ক) সামাজিক-অর্থনৈতিক পূর্বশর্তগুলি

পুঁজিবাদী বিকাশের পথে মানবসমাজের উত্তরণ ছিল বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির আত্মপ্রকাশের পক্ষে সাধারণ সামাজিক পূর্বশর্ত।

মধ্য-১৯শ শতাব্দী নাগাদ, পুঁজিবাদ অনেকগুলি দেশে সামন্ততন্ত্রকে স্থানচ্যুত করেছিল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দুটি প্রধান শ্রেণী হিসেবে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের জন্ম দিয়েছিল। পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রেণী সম্পর্কের জটিলতা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল। বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা শোষিত ও প্রাথমিকতম মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত প্রলেতারিয়েত বিদ্যমান বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উত্থিত হচ্ছিল।

প্রথমে, প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, একক পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত কর্ম-তৎপরতার রূপে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা আরও

সংগঠিত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ১৮৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রিটেনে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ ও সংগ্রাম দেখা গিয়েছিল। তারা দাবি করেছিল উন্নততর কাজের অবস্থা, সংক্ষিপ্ততর কাজের সময়, অধিকতর মজুরি, ইত্যাদি।

স্বীয় অধিকারবলে এক শ্রেণী হিসেবে সফল সংগ্রাম চালানোর জন্য প্রলেতারিয়েতের নিজের স্বল্প-মেয়াদি ও চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্বন্ধে, কার্যকর উপায়-পদ্ধতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার ছিল। আর সেটা সম্ভব ছিল একমাত্র এক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই। তাই দেখা দিয়েছিল এমন এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অত্যাবশ্যকীয়তা, যা প্রলেতারিয়েতকে সমাজের বিকাশ নিয়ম ও তার বৈপ্লবিক রূপান্তরের নিয়ম বুঝতে সক্ষম করতে পারত।

তাই, স্বয়ং জীবনই, পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের বিকাশই বিজ্ঞান ও সমাজের সামনে নির্ধারণ করেছিল এক নতুন কর্তব্যকর্ম, প্রলেতারিয়েত ও অন্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের জন্য তাদের সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজতন্ত্র অর্জনের সংগ্রামে এক ভাবাদর্শগত অস্ত্র হিসেবে এক বৈপ্লবিক তত্ত্ব সূত্রবদ্ধ করার কর্তব্যকর্ম।

মার্কসবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তায় সাড়া দিয়ে, মার্কসীয় দর্শন — দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ — ছিল তার অঙ্গীয় অংশ ও তত্ত্বগত ভিত্তি।

খ) প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানগত পূর্বশর্তগুলি

পৃথিবী সম্বন্ধে এক বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির জন্য প্রলেতারিয়েতের প্রয়োজন দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিকাশের এক বলিষ্ঠ প্রণোদনা ছিল। কিন্তু একমাত্র সেই প্রয়োজনটাই অ-পর্যাপ্ত হত। আরও যা দরকার ছিল তা হল বৈজ্ঞানিক বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তর, সামগ্রিকভাবে পৃথিবী ও বিশেষভাবে সামাজিক জীবন সম্বন্ধে এক বস্তুবাদী বোধের জন্য প্রত্যয়জনক তথ্যাদি, এবং অন্তর্নিহিত নিয়ম অনুযায়ী প্রকৃতি ও সমাজের অন্তহীন বিকাশের প্রমাণ।

১৯শ শতাব্দীর গোড়ায়, বিজ্ঞান এমন একটা স্তরে পৌঁছেছিল যা ডায়ালেকটিকসের প্রধান প্রধান নীতিকে পৃথিবী সম্বন্ধে এক বস্তুবাদী উপলব্ধির আলোকে তত্ত্বগতভাবে প্রতিপাদন করার বাস্তব সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছিল। এক বৈজ্ঞানিক, দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট তথ্য সঞ্চিত হয়েছিল।

সেই সময়ে, অধ্যয়নাধীন পদার্থ ও ব্যাপারসমূহ সম্বন্ধে আলাদা আলাদা তথ্যের সঞ্চয়ন, বর্ণনা ও শ্রেণীবদ্ধকরণ থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চলেছিল সেই সমস্ত পদার্থ ও ব্যাপারগুলির মধ্যে ঘটমান প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ এবং সেগুলির মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করার দিকে। সেগুলির সারমর্ম বুঝতে এবং সেগুলির পরিবর্তন ও বিকাশের সমানুবর্তিতা প্রকাশ করতে তা অবশ্যম্ভাবীরূপেই সাহায্য করেছিল।

এঙ্গেলস যেমন বলেছেন, অভিজ্ঞতামূলক প্রাকৃতিক

বিজ্ঞান রূপান্তরিত হয়েছিল এক 'তত্ত্বগত জ্ঞানে এবং অর্জিত ফলগুলির সামান্যীকরণের দ্বারা, প্রকৃতি সম্বন্ধে এক বস্তুবাদী জ্ঞানের মততন্ত্রে'।* বলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশ পৃথিবীর বস্তুগত ঐক্যকে, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলির দ্বান্দ্বিক চরিত্রকে আরও বেশি প্রত্যয়জনকভাবে প্রদর্শন করেছিল।

মধ্য-১৯শ শতাব্দীর তিনটি বিরাট আবিষ্কার দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী অভিমত গঠনের পক্ষে বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ ছিল। ১৮৪২-১৮৪৫ সালে, জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী জুলিয়াস রবার্ট মায়ার শক্তির অক্ষয়তা ও রূপান্তরের নিয়ম আবিষ্কার করেন। মায়ার থেকে স্বতন্ত্রভাবে, ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী উইলিয়ম আর. গ্রোভ ও জেমস পি. জুল, ওলন্দাজ ইঞ্জিনিয়ার লুডউইগ আ. কোলডিং, এবং রুশ বিজ্ঞানী হেইনরিখ লেন্‌ৎসও সেই নিয়মটি আবিষ্কার করেছিলেন। সেই নিয়মটি আবিষ্কৃত হওয়ায় দেখা গেল যে যান্ত্রিক বল, তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, চৌম্বকত্ব ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহ, অর্থাৎ, বস্তুর গতির বহুবিধ রূপ, বিচ্ছিন্ন নয়, আন্তঃসংযুক্ত, এবং নির্দিষ্ট অবস্থায় সেগুলি শক্তির কোনো হানি না ঘটিয়েই একটি অপরটিতে রূপান্তরিত হয়। এই আবিষ্কার প্রমাণ করল যে শক্তির কোনো উদ্ভব বা বিলোপ নেই, আছে

* Frederick Engels, *Dialectics of Nature*, Progress Publishers, Moscow, 1974, p. 196.

শুধু শক্তির একটি রূপের আরেকটি রূপে অবিরত রূপান্তর। এঙ্গেলস সেই নিয়মটিকে অভিহিত করেছিলেন প্রকৃতির অনাপেক্ষিক নিয়ম বলে। এটিই হল পৃথিবী সম্বন্ধে দ্বান্দ্বিক অভিমতের প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানগত ভিত্তি।

উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের বিকাশও অধিবিদ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে দুর্বল করেছিল। ১৮৩০-এর দশকে, রুশ গবেষক পাভেল গরিয়ানিনভ, চেক জীববিজ্ঞানী জান পুরকিণে, ও জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী মাথিয়াস জাকব শ্লেইডেন ও থিওডর শোয়ান উদ্ভিদ ও প্রাণীর গঠনকাঠামোর কোষীয় তত্ত্ব সূত্রবদ্ধকরণের কাজ সম্পূর্ণ করেন। পুরনো যেসব অধিবিদ্যাগত ধারণা উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের মধ্যে ঐক্য, এবং সেগুলির বহুবিধ প্রজাতির মধ্যেও ঐক্য দেখতে অপারগ হয়েছিল, সেই ধারণাগুলি সেই তত্ত্ব ধ্বংস করে দিয়েছিল। তা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবসত্তার সমরূপ গঠনকাঠামো প্রতিপন্ন করেছিল, সেগুলির বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছিল, এবং জীববিদ্যার অধিকতর বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিল।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তৃতীয় যে বিরাট আবিষ্কারটি প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা উপলব্ধিতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল, সেটির আবিষ্কর্তা ছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম অবস্থায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন থেকে অসংখ্য তথ্যের ভিত্তিতে ডারউইন এই প্রত্যয়ে উপনীত হন যে প্রজাতিগুলি অপরিবর্তনীয় নয়, বরং সেগুলি পরিবর্তিত হতে থাকে। তিনি প্রত্যয়জনকভাবে দেখান

যে সমস্ত বিদ্যমান প্রজাতি প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভূত হয়েছে অন্যান্য, পূর্ববর্তী প্রজাতি থেকে। ডারউইনের মতে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতিগুলি পরিবর্তিত হয়েছিল প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম নির্বাচনের ফলে। ডারউইন 'প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রজাতিগুলি অসংযুক্ত, আপতিক, 'ঈশ্বর-কর্তৃক সৃষ্ট' ও পরিবর্তনাতীত — এই অভিমতের অবসান ঘটান, এবং প্রজাতিসমূহের পরিবর্তনীয়তা ও পর্যায়-পরম্পরা প্রতিপাদন করে জীববিদ্যাকে সর্বপ্রথম পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্থাপন করেন।' ।*

তাই, শক্তির অক্ষয়তা ও রূপান্তরের নিয়মটি বস্তুবাদের অন্যতম প্রধান প্রতিজ্ঞার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেছিল, সেই প্রতিজ্ঞাটি এই যে বস্তু ও গতি চিরন্তন, অসৃজনীয় ও অবিনাশী। সেই নিয়ম বস্তুর গতির রূপগুলির ঐক্য ও বৈচিত্র্য, সেগুলির পরিবর্তন-রূপান্তরের সমানুবর্তিতাগুলি দেখিয়েছিল। সমস্ত জীবন্ত জীবসত্তার কোষীয় গঠনকাঠামো আবিষ্কার উদ্ভিদ আর প্রাণীর মধ্যে বেড়াগুলি ভেঙে ফেলে বিকাশের সাধারণ নিয়ম-শাসিত জৈব পৃথিবীর ঐক্য প্রমাণ করেছিল। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব দেখিয়েছিল জৈব পৃথিবী পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়ে চলে। সেই তত্ত্ব অনুযায়ী উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমস্ত বর্তমান প্রজাতিই দীর্ঘকালীন বিবর্তনের ফল। ডারউইন

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 1, 1977, p. 142.

বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে সমস্ত উচ্চতর, জটিল জীবন্ত জীবসত্তা বিবর্তিত হয়েছে নিম্নতর, সরল জীবসত্তা থেকে এবং স্বয়ং মানুষই প্রাণীজগতের এক দীর্ঘকালীন বিবর্তনের ফল। বিবর্তন তত্ত্ব ডায়ালেকটিকসের মূল ধারণাটিকে, বিকাশের, সরল থেকে জটিলে, নিম্নতর থেকে উচ্চতরতে উত্তরণের ধারণাটিকে প্রতিপন্ন করেছিল।

ভাষান্তরে, ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কৃতিত্বগুলিই বস্তুবাদের প্রধান প্রতিজ্ঞাগুলি ও ডায়ালেকটিকসের নীতিগুলি সূত্রবদ্ধ ও প্রতিপাদন করা সম্ভব করে তুলেছিল।

গ) তত্ত্বগত পূর্বশর্তগুলি

সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে, মার্কসীয় দর্শন নির্ভর করেছিল সে যুগের দার্শনিক চিন্তার উপরে। বহু শতাব্দী ধরে দার্শনিকরা যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ ও প্রগতিশীল ভাবধারণাা সূত্রবদ্ধ করেছিলেন, সেই চিন্তা সেগুলিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং বিশদ করেছিল। তার মানে এই যে ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আত্মপ্রকাশের তত্ত্বগত পূর্বশর্তগুলিও গড়ে উঠেছিল। ১৯শ শতাব্দীর ক্লাসিকাল জার্মান দর্শনের প্রগতিশীল ভাবধারণা, সর্বোপরি হেগেল ও ফয়েরবাখের দর্শন ছিল মার্কসীয় দর্শনের সাক্ষাৎ তত্ত্বগত উৎস।

মার্কস ও এঙ্গেলসের দার্শনিক অভিমত রূপ পরিগ্রহ করেছিল বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের অবস্থান থেকে হেগেলের ডায়ালেকটিকস আর ফয়েরবাখের বস্তুবাদের এক সমালোচনাত্মক সমীক্ষার মধ্য দিয়ে।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের যৌবনকালে হেগেলের দর্শনে বিরাট আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। হেগেল ছিলেন বিষয়মুখ ভাববাদী, কিন্তু সেই ভাববাদী ভিত্তির উপরে তিনি ডায়ালেকটিকসের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন প্রগাঢ়ভাবে।

ডায়ালেকটিকসের প্রধান প্রধান নীতি, নিয়ম ও ক্যাটিগরি বা মূল প্রত্যয় হেগেল সূত্রবদ্ধ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে ভাবধারণাগুলি বিকশিত হয় ধাপে-ধাপে, নিম্নতর থেকে উচ্চতর রূপগুলিতে, এই বিকাশ চলাকালে পরিমাণের একটা রূপান্তর ঘটে গুণে, এবং আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধগুলি হল বিকাশের উৎস। ডায়ালেকটিকসের প্রধান প্রধান মূল প্রত্যয়ের মধ্যে আন্তঃসংযোগ, সেগুলির পারস্পরিক পরিবর্তনীয়তাও তিনি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ডায়ালেকটিকস ছিল ভাববাদী, মানুষ ও মহাবিশ্বের সীমা-উত্তীর্ণ এক চৈতন্যের: এক ‘পরম ভাব’ বা ‘বিশ্ব আত্মার’ ডায়ালেকটিকস। অধিকন্তু, হেগেল অতীত বিশ্লেষণ করার কাজে ডায়ালেকটিকসের নিয়মগুলি ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে সেগুলি প্রয়োগ করেন নি।

এক বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক অবস্থান গ্রহণ করে মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের পক্ষ-সমর্থন

করেছিলেন। এর ফলে তাঁরা মানুষের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বার্থের নিয়ামক ভূমিকা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন যে উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানাই সামাজিক অসাম্য ও শ্রেণী সংগ্রামের মূল কারণ। এ সবই হেগেলের দর্শনের ভাববাদী বনিয়াদকে দুর্বল করেছিল।

মার্কস ও এঙ্গেলসের অভিমতকে রূপ দেওয়ার ব্যাপারে ফয়েরবাখের বস্তুবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ফয়েরবাখ ভাববাদ ও ধর্মকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে দর্শনের উচিত প্রকৃতি ও মানুষকে অধ্যয়ন করা; মানুষকে তিনি দেখেছিলেন প্রকৃতির দীর্ঘকালব্যাপী বিকাশের এক ফল হিসেবে। তিনি মনে করতেন, চৈতন্য প্রকৃতিকে প্রতিফলিত ও অবধারণা করে। হেগেলের 'পরম ভাব', যা নাকি পৃথিবীকে সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে পৃথিবীকে সৃষ্টি করে ভগবানরা নয়, বরং মানুষরা, যারা ভগবানদের নিজেদের প্রতিরূপে ও সাদৃশ্যে সৃষ্টি করে তারা যে অবস্থায় বাস করে সেই অবস্থা-সাপেক্ষে।

ফয়েরবাখ-কৃত ভাববাদী দর্শনের সমালোচনাত্মক বিচার, মার্কস ও এঙ্গেলসকে এক দৃঢ় বস্তুবাদী অবস্থান গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল, কিন্তু তাঁরা ফয়েরবাখের নিষ্ঠাবান অনুগামী ছিলেন না, কেননা তাঁর বস্তুবাদ ছিল অধিবিদ্যামূলক এবং, তা ছাড়াও, তাঁর দার্শনিক

তত্ত্বে সামাজিক-রাজনৈতিক সংগ্রাম অন্তর্ভুক্ত হয় নি, কর্মপ্রয়োগের ভূমিকা দেখানো হয় নি।

হেগেলের ডায়ালেকটিকসকে সমালোচনাত্মকভাবে পুনর্বিন্যস্ত করে, মার্কস ও এঙ্গেলস তা থেকে ভাববাদকে বর্জন করেছিলেন এবং প্রকৃতই বিদ্যমান পৃথিবীর অবধারণা ও বৈপ্লবিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করেছিলেন। সেই সঙ্গে, ফয়েরবাখের বস্তুবাদকেও সমালোচনাত্মকভাবে পুনর্বিন্যস্ত করে মার্কস ও এঙ্গেলস তা থেকে অধিবিদ্যা আর অনুধ্যানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিয়েছিলেন, এবং তাকে জীবনের সংস্পর্শে, শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের বন্ধন-মোচনের সংগ্রামের সংস্পর্শে নিয়ে এসেছিলেন।

২। দর্শনে মার্কস ও এঙ্গেলস-কৃত বিপ্লবের সারমর্ম

মার্কস ও এঙ্গেলসের সৃষ্ট তত্ত্ব দর্শনের ইতিহাসে এক বুনিয়াদি বিপ্লবকে, বিজ্ঞানের বিকাশে এক অকৃত্রিম বিপ্লবকে চিহ্নিত করেছিল।

সেই বিপ্লবের সারমর্ম উন্মোচন করার অর্থ হল দার্শনিক চিন্তনে মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রবর্তিত নতুন উপাদানগুলি দেখানো, তাঁদের তত্ত্ব আর আগেকার দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যেকার প্রভেদ দেখানো।

প্রধান প্রভেদটা রয়েছে তাঁদের তত্ত্বের সামাজিক সারবস্তুর মধ্যে। মার্কস ও এঙ্গেলস অতি-গুরুত্বপূর্ণ

সমস্ত দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁদের তত্ত্বের প্রধান সামাজিক গুরুত্ব এইখানে যে তা হল বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি।

বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের দার্শনিক তত্ত্বগুলি ব্যতীত, আগেকার সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বই কোনো না কোনো রূপে সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির সামাজিক প্রয়োজন ও স্বার্থকে প্রকাশ করেছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস সৃষ্টি করেছিলেন এক নতুন দর্শন, যা শ্রমজীবী ও শোষিত জনসাধারণের বুনিয়াদি শ্রেণীস্বার্থ পূরণ করে। মার্কসীয় দর্শন হল শ্রমিক শ্রেণীর হাতে এক ভাবাদর্শগত অস্ত্র, তা সমস্ত শ্রমজীবী জনগণকে দেখায় তাদের অর্থনৈতিক ও আত্মিক দাসত্বের অবসান ঘটানোর পথ, সামাজিক বন্ধন-মোচনের পথ। 'দর্শন যেমন তার **বস্তুগত** অস্ত্র খুঁজে পায় প্রলেতারিয়েতের মধ্যে, তেমনি প্রলেতারিয়েত তার **আত্মিক** অস্ত্র খুঁজে পায় দর্শনের মধ্যে।'* তাই, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত মার্কসীয় দর্শনকে গ্রহণ করেছে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের ক্ষমতার জন্য, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের জন্য সংগ্রামে এক ভাবাদর্শগত অস্ত্র হিসেবে।

মার্কস ও এঙ্গেলস-কর্তৃক বিকশিত দর্শনের একটি বড় সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল কর্মপ্রয়োগের সঙ্গে, শ্রমজীবী জনগণের বৃহদংশের স্বার্থে পৃথিবীর

---

* Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 3, Progress Publishers, Moscow, 1976, p. 187.

বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেই সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে মার্কস লিখেছিলেন, 'দার্শনিকরা পৃথিবীকে নানাভাবে শুধু **ব্যাখ্যাই করেছেন**; আসল কথা হল তাকে **বদলানো**।'* কিন্তু পৃথিবীকে বদলানোর জন্য তার অস্তিত্ব ও বিকাশের নিয়মগুলি জানা উচিত এবং সেগুলিকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া উচিত। তার জন্যই দরকার কঠোরভাবে বিজ্ঞানসম্মত এক দার্শনিক তত্ত্ব, এক গভীর বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের দর্শনে সেই লক্ষ্য অর্জন করেছিলেন এইভাবে।

প্রথম, বস্তুবাদ ও ডায়ালেকটিকসকে তাঁরা মিলিয়েছিলেন। আগেকার বস্তুবাদী ও দ্বান্দ্বিক তত্ত্বগুলি অসংগতিপূর্ণ ছিল; বস্তুবাদ ছিল হয় স্বতঃস্ফূর্ত, না হয় আধিবিদ্যক ও আধিযন্ত্রবাদী, আর ডায়ালেকটিকস ছিল ভাববাদী।

মার্কস ও এঙ্গেলস বস্তুবাদকে আধিবিদ্যা থেকে মুক্ত করে এবং ডায়ালেকটিকসকে ভাববাদ থেকে মুক্ত করে দুটিকেই সৃষ্টিশীলভাবে পুনর্বিচার করেছিলেন। লেনিন যে কথা বলেছেন, তাঁরা বস্তুবাদকে ডায়ালেকটিকস দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিলেন এবং ডায়ালেকটিকসকে স্থাপন করেছিলেন একটা বাস্তব ভিত্তির উপরে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিকাশসাধনের অর্থ

---

* Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 5, 1976, p. 5.

ছিল এক সত্যকার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির, এক প্রগাঢ় বিজ্ঞানসম্মত দর্শনের বিকাশসাধন।

দ্বিতীয়, মার্কস ও এঙ্গেলস বস্তুবাদ ও ডায়ালেকটিকসকে সামাজিক জীবন অধ্যয়ন ও তার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছিলেন। পূর্ববর্তী বস্তুবাদীরা অসংগতিপূর্ণ ছিলেন, তাঁরা শুধু প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলিরই বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিতেন, অথচ সামাজিক ব্যাপার ও প্রক্রিয়াসমূহের ব্যাখ্যায় ভাববাদেরই প্রাধান্য ছিল। সমাজের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ফলে, বস্তুবাদ শুধু যে বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠেছিল তাই নয়, হয়ে উঠেছিল সুসংগত ও সম্পূর্ণ, যুগপৎ দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক।

দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সৃষ্টি করে মার্কস ও এঙ্গেলস দর্শনে এক বিপ্লব সাধন করেছিলেন। পৃথিবীর এবং তার পরিবর্তন ও বিকাশের নিয়মগুলির এক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা যা যোগায়, সেই দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ শুধু একটা বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, বাস্তবের বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনের এক পদ্ধতিও বটে।

৩। মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের সৃষ্টিশীল চরিত্র

দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সারগতভাবে সৃষ্টিশীল। তার কারণ হল নিম্নলিখিত বিষয়গুলি। প্রথম, নিয়ত পরিবর্তমান ও বিকাশমান পৃথিবীর ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তমান নির্দিষ্ট

ঐতিহাসিক অবস্থা অনুযায়ী তা বিকশিত হয়ে চলে ও আত্মোৎকর্ষসাধন করতে থাকে, এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক উপাত্ত ও ব্যবহারিক বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়। দ্বিতীয়, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বিকশিত হয়ে চলে কারণ তা হল বিপ্লবী সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের হাতে এক তত্ত্বগত অস্ত্র, পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক অবধারণা ও বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনের বলিষ্ঠ হাতিয়ার। সেই ভূমিকা পালন করার জন্য তার সর্বদাই জীবনের সঙ্গে, বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়োগের সঙ্গে সংস্পর্শ থাকা দরকার, ব্যবহারিক প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া, যা কিছু নতুন সেগুলি অবিলম্বে প্রণিধান করা এবং জনসাধারণকে সেই দিকে অভিমুখী করা দরকার। তৃতীয়, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সৃষ্টিশীল, কারণ তা সমালোচনামূলক ও আত্ম-সমালোচনামূলক। যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও প্রতিজ্ঞা বাস্তবসম্মত ও সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্নবায়নের, সমাজপ্রগতির চাহিদাগুলির উপযুক্ত শুধু সেগুলিকেই তা ধারণ করে রাখে। দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠাতারা বলেছিলেন যে তা সৃষ্টিশীল এই জন্য যে তা অন্ধমত নয়, বরং কর্মের পথনির্দেশ।

মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রতিষ্ঠিত দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সৃষ্টিশীলভাবে বিকশিত হয়েছে লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪) দ্বারা, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা, এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের দ্বারা।

১৯শ শতাব্দীর শেষ ও ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ভাববাদ ও অধিবিদ্যামূলক অভিমতের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামে লেনিন দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির যাথার্থ্য সমর্থন করেছিলেন এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করেছিলেন। সেই বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান নীতিগুলিকে তিনি সর্বতোভাবে প্রতিপাদন ও বিকশিত করেছিলেন। তিনি বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের বুনিয়াদি নীতি, নিয়ম ও বর্গগুলিকে আরও বিশদ করেছিলেন ও সেগুলির সিদ্ধতা প্রতিপন্ন করেছিলেন এবং পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক অবধারণাকে তার বৈপ্লবিক ও ব্যবহারিক রূপান্তরের সঙ্গে যুক্ত করে দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী অবধারণা তত্ত্বকে সৃষ্টিশীলভাবে বিকশিত করেছিলেন।

মার্কস ও এঙ্গেলসের দার্শনিক তত্ত্ব সৃষ্টিশীলভাবে বিকশিত করার সঙ্গে সঙ্গে লেনিন তার নীতিগুলির ব্যবহারিক রূপায়ণও পরিচালনা করেছিলেন। তিনি সামাজিক বিকাশের সমানুবর্তিতার এক সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণ দিয়েছিলেন, মানব জীবনের বৈষয়িক অবস্থার নিয়ামক গুরুত্ব প্রতিপাদন করেছিলেন এবং, সেই সঙ্গে, বিপ্লবী তত্ত্বের বিরাট গুরুত্ব দেখিয়েছিলেন। সেই তত্ত্বের নীতিগুলির উপরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি পার্টি, যার পরিচালনাধীনে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণ রাশিয়ায় পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ঘটিয়ে পৃথিবীর প্রথমতম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে।

নতুন ঐতিহাসিক অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের

তত্ত্ব বিকশিত করে লেনিন প্রমাণ করেছিলেন যে একটা বিপ্লব একাধিক দেশে অথবা আলাদা একটি দেশে প্রারম্ভিকভাবে জয়যুক্ত হতে পারে, এবং ইতিহাস সেই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছে।

সেই তত্ত্ব বিশদ করে লেনিন বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামকে জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ জাতিগুলির মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে মেলানোর প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেছিলেন। যে সমস্ত দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাদের বহুযুগের পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল তাদের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা ও অবস্থাও তিনি প্রতিপাদন করেছিলেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস-কর্তৃক উপস্থাপিত প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের ধারণাটি লেনিন বিশদ করেছিলেন এবং তার সারমর্ম, কর্তব্যকর্ম, ব্যবস্থাপ্রণালী ও অধিকতর বিকাশের উপায় প্রকাশ করে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বে তার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছিলেন। শ্রমজীবী জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি রাশিয়ার জন্য প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা উপযোগী রূপটি আবিষ্কার করেছিলেন, এবং অন্যান্য রূপের সম্ভাবনাও দেখিয়েছিলেন।

লেনিন ও তাঁর কাজকর্ম মানবজাতির জীবনে গোটা একটা বৈপ্লবিক যুগকে সূচিত করে। সমগ্র ঐতিহাসিক কর্মপ্রয়োগ তাঁর মতবাদের যাথার্থ্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে।

মার্কসীয় দর্শনের বিকাশে লেনিনীয় পর্যায়টির অন্তর্ভুক্ত হল লেনিনের সহকর্মীদের রচনাদি, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দেশের মার্কসবাদ-লেনিনবাদী পার্টিগুলির নেতৃবৃন্দের রচনাদি এবং সারা পৃথিবী জুড়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দার্শনিকদের গবেষণাকর্মগুলিও।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তার ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে তার তত্ত্ব ও পদ্ধতিতত্ত্বকে সৃষ্টিশীলভাবে বিকশিত করে চলেছে, সমৃদ্ধ হয়েছে নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা দিয়ে এবং পৃথিবীতে আরও বেশিসংখ্যক অনুগামীকে নিজের দিকে টেনে এনেছে। আমাদের কালে তার অধিকতর বিকাশ নির্ধারিত হয় পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বে পৃথিবীর প্রগতিশীল শক্তিগুলির বৈপ্লবিক সংগ্রামের কর্তব্যকর্ম দিয়ে, অনেকগুলি দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কর্মপ্রয়োগ ও বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দিয়ে। দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব ও পদ্ধতিতত্ত্ব আরও বিকশিত হচ্ছে মানবজাতির সামাজিক প্রগতি সংক্রান্ত সমস্যাবলী সমাধানের সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিকাশের সমানুবর্তিতা, উপনিবেশবাদের কবল থেকে সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির সমাজতন্ত্র-অভিমুখী বিকাশ, ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও বিশ্বব্যাপী তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধ রোধের সম্ভাবনা, জনসাধারণের স্বার্থে বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত

বিপ্লবের কৃতিত্বগুলির ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আরও অনেক জটিল সমস্যা সমাধানের সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের আত্মপ্রকাশের মতোই, তার বিকাশে প্রতিটি পর্যায় প্রতিফলিত করে এক সাধারণ সমানুবর্তিতাকে: বৈপ্লবিক রূপান্তর ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির জরুরি সমস্যাগুলি সমাধানের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে।

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের সৃষ্টিশীল বিকাশের প্রশ্নটি তীব্র ভাবাদর্শগত সংগ্রামের এক কেন্দ্রবিন্দু ছিল ও এখনও আছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শত্রুরা — সব ধরনের বুর্জোয়া ভাবাদর্শবাদী আর সংশোধনবাদীরা — সেই অখণ্ড-সংবদ্ধ মতবাদকে দুর্বল করার চেষ্টা করে চলেছে। তারা তরুণ মার্কসের অভিমতের প্রতিতুলনা করে পরিণত মার্কসবাদের সঙ্গে, মার্কসের নিজের অভিমতের প্রতিতুলনা করে এঙ্গেলসের অভিমতের সঙ্গে, এবং মার্কসবাদের প্রতিতুলনা করে লেনিনবাদের সঙ্গে। তারা ভৌগোলিকভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে 'পাশ্চাত্য' ও 'প্রাচ্যে' ভাগাভাগি করতেও চেষ্টা করে, এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের 'ইউরোপীয়', 'এশীয়', 'লাতিন আমেরিকান' ও 'আফ্রিকান' ভাষ্য তৈরি করারও চেষ্টা করে।

কিন্তু মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদের সৃষ্টিশীল সারমর্ম হেতু, এই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। জীবন, সামাজিক কর্মপ্রয়োগই সেই

মতবাদের অখণ্ড-সংবদ্ধতা ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা দেখায়, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী ও অন্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের মৌল স্বার্থ রক্ষায় তার নীতিনিষ্ঠ সুসংগতি দেখায়। একটা বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতত্ত্ব হিসেবে মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের গভীর বৈজ্ঞানিক চরিত্র ও পক্ষীয় অঙ্গীকারবদ্ধতার অজেয় শক্তিকে তা প্রদর্শন করে।

প্রসঙ্গ ৪।

বস্তু ও তার অস্তিত্বের রূপগুলি

দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের গভীরভাবে প্রতিপাদিত এক বিজ্ঞানসম্মত উত্তর বস্তু ও চৈতন্যের চরিত্র সম্বন্ধে একটা জ্ঞান পূর্বানুমান করে নেয়। বস্তুর ধারণাটি হল বস্তুবাদী দর্শনের প্রারম্ভিক প্রস্থান-বিন্দু। বস্তু ও তার অস্তিত্বের রূপগুলি আরও খুঁটিয়ে বিচার করা যাক।

১। বস্তু কী?

মানুষ পদার্থ ও ব্যাপারসমূহের এক সীমাহীন বৈচিত্র্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেগুলির মধ্যে আছে অদৃশ্য প্রাথমিক কণা থেকে শুরু করে অতিকায় নক্ষত্রমণ্ডলী, সরলতম জীবাণু

থেকে উচ্চতর প্রাণী, অজৈব জগতে প্রাথমিক যান্ত্রিক প্রক্রিয়াসমূহ থেকে শুরু করে বাস্তবকে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সচেতন মানবিক ক্রিয়া পর্যন্ত। প্রাচীন কাল থেকে, মানুষ পৃথিবীর বৈচিত্র্যের মূলে, তার অস্তিত্বের ভিত্তিতে যাওয়ার চেষ্টা করে আসছে। ভাববাদীরা অস্তিত্বের প্রথম কারণ দেখতে পেয়েছিলেন কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির মধ্যে, এক পরম ভাব বা চৈতন্যের মধ্যে। বস্তুবাদীরা প্রকৃতিকে দেখেছিলেন বাস্তবে তা যেরকম, সেইভাবে।

পৃথিবীর চূড়ান্ত ভিত্তি প্রকাশ করার জন্য তাঁরা বস্তুর ধারণাটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু বস্তু কী, মহাবিশ্বের আধার কী? সেই প্রশ্নের উত্তরটি পৃথিবী সম্বন্ধে মানবজাতি আরও বেশি জ্ঞান অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে বদলে চলেছে। প্রাচীন দার্শনিকরা বস্তুর ভূমিকা আরোপ করেছিলেন বিভিন্ন ব্যাপক পদার্থ বা ব্যাপারের উপরে, যেমন জল, বায়ু, অগ্নি ও মৃত্তিকা। পরে, বস্তুকে দেখা হতে থাকল পরমাণু নামক সীমাহীন সংখ্যক অদৃশ্য ও অপরিবর্তনীয় উপাদান হিসেবে। ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদীরা, লুড়ভিগ ফয়েরবাখ ও রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা একটি বিমূর্ত ধারণা বা প্রত্যয় হিসেবে বস্তুর উপলব্ধির কাছাকাছি এসেছিলেন, যে বিমূর্ত প্রত্যয়টি পৃথিবীর অসীম বিচিত্র ও পরিবর্তমান পদার্থ ও ব্যাপারের সার্বিক গুণ-ধর্মগুলি প্রকাশ করে। কিন্তু তাঁরা বস্তুর একটা বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞার্থ দিতে পারেন নি, তার সারমর্মকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন তার গঠনকাঠামো সম্পর্কে প্রাকৃতিক-

বিজ্ঞানগত ধারণার সঙ্গে। ফলে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহে প্রতিটি নতুন আবিষ্কার বস্তুর উপলব্ধিতে নতুন বিভ্রান্তি ও বিরোধ সৃষ্টি করেছিল। পরিস্থিতি বিশেষভাবেই জটিল হয়ে উঠেছিল ১৯শ শতাব্দীর শেষ ও ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ইলেকট্রন বা বিদ্যুতিন ও তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত সংকটের সময়ে।

ডেমোক্রিটাসের আমল থেকে বস্তুকে গণ্য করা হত অপরিবর্তনীয় ও অবিভাজ্য পরমাণুগুলির এক সাকল্য হিসেবে, কিন্তু ইলেকট্রন আবিষ্কারের ফলে দেখা গেল যে পরমাণু চিরন্তন ও পরিবর্তনাতীত হওয়া তো দূরের কথা, তার মধ্যে আছে আরও সূক্ষ্ম কণা, বা ইলেকট্রন। এও আবিষ্কৃত হয়েছিল যে ইলেকট্রনের ভর নির্ভর করে তার গতির দ্রুতির উপরে, উচ্চতর দ্রুতিতে তা বাড়ে এবং নিম্নতর দ্রুতিতে হ্রাস পায়।

অবিভাজ্য ও চিরন্তন পরমাণু এবং পরিবর্তনহীন ভর সম্বন্ধে ধারণাগুলি যখন ভেঙে পড়ল, বহু প্রকৃতিবিজ্ঞানী তখন মহাবিশ্বের ভিত্তি হিসেবে বস্তুর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করলেন। তাঁরা যুক্তি দিয়ে বললেন যে, যে-ইলেকট্রনের ভর সেগুলির গতির বেগমাত্রার উপরে নির্ভর করে, সেই ইলেকট্রনে পরমাণুর বিভাজিত হওয়ার অর্থ হল এই যে বস্তু গতিতে পরিবর্তিত হয়।

অন্যান্য প্রাথমিক কণা আবিষ্কার এবং ইলেকট্রন ও পজিট্রনের আলোক-কোয়াণ্টামে পরিবর্তন আবিষ্কারের ফলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সংকট আরও গভীর হয়ে ওঠে। বিপরীত চার্জ-বিশিষ্ট পদার্থের দুটি কণা আলোকে

পরিণত হয়, এই ঘটনাটিকে দেখা হয় বস্তুর অবলুপ্তি হিসেবে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আধুনিকতম আবিষ্কারগুলির অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সুযোগ ভাববাদীরা গ্রহণ করেছিলেন তৎক্ষণাৎ, তাঁরা বলেছিলেন যে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বগুলি বস্তুবাদকে খণ্ডন করে, বস্তুর অস্তিত্ব নেই, তা বস্তুবাদীদের নিছক কল্পনার বিষয়।

পৃথিবী সম্বন্ধে বস্তুবাদী অভিমতের বিরুদ্ধে ভাববাদী আক্রমণাভিযান শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপরেই নয়, প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণী সংগ্রামের উপরেও প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করেছিল, কেননা বস্তুবাদী মতবাদের ভিত্তিটা যদি ভুল হয়, তার সমস্ত সিদ্ধান্তও তা হলে ভ্রান্তিপূর্ণ হতে বাধ্য। তার মানে এই যে ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি, শ্রেণী সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল, এবং সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের আদর্শের একটা বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির অভাব আছে, এবং সেগুলি অধ্যাসমূলক। তা হলে, সমাজের যে বস্তুবাদী মতবাদ নাকি ভিত্তিহীন, তার উপরে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রের আদর্শের জন্য শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রাম অর্থহীন এবং তার সামনে কোনোই ভবিষ্যৎ নেই।

বস্তুবাদী মতবাদকে রক্ষা ও সমর্থন করার জন্য সর্বপ্রথমেই দরকার ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আবিষ্কারগুলির এক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া, আর সেই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন লেনিন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সংকটের কারণ ও সারবস্তু

বিশ্লেষণ করে লেনিন দেখিয়েছিলেন যে বিজ্ঞানীরা একটা বস্তুবাদী অথচ অধিবিদ্যামূলক অবস্থান গ্রহণ করার দরুনই এটা ঘটেছে। সংকট থেকে পরিত্রাণের পথও তিনি নির্দেশ করেছিলেন: যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বস্তুকে কখনও তার কোনো মূর্ত, চিরন্তন বা অপরিবর্তনীয় বহিঃপ্রকাশে পর্যবসিত করে নি, সেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অবস্থানসমূহ অবলম্বন করা।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা ধরে নিয়েছিলেন যে, পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের ব্যবহারিক সম্পর্ককে যথাযথভাবে গণ্য করে, দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্নের কাঠামোর ভিতরেই শুধু বস্তুর সংজ্ঞা-নির্ণয় করা যায়। আর, এঙ্গেলস বলেছিলেন, এই সম্পর্কের মধ্যে, বস্তুর প্রত্যয়টি হল এক বিমূর্তন, বাহ্যিক পৃথিবীর বস্তুনিচয়, প্রক্রিয়াসমূহ ও সম্পর্কের অসীম বৈচিত্র্যের এক সামান্যীকৃত প্রতিফলন।*

এঙ্গেলস বার বার জোর দিয়ে বলেছেন যে বস্তুর প্রত্যয়টিকে তার কোনো মূর্ত ধরন বা বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে এক করে দেখা উচিত নয়। বস্তুকে তদবস্থভাবে, তার মূর্ত বহিঃপ্রকাশগুলির বাইরে অধ্যয়ন করার জন্য প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টাকেও তিনি সমালোচনা করেছেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস-কর্তৃক সূত্রায়িত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল নীতিসমূহের ভিত্তিতে, ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আধুনিকতম আবিষ্কারগুলির সামান্যীকরণ

* দ্রষ্টব্য: Frederick Engels, *Dialectics of Nature*, pp. 235, 256.

ঘটিয়ে লেনিন বস্তুর সংজ্ঞা-নির্ণয় করেছিলেন একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয় হিসেবে। তিনি লিখেছিলেন: 'বস্তু হল এক দার্শনিক মূল প্রত্যয়, তা বোঝায় সেই বিষয়গত বাস্তবকে, মানুষকে তার সংবেদনগুলি যা দেয়, এবং যা আমাদের সংবেদনগুলি থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান থেকেও, আমাদের সংবেদনগুলির দ্বারা অনুকৃত, আলোকচিত্রিত ও প্রতিফলিত হয়।'*

আমরা দেখতে পাই, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বস্তুর প্রত্যয়টি প্রতিফলিত করে বাহ্যিক পৃথিবীর বস্তুনিচয় ও প্রক্রিয়াসমূহের এক সার্বিক গুণ-ধর্ম, যেমন বিষয়গত অস্তিত্ব, অর্থাৎ, মানুষের চৈতন্যের বাইরে ও তা থেকে স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ব। বস্তু এক বিমূর্ত প্রত্যয়, তা অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করে সেটাকে, যেটা সমস্ত পদার্থ ও প্রক্রিয়ার পক্ষে অভিন্ন: এই ঘটনা যে সেগুলি অস্তিত্বশীল চৈতন্যের বাইরে, ইন্দ্রিয়সমূহের উপরে সেগুলি ক্রিয়া করে এবং চৈতন্যের দ্বারা প্রতিফলিত হয়। মূর্ত পদার্থ, ব্যাপার ও প্রক্রিয়াসমূহে ছাড়া অন্যভাবে বস্তু থাকতে পারে না। কার্যত, সেটাই গঠন করে পৃথিবীর বিষয়গতভাবে বিদ্যমান পদার্থ ও ব্যাপারগুলির অসীম বৈচিত্র্য, মানুষ স্বয়ং সেই পৃথিবীর অংশ।

লেনিন-প্রদত্ত বস্তুর সংজ্ঞার্থ দর্শনের বিকাশের পক্ষে এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানগুলির বিকাশের পক্ষে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। তা গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমত, এই কারণে যে লেনিন বস্তুর সংজ্ঞা-নির্ণয় করেছিলেন

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 14, p. 130.

একটি দার্শনিক প্রত্যয় হিসেবে, যা ব্যবহৃত হয় সেইটি বোঝানোর জন্য যা বিষয়গতভাবে বিদ্যমান, চৈতন্যের বাইরে ও তা থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান। এরূপ এক সংজ্ঞার্থ প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদের একটি ত্রুটি দূর করে; তা বস্তুর প্রত্যয়টিকে তার গঠনকাঠামো সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানগত ধারণার সঙ্গে একাত্ম করেছিল। তার ফলে বস্তুর গঠনকাঠামো সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন বিষয়গত বাস্তব হিসেবে বস্তুকে আর খণ্ডন করতে পারে না। বিপরীতপক্ষে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে প্রসারিত ও গভীর করতে সাহায্য করে। যে সমস্ত পদার্থ, প্রক্রিয়া ও ব্যাপার আমরা ইতিমধ্যেই জানি, এবং যেগুলি এখনও অজানা, উভয়ের পক্ষেই সেই সংজ্ঞার্থ সমানভাবে যথার্থ। দ্বিতীয়ত, লেনিনের সংজ্ঞার্থ চৈতন্যের ব্যাপারে বস্তুর মুখ্যতাকে সুস্পষ্টভাবে দেখায়। বস্তুর মুখ্যতা ও তার চৈতন্য-নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করে, লেনিনের সংজ্ঞার্থ আঘাত হানে ভাববাদের উপরে, বিভিন্ন ধর্মীয়-ভাববাদী তত্ত্ব ও মতের উপরে। তৃতীয়ত, এই সংজ্ঞার্থ দেখায় যে বস্তু অনুকৃত, আলোকচিত্রিত ও প্রতিফলিত হয় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা। এবং তার অর্থ হল মানবচৈতন্যের দ্বারা পারিপার্শ্বিক জগতের এক প্রতিফলন, মানবিক অবধারণার প্রক্রিয়া। মানব-চৈতন্যের দ্বারা পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতিফলন সম্বন্ধে, মানুষের পৃথিবী বিষয়ে অবধারণা সম্বন্ধে সেই প্রতিজ্ঞাটি অজ্ঞাবাদের উপরে আঘাত হানে। সেই প্রতিজ্ঞাটি চালিত করে পৃথিবী সম্বন্ধে আরও বেশি

জানার চেষ্টার দিকে, যেটা ছাড়া তার বৈপ্লবিক রূপান্তর অসম্ভব।

একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয় হিসেবে বস্তুর যে দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী সংজ্ঞার্থ লেনিন দিয়েছিলেন, তা ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশের আড়ালে ভাববাদী ও অধিবিদ্যামূলক ধারণাগুলি সনাক্ত করার অন্যতম প্রধান মানদন্ড, পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে সেগুলির অবৈজ্ঞানিক অভিমত আড়াল করার চেষ্টা যত দক্ষতার সঙ্গেই করা হোক না কেন।

২। গতি — **বস্তুর অস্তিত্বের ধরন**

পৃথিবী সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত বোধের জন্য বস্তুর অস্তিত্বের সার্বিক রূপগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং গতি হল এই প্রধান রূপগুলির একটি। লেনিন লিখেছেন, 'পৃথিবীতে গতিশীল বস্তু ছাড়া কিছু নেই।'*

যে কোনো পদার্থের দিকেই আমরা তাকাই — পরমাণু, অণু, জীবন্ত জীবসত্তা, পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ, গ্রহ, নক্ষত্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, ইত্যাদি — সবই রয়েছে নিয়ত গতি ও পরিবর্তনের অবস্থায়। তাই, গতি হল সার্বিক। এঙ্গেলস লিখেছেন, '**গতি হল বস্তুর অস্তিত্বের ধরন**... গতি ছাড়া কোনো বস্তু নেই, কখনও থাকতেও পারত না।'**

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 14, p. 175.

** Frederick Engels, *Anti-Dühring,* Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 402.

কিন্তু পৃথিবীতে গতি ও পরিবর্তনের সার্বিকতা বিরামের উপাদানগুলিকে বাতিল করে দেয় না। যে কোনো গতি ও পরিবর্তন চলাকালে গতিশীল, পরিবর্তনশীল পদার্থটিরও কিছু স্থিতিশীলতা থাকে, তার কিছু কিছু গুণ-ধর্ম একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য ধারণ করে রাখে। তাই, বিরাম ও স্থিতিশীলতা থেকে গতি অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু বিরামের একটা সাময়িক, আপেক্ষিক চরিত্র থাকে।

যে কোনো জিনিস নিন, ধরুন, একজন নিদ্রিত মানুষ। এই মানুষটি রয়েছে বিরামের অবস্থায়, কিন্তু সেই বিরাম শুধু আপেক্ষিক, কেননা ঘরটির ভিতরকার জিনিসপত্র ও খোদ বাড়িটির ব্যাপারে নিজের অবস্থান পরিবর্তন না-করেই, মানুষটি পৃথিবীর সঙ্গে চলছে, এবং তার ভিতরে ঘটছে বিভিন্ন জটিল শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন, রক্ত সঞ্চলন, শ্বাস-প্রশ্বাস ও অন্যান্য প্রক্রিয়া।

সুতরাং, বিরাম ও স্থিতিশীলতা আপেক্ষিক, আর গতি অনাপেক্ষিক। এক দিক দিয়ে বিরামের অবস্থায় থাকার সঙ্গে সঙ্গে, যে কোনো পদার্থই অন্যান্য দিক দিয়ে নিয়ত পরিবর্তন ও গতির অবস্থায় থাকে।

গতি সার্বিক ও বস্তু থেকে অবিচ্ছেদ্য, এই ধারণাটা অনেক দার্শনিকই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদীরা গতির এক সংকীর্ণ ও সীমিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। গতির সারমর্মকে পর্যবসিত করা হয়েছিল স্থানে অবস্থিতির এক পরিবর্তনে। গতিকে দেখা হয়েছিল বাইরে থেকে, পদার্থসমূহের অবস্থিতিতে এক পরিবর্তনের

দৃষ্টিকোণ থেকে, খোদ পদার্থগুলিরই এক পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

প্রকৃতপক্ষে, বস্তুর গতির অন্তর্ভুক্ত শুধু পদার্থসমূহের যান্ত্রিক গতিবিধিই নয়, সেগুলির ভাগ্যে যত পরিবর্তন ঘটে সেই সবগুলিই। এঙ্গেলস লিখেছিলেন, 'বস্তুতে প্রযুক্ত গতি হল **সাধারণভাবে পরিবর্তন**।'*

গতিশীল বস্তুর বহুবিধ রূপের মধ্যে এঙ্গেলস জোর দিয়েছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপগুলির উপরে। সেগুলি হল: বস্তুর গতির যান্ত্রিক রূপ (পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত রূপে স্থানে বস্তুনিচয়ের অবস্থিতিতে পরিবর্তন), গতির বহুবিধ পদার্থবিদ্যাগত রূপ (তাপ, ধ্বনি, বিদ্যুৎচৌম্বক, পরমাণু-অভ্যন্তরস্থ, পরমাণুকেন্দ্র-অভ্যন্তরস্থ, ইত্যাদি), গতির রাসায়নিক রূপ (বিভিন্ন পদার্থ গঠনকারী অণুগুলির গঠন ও ভাঙন), গতির জীববিদ্যাগত রূপ (বহুবিচিত্র সমস্ত বহিঃপ্রকাশে জৈব জীবন, জীবন্ত জীবসত্তাগুলিতে ঘটমান পরিবর্তন), এবং গতির সামাজিক রূপ (মানবসমাজের বিকাশ)।

বস্তুর গতির সমস্ত রূপ কঠোরভাবে পরস্পরসংযুক্ত ও পরস্পরনির্ভরশীল। গতির কতকগুলি রূপ হল অন্যান্য রূপের আত্মপ্রকাশের পূর্বশর্ত।

গতির প্রত্যেকটি রূপের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকটি রূপ পরবর্তী, উচ্চতর রূপের

---

* Frederick Engels, *Dialectics of Nature*, p. 247.

আত্মপ্রকাশকে নির্ধারণ করে, এবং নিজেই শেষোক্তটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে, উচ্চতর রূপগুলি নিম্নতর, অধীনস্থ রূপগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, সেগুলির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু উচ্চতর রূপগুলিকে সেগুলিতে পর্যবসিত করা যায় না। এইভাবে, জীববিদ্যাগত একটি জীবসত্তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে বস্তুর গতির সমস্ত পূর্ববর্তী রূপ: যান্ত্রিক, পদার্থবিদ্যাগত ও রাসায়নিক।

যে কোনো জীবন্ত সত্তার অস্তিত্ব যুক্ত থাকে তার যান্ত্রিক গতির সঙ্গে (বৃদ্ধি, গতিবিধি, ইত্যাদি) এবং পদার্থবিদ্যাগত-রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহের সঙ্গেও। কিন্তু তার ভিত্তি হল সুনির্দিষ্টভাবে জীববিদ্যাগত নিয়ম-শাসিত বিপাক।

উচ্চতর রূপগুলিকে কখনোই নিম্নতর রূপগুলিতে পর্যবসিত করা উচিত নয়, কেননা এর ফলে দেখা দেয় অধিযন্ত্রবাদী ও অধিবিদ্যাগত ধারণা, যা উচ্চতর রূপগুলির উদ্ভব ব্যাখ্যা করা অসম্ভব করে তোলে। গতির উচ্চতর রূপগুলিকে পরম করে তোলাও উচিত নয়, কেননা তা হলে নিম্নতর রূপগুলির সঙ্গে সেগুলির সংযোগ বোঝা যায় না, পূর্বোক্তের 'অতিপ্রাকৃত' চরিত্র সম্বন্ধে ভাববাদী সিদ্ধান্ত টানার প্রবণতা দেখা দেয়।

বিজ্ঞান গতির একটি রূপ থেকে আরেকটি রূপে প্রকৃত উত্তরণগুলি শুধু আবিষ্কারই করে নি, এমন কি পরিমাণগত দিক দিয়েও এই সমস্ত উত্তরণ নির্ধারণ করেছে। যেমন, শক্তির অক্ষয়তা ও রূপান্তরের নিয়ম

অনুযায়ী, শক্তির বা গতির সামগ্রিক পরিমাণ একই থাকে, বাড়ে না বা কমে না, এবং গতি শুধু পরিবর্তন করে তার রূপগুলি। সেই নিয়মটি বস্তু ও গতির আন্তর ঐক্যের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ যোগায়। বস্তু ও গতির মধ্যে সংযোগের আরেকটি প্রকাশ এই যে একটি বস্তুপদার্থের গতির রূপটা জানা থাকলেই আমরা সেটির সাংগঠনিক স্তর, গঠনকাঠামো ও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পারি।

গতির রূপগুলির এঙ্গেলস-কৃত শ্রেণীবদ্ধকরণ ও তার মূল নীতিগুলি আজও সিদ্ধ, যদিও গত এক শতাব্দী ধরে বৈজ্ঞানিক প্রগতির ফলে তাঁর সেই শ্রেণীবিন্যাসকে গভীর ও মূর্ত-নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। গতির রূপগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যত পূর্ণ হবে, বস্তুর সমস্ত বহিঃপ্রকাশ সহ বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও তত বেশি পূর্ণ হয়।

৩। গতিশীল বস্তুর অস্তিত্বের রূপ হিসেবে স্থান ও কাল

পারিপার্শ্বিক জগতে সমস্ত গতিশীল বস্তুপদার্থের একটা নির্দিষ্ট আকৃতি, পরিমাণ ও গঠনকাঠামো আছে, এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে সেগুলি নির্দিষ্ট নানাভাবে অবস্থিত। তা ছাড়াও, সেগুলি একটি পারম্পর্য তৈরি করে, একটি পদার্থ অপরটির পূর্বগামী হয় অথবা তাকে প্রতিস্থাপিত করে। বস্তুপদার্থগুলির

এই সমস্ত গুণ-ধর্ম এটাই বোঝায় যে সেগুলির অস্তিত্ব রয়েছে স্থানে ও কালে।

স্থান ও কাল হল বস্তুর অস্তিত্বের বিশ্বজনীন রূপ। লেনিন লিখেছেন: '...গতিশীল বস্তু স্থানে ও কালে ছাড়া অন্যভাবে চলতে পারে না।'*

স্থানের প্রত্যয়টি বস্তুপদার্থসমূহের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে সেগুলির অবস্থিতির চারিত্র্যনির্ণয় করে এবং পদার্থগুলির বিস্তার, সেগুলির সহাবস্থান প্রকাশ করে। স্থানিক সম্পর্কের মধ্যে পদার্থসমূহের এই সমস্ত গুণ-ধর্ম অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন সেগুলির দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, প্রস্থ, রূপ, গঠনকাঠামো, এবং অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে দূরত্ব।

কাল বলতে বোঝায় অবস্থাগুলির পরম্পরা, কিছু কিছু ব্যাপার যে ক্রমানুযায়ী একের পর আরেকটি ঘটে, এবং সেগুলি যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় জড়িত তার মেয়াদ। কাল বিভিন্ন পদার্থের ইতিহাস অনুসরণ করা সম্ভব করে তোলে।

স্থানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার ত্রি-মাত্রিক চরিত্র। স্থানের তিনটি গতিমুখ আছে: বাঁয়ে-ডাইনে, সামনে-পিছনে, উপরে-নিচে। এই সমস্ত গতিমুখ চিত্ররৈখিকভাবে প্রকাশ করা হয় তিনটি পারস্পরিকভাবে লম্ব রেখা দিয়ে। এই তিনটি রেখার সাহায্যে যে কোনো পদার্থকে স্থানিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

স্থানের প্রতিতুলনায়, কাল এক-মাত্রিক। তা সর্বদাই

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 14, p. 175.

প্রবাহিত হয় একটি দিকে: সামনে, অর্থাৎ অতীত থেকে বর্তমানে, তার পর ভবিষ্যতে। কাল অপরিবর্তনীয়, তাকে বিপরীত দিকে প্রবাহিত করানো যায় না।

বস্তুপদার্থসমূহের স্থানিক ও কালগত বৈশিষ্ট্যগুলি পরস্পরসম্পর্কিত, সেগুলির গতিতে তা স্বপ্রকাশ। এটা জানা কথা যে সমস্ত পদার্থ নির্দিষ্ট এক-এক দ্রুতিতে চলে। দ্রুতি হল একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে একটি পদার্থ যে দূরত্ব অতিক্রম করে, সেই দূরত্ব। এখানে আমরা দেখতে পাই স্থান ও কালের পরস্পরসম্পর্ক, একটি গতিশীল বস্তুপদার্থের সঙ্গে সেগুলির সংযোগ।

স্থান ও কালের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হল সেগুলির অসীমতা। প্রথম নজরে মনে হতে পারে যে স্থান ও কাল সসীম, কেননা সেগুলি আছে বস্তুপদার্থের গুণ-ধর্ম ও সম্পর্ক হিসেবে, সেই বস্তুপদার্থগুলির আদি ও অন্ত আছে। কিন্তু সসীম বস্তুনিচয়ের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বশীল হয়েও স্থান ও কাল অসীম। প্রতিটি বস্তু অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত, সেগুলি আবার আরও অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত, এইভাবে থাকে অন্তহীনভাবে। সসীম রাশিসমূহ দিয়ে গঠিত হয়ে স্থান অসীমে প্রকাশ পায়। প্রতিটি স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্বের আদি ও অন্ত আছে, কিন্তু সেটির পূর্বগামী ছিল এক অসীম সংখ্যক অন্যান্য বস্তু এবং শেষ পর্যন্ত সেটি প্রতিস্থাপিত হবে অন্যান্য বস্তুর দ্বারা, এবং এই রকম চলবে অন্তহীনভাবে।

ধর্ম ও ভাববাদ স্থান ও কালের অসীমতা অস্বীকার

করে। ধর্ম প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে পৃথিবী ঈশ্বর-কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছিল, একদিন তার অন্ত হবে। ভাববাদীরা স্থান ও কালকে গণ্য করেন এমন সব গুণ-ধর্ম বলে, মানবচৈতন্য যেগুলি আরোপ করে পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহের উপরে। কিন্তু সেই প্রাচীন কালেই চিন্তকরা সর্বপ্রথম এই চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন যে বস্তু স্থানে অসীম, ও কালে অনন্ত, এবং মহাবিশ্বের আদিও নেই অন্তও নেই। আজকের দিনের বিজ্ঞানই শুধু সেই প্রতিজ্ঞার প্রমাণ যোগাচ্ছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত কৃতিত্বগুলিকে ব্যবহার করে গবেষকরা প্রাথমিক কণাগুলির অস্তিত্ব ও গতির নিয়ম থেকে শুরু করে সমগ্র গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলীর অস্তিত্ব ও গতির নিয়ম পর্যন্ত, বস্তুজগৎ সম্বন্ধে গভীরতর ও বিস্তৃততর জ্ঞান লাভ করছেন।

স্থান ও কাল সম্বন্ধে দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী উপলব্ধি শুধু তত্ত্বগতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার বিরাট ব্যবহারিক গুরুত্বও আছে। সমগ্র সামাজিক ক্রিয়াকলাপই হল পারিপার্শ্বিক জগতের ব্যাপারসমূহ ও প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে মানুষের বলিষ্ঠ মিথস্ক্রিয়া, সেই ব্যাপার ও প্রক্রিয়াগুলির স্থানিক ও কালগত বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই সামাজিক কর্মপ্রয়োগের ধরন, রূপ, ছন্দ ও গতিহারকে নির্ধারণ করে, এবং উৎপাদন ও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেগুলিকে গণ্য করা উচিত।

স্থানগত বিষয়টি মুক্তি সংগ্রামের পদ্ধতিগুলিকে লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত করে। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি

উৎপাদিকা শক্তিগুলির বণ্টন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি দেশের স্থানিক অবস্থা কালগত বিষয়গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। একটি অর্থনৈতিক রণনীতি বিশদীকরণের সময়ে, সামাজিক ও আত্মিক জীবনে একের পর এক রূপান্তরের পরিকল্পনা করার সময়ে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশের সীমান্ত রক্ষার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা সৃষ্টি, ইত্যাদির সময়ে স্থানিক ও কালগত বিষয়গুলিকে গণ্য করা হয়।

৪। পৃথিবীর বস্তুগত ঐক্য

পৃথিবীর ঐক্যের সমস্যাটি দর্শনের আদিতম দিনগুলির মতোই পুরনো। প্রাচীন কাল থেকেই চিন্তকরা পৃথিবীর পরিবর্তন ও বিকাশের পিছনকার অভিন্ন নীতিগুলির সন্ধান করেছিলেন। পৃথিবীতে বস্তু ও ব্যাপারসমূহের অসীম বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হয়ে তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন একটিমাত্র সমগ্রে পৃথিবী কিসের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ, সেটা খুঁজে বার করতে। তাঁরা সমস্যাটির মোকাবিলা করেছিলেন তাঁদের অবস্থান অনুযায়ী।

ধর্মীয় ও ভাববাদী চিন্তকরা পৃথিবীর ঐক্যের উৎপত্তি-নির্ণয় করার চেষ্টা করেছিলেন এক আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরে, তাঁদের মতবাদগুলিতে তা ধারণ করেছিল বিভিন্ন রূপ: ঈশ্বর, দৈবশক্তি, বিশ্ব অধ্যাত্মা,

পরম ভাব, সংবেদন-সমাহার, ইত্যাদি। বিপরীতপক্ষে, বস্তুবাদীদের কাছে, পৃথিবীর সত্যকার ঐক্য ছিল তার বস্তুগততায়, চৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে বিষয়গত অস্তিত্বে।

পৃথিবীর বস্তুগত ঐক্য প্রমাণিত হয় দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমগ্র বিকাশের দ্বারা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানগুলির বিতর্কাতীত কৃতিত্বসমূহ, এবং মানবিক কর্মপ্রয়োগের ফলাফলের দ্বারা। বিকাশে, গতিশীল বস্তুসমূহের যে মিথষ্ক্রিয়া সেগুলিকে এক সংবদ্ধ ব্যবস্থায় ঐক্যবদ্ধ করে, সেই মিথষ্ক্রিয়ার মধ্যে তা আত্মপ্রকাশ করে।

ভূবিদ্যাগত উপাত্তের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে পৃথিবী ও সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ রূপ পরিগ্রহ করেছিল ৫ থেকে ১০ শতকোটি বছর আগে। সেই সময়ে, সূর্য তার গতি চলাকালে এক সুবিশাল গ্যাসীয় ধূলিমেঘের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। মহাকর্ষীয় শক্তিগুলির অভিঘাতে, মহাজাগতিক ধূলির গতিশীল সূক্ষ্ম কণাগুলি ও গ্যাস ঘনীভূত হয়েছিল এবং সৌরজগতের গ্রহগুলি গঠন করেছিল। দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবী ছিল এক প্রাণহীন গ্রহ, সেখানে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল প্রায় দুই শতকোটি বছর আগে। এই গ্রহে আদিম মানুষ আবির্ভূত হয়েছিল প্রায় ২৫ লক্ষ বছর আগে, এবং তার গঠনক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছিল প্রায় ৫০,০০০-৭০,০০০ বছর আগে। মানুষের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, চৈতন্য দেখা দিয়েছিল পারিপার্শ্বিক জগৎকে এক সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিফলিত করার জন্য মানবমস্তিষ্কের গুণ-ধর্ম হিসেবে। আদিম

মানুষ পৃথিবী বাস্তবিকই যেমন তেমনভাবেই তাকে প্রত্যক্ষ করেছিল। উদ্বর্তনের নিয়ত সংগ্রামে, সে হাতিয়ারপত্র বানিয়েছিল, খাদ্য সংগ্রহ করেছিল, শিকার করেছিল, বন্য জন্তু ও প্রকৃতির ভৌতিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করেছিল। সেই সবের ফলেই তার এই স্বাভাবিক প্রত্যয় গড়ে উঠেছিল যে তার বাইরে ও তার থেকে স্বতন্ত্রভাবে এমন সমস্ত জিনিস আছে, যেগুলিকে সে দেখতে ও স্পর্শ করতে পারে, যেগুলি তার পক্ষে উপযোগী বা ক্ষতিকর হতে পারে, এবং যেগুলিকে সে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু দুর্দান্ত প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলির সামনে আদিম মানুষ অত্যন্ত দুর্বল ছিল, জ্ঞানের অভাবে সেই ব্যাপারগুলি সে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। সেগুলি ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হয়ে মানুষ এই ব্যাপারগুলির উপরে ক্রমে ক্রমে আরোপ করেছিল এক অতিপ্রাকৃত শক্তি, এবং শেষ পর্যন্ত তারই ফলে দেখা দিয়েছিল ধর্ম, অতিপ্রাকৃত শক্তিগুলিতে বিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে মানুষ যা ব্যাখ্যা করতে পারে নি, সে সবের উপরেই সে আরোপ করেছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা ও সৃষ্টি।

কিন্তু মানবজাতি পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করতে থাকায়, বিজ্ঞান ক্রমেই বেশি করে ধর্মের বিপক্ষে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। প্রতিটি নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পৃথিবীর বস্তুগত ঐক্যকে সমর্থন করে। পৃথিবীর বস্তুগত ঐক্য বেষ্টন করে পদার্থসমূহ ও প্রক্রিয়াসমূহের পরস্পরসংযোগ ও পরস্পরনির্ভরশীলতা: পার্থিব ও

গাগনিক বস্তুসমূহের মধ্যে মহাকর্ষ, প্রাথমিক কণাগুলির পরিবর্তন-রূপান্তর, শক্তির বহুবিধ রূপের বিনিময়, রাসায়নিক মৌল উপাদানগুলির পরিবর্তন-রূপান্তর, জৈব ও অজৈব প্রকৃতির, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের ঐক্য, প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে যোগসূত্র, ইত্যাদি। বস্তুর গঠন-কাঠামো, তার অস্তিত্বের রূপগুলি ও তার গতির নিয়মগুলি সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান উপলব্ধির ফলে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে এনে সেগুলিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রসঙ্গ ৫।

চৈতন্য, তার উদ্ভব ও সারমর্ম

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনে 'চৈতন্যের' প্রত্যয়টি বস্তুর প্রত্যয়ের মতোই অতি গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব ও মততন্ত্রের কেন্দ্রী বিষয় হল চৈতন্য, তার উদ্ভব ও সারমর্মের সমস্যাটি। বস্তুর সমস্যাটির মতোই, সেই সমস্যাটির বিরোধাভাসমূলক সমাধানগুলিই একটি তত্ত্ব বস্তুবাদী না ভাববাদী তা বিচার করার প্রধান মানদণ্ড।

১। চৈতন্য সম্বন্ধে প্রাক-মার্কসীয় প্রত্যয়গুলি

চৈতন্যের উদ্ভব ও সারমর্মের প্রশ্নটি সবচেয়ে জটিল, এবং প্রাচীন কাল থেকেই

মানুষ তাতে আগ্রহী। মানুষ চৈতন্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে, তাদের জীবনে মানবিক বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিল। মানুষ তার চৈতন্য দিয়েই ঘটনাবলী ও অন্যান্য লোকের মূল্যাবধারণ করে, পৃথিবীর সৌন্দর্য ও অতীত প্রজন্মগুলির সঞ্চিত জ্ঞানের মর্মোপলব্ধি করে, প্রাগ্রসর ধ্যানধারণাগুলি আত্মস্থ করে এবং সামাজিক ন্যায়বিচারপূর্ণ এক সমাজের জন্য লড়াই করে।

মানবচিন্তা তার নিজের চরিত্র বোঝার আগে বিকাশের এক দীর্ঘ ও বিরোধপূর্ণ পথ অতিক্রম করেছে।

প্রাচীন দার্শনিকরা 'চৈতন্যের' বদলে বরং 'আত্মার' প্রত্যয়টিই বেশির ভাগ ব্যবহার করেছিলেন। আত্মা বলতে তাঁরা বুঝিয়েছিলেন মানুষের মানসিক সামর্থ্যগুলির সমগ্রতাকে: তার দেখা, শোনা, চিন্তা করা, অনুভব করা, ইত্যাদির সামর্থ্যকে। বস্তুবাদীরা আত্মাকে ধারণা করেছিলেন প্রাকৃতিক কারণ-সঞ্জাত এক বস্তুগত সত্তা হিসেবে, পক্ষান্তরে ভাববাদীরা তাকে দেখেছিলেন মানবদেহে সাময়িকভাবে বসবাসকারী এক প্রকৃতি-অতিগ সারমর্ম হিসেবে।

সমাজে ধর্মের অবস্থানগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠায়, মানবচৈতন্য দৈব-উদ্ভূত বলে ব্যাপকভাবে পরিগণিত হতে শুরু করেছিল।

আত্মা ও চৈতন্য সম্বন্ধে ধর্মমতগুলি কালক্রমে খুব সামান্যই পরিবর্তিত হয়েছিল। ভাববাদী দর্শনের কথা বলতে গেলে, তা বিষয়ীমুখ ও বিষয়মুখ ভাবধারায় বিভক্ত হয়েছিল। বিষয়ীমুখ ভাববাদীরা

মানবজ্ঞানকে, এমন কি গোটা বাস্তব জগৎকে স্বতন্ত্র মানবচৈতন্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিলেন, আর বিষয়মুখ ভাববাদীরা চৈতন্যকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও মানবজাতি থেকে, তা যে সমস্ত অবস্থা-সঞ্জাত সেই অবস্থা থেকে তাকে নিঃসংস্রব করে তার উপরে দেবত্বারোপ করেছিলেন।

বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটায়, চৈতন্য সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণাগুলি তদনুযায়ী বিকশিত হয়েছিল। বিভিন্ন বস্তুবাদী মতধারা চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ ও চরিত্র সম্বন্ধে বহুবিধ ধ্যানধারণা প্রকাশ করেছিল। কেউ কেউ উপলব্ধি করেছিলেন যে চৈতন্য এক ভাবগত, আধ্যাত্মিক ব্যাপার, অন্যরা তাকে দেখেছিলেন বস্তুগত ব্যাপার হিসেবে। প্রথমোক্তরা ভাবগত বা আধ্যাত্মিক বলতে কী বোঝান তা ব্যাখ্যা করতে পারেন নি, আর শেষোক্তরা, যারা স্থূল বস্তুবাদী বলে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁরা মনে করতেন যে যকৃৎ যেমন পিত্তরস নিঃসরণ করে ঠিক তেমনই মস্তিষ্ক চিন্তা নিঃসরণ করে। মস্তিষ্কের একটি ক্রিয়া হিসেবে চৈতন্যকে বিবেচনা করে, তাঁরা তার চরিত্র বুঝতে অপারগ ছিলেন।

২। প্রতিফলনের সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে চৈতন্য

চৈতন্যের সারমর্মে পৌঁছনোর চাবিকাঠিটি রয়েছে লেনিনের এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে 'সমস্ত বস্তুই এমন একটি গুণ-ধর্মের অধিকারী যা সারগতভাবেই

সংবেদনের সদৃশ, প্রতিফলনের গুণ-ধর্ম...'* মানুসের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা দেখায় যে সমস্ত পদার্থ, অজৈব পদার্থ সমেত, বাহ্যিক জগৎকে প্রতিফলিত করতে পারে, অর্থাৎ, বাহ্যিক প্রভাবগুলির অভিঘাতে পরিবর্তিত হয়ে, নির্দিষ্ট কোনো কোনোভাবে সেগুলির 'ছাপ' মুদ্রিত করতে পারে। এই পরিবর্তনগুলিকে অথবা একটি পদার্থের দ্বারা আরেকটির উপরে রেখে-যাওয়া ও শেষোক্তটি-কর্তৃক কিছুকালের জন্য ধারণ করা 'ছাপগুলিকে' বলা হয় প্রতিফলন। প্রতিফলন সমস্ত বস্তুপদার্থে, সমস্ত বস্তুতে সহজাত, এবং তার বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

জড় প্রকৃতিতে প্রতিফলন একান্তই যান্ত্রিক। যেমন, একটি ধাতব পদার্থ দিয়ে সজোরে আঘাত করলে একটি পাথর ভেঙে যাবে। এক খণ্ড ভিজে কাদামাটি পিষে পিণ্ড বানালে তার রূপ পরিবর্তিত হবে। জড় প্রকৃতিতে প্রতিফলন হল পদার্থসমূহের মধ্যে আপতিক মিথষ্ক্রিয়ার এক অক্রিয় পরিণতি এবং তার ফলে সেগুলির গঠনকাঠামোতে বিভিন্ন যান্ত্রিক, এমন কি পদার্থগত-রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে।

প্রাণের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, আরও জটিল ধরনের প্রতিফলন গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, চৈতন্যের গঠনের জীববিদ্যাগত পূর্বশর্তগুলি ছিল, প্রথমত, পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 14, p. 92.

ও বিকাশ, মানুষের আবির্ভাব পর্যন্ত; এবং দ্বিতীয়ত, জীবন্ত সত্তাগুলির প্রতিফলনমূলক সামর্থ্যের বিকাশ।

বিজ্ঞান দেখায় যে জটিল রাসায়নিক পরিবর্তনসমূহের মধ্য দিয়ে অজৈব বস্তু থেকে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল। সরলতম জৈব মৌল উপাদানগুলি — হাইড্রোকার্বন — প্রথমে রূপ পরিগ্রহ করেছিল আদিম মহাসাগরের অবস্থায়। পরে, জটিলভবন ও গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেগুলি বিকশিত হয়ে প্রোটিন ও নিউক্লিইক অ্যাসিডে পরিণত হয়েছিল। প্রায় এক থেকে দেড় শতকোটি বছর আগে এই উচ্চ-আণবিক জীব-পলিমারগুলি ক্রমবিকশিত হয়ে পরিণত হয়েছিল তথাকথিত কোঅ্যাসারভেটে, যেগুলি বিপাক ও আত্ম-পুনরুৎপাদনে সক্ষম। এইভাবে, জটিল গঠনকাঠামো সহ জীবন্ত কোষ ক্রমে ক্রমে গঠিত হয়েছিল।

কালক্রমে, জীবন্ত সত্তাগুলি অত্যন্ত বিভিন্ন ধরনের হয়ে গিয়েছিল। সেগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সেগুলির বাহ্যিক প্রভাবসমূহের প্রতিফলনও বিকশিত ও জটিল হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম পর্যায়গুলিতে সরলতম জীবন্ত সত্তাগুলি বিভিন্ন পরিবেশগত প্রভাবে সাড়া দিত এমন সব পরিবর্তন ঘটিয়ে যার সঙ্গে জড়িত ছিল সেগুলির অভ্যন্তরে ঘটমান সমস্ত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ও বিপাকীয় প্রক্রিয়া। ক্রমে ক্রমে, জীবসত্তাগুলি বিভিন্ন পদার্থের প্রতি এক নির্বাচনসূচক মনোভাব গড়ে তুলেছিল, এবং শেষ পর্যন্ত গঠিত হয়েছিল ইন্দ্রিয়গুলি।

জটিলতর জীবসত্তাগুলি তাদের ক্রমবিকাশে

স্নায়ুকোষ, স্থায়ুগ্রন্থি ও স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছিল, সেগুলি ক্রমবিকশিত হয়ে পরিণত হয়েছিল বিশেষীকৃত ইন্দ্রিয়গুলিতে, মেরুদণ্ডে, এবং শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কে। স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও বিকাশ প্রতিফলনের এক গুণগতভাবে নতুন, মানসিক রূপকে সূচিত করেছিল, স্নায়ুতন্ত্র বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সামঞ্জস্য ও সমন্বয় ঘটায়, এবং সামগ্রিকভাবে জীবসত্তার ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত করে।

ক্রমবিকাশের সিঁড়ির ধাপে একটি প্রাণীর স্থান যত উঁচু, তার স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া তত বেশি সূক্ষ্ম ও বিচিত্র। যে পদার্থগুলি প্রাণীদের উপরে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে শুধু যে তাতেই সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য প্রাণীরা অর্জন করে তাই নয়, তাদের মধ্যে প্রতিফলিত পরিবর্তমান পরিবেশে নিজেদের যথা অবস্থান লাভ করার, অনুকূল পদার্থ ও প্রভাবগুলি খুঁজে বার করা ও প্রতিকূল পদার্থ ও প্রভাবগুলি এড়ানোর, এমন কি একভাবে ভবিষ্যতের পরিস্থিতিও আগে থেকে দেখার সামর্থ্য অর্জন করে। পৌনঃপুনিক প্রভাবগুলিকে প্রতিফলিত করে জীবসত্তা সেগুলি সম্বন্ধে তথ্য সঞ্চয় করে ও জমিয়ে রাখে, যার ফলে যখন অনুরূপ প্রভাবগুলি পুনরাবির্ভূত হয়, তখন সেগুলির জন্য তা আগে থেকে প্রস্তুত হতে পারে। যেমন, জলবায়ুর চাপে যে পরিবর্তন বৃষ্টির পূর্ব-ইঙ্গিত দেয় তাতে বহু কীটপতঙ্গের মধ্যে গোটা এক প্রস্ত ক্রিয়াকলাপ দেখা যায়, যার লক্ষ্য হল যথাসময়ে আশ্রয় খুঁজে পাওয়া।

জীবসত্তাগুলির আচরণগত ক্রিয়াকলাপ মানসিক প্রতিফলনের প্রাথমিক রূপগুলির ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। সেটার আসল কথা হল অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি জীবসত্তার সক্রিয় মনোভাব, সেই বিষয়গুলির সন্ধান করা যদি সেগুলি তার অস্তিত্বের পক্ষে জরুরি হয়, এবং সেগুলি এড়িয়ে চলা যদি সেগুলি ক্ষতিকর বা প্রাণঘাতী হয়। অন্বেষণ ও অভিমুখীনতার ব্যবস্থাপ্রণালী গড়ে ওঠে দীর্ঘকালীন ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে এবং তা সঞ্চারিত হয় এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে। সেই ব্যবস্থাপ্রণালীর ভিত্তি হল প্রতিবর্তসমূহ, বা বিভিন্ন প্রভাবে জীবসত্তার স্নায়ুগত সাড়া।

প্রতিবর্তসমূহ সহজাত ও অর্জিত হতে পারে। সহজাত প্রতিবর্তগুলিকে বলা হয় অ-সাপেক্ষ; একটি প্রজাতির দ্বারা সেগুলি বিবর্তিত হয় এবং সেগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। একটি স্বতন্ত্র জীবসত্তার জীবদ্দশায় তার দ্বারা অর্জিত প্রতিবর্তগুলিকে বলা হয় সাপেক্ষ। প্রাণীদের এক নির্দিষ্ট প্রজাতির বৈশিষ্ট্য-সূচক সহজাত আচরণগত ক্রিয়াগুলির সামগ্রিকতাকে বলা হয় সহজ-প্রবৃত্তি। সহজ-প্রবৃত্তি নিয়ত উদ্দীপক বা উত্তেজক বিষয়গুলিতে অনুকূলতম (প্রাণীর সেই নির্দিষ্ট প্রজাতির জন্য) সাড়া নিশ্চিত করে। প্রয়োজনের প্রকৃতিসাপেক্ষ গবেষকরা খাদ্য, আত্ম-সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন ও অন্যান্য সহজ-প্রবৃত্তিকে নির্দিষ্ট করেন। ক্রমবিকাশের সিঁড়ির ধাপে একটি প্রজাতির স্থান যত উঁচু, তার সহজ-প্রবৃত্তিগুলি তত বেশি

জটিল। এগুলি সচেতন ক্রিয়ার একটা অধ্যাস সৃষ্টি করার মতো উচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে। যেমন, একটা অক্টোপাস খোলা একটা ঝিনুকের খোলকের মধ্যে পাথর ঢোকাবে, যাতে নির্ঝঞ্ঝাটে সেটা খাওয়া যায়, এবং একটি কোকিল-ছানা বাসা থেকে আসল গৃহকর্তা-ছানাগুলিকে ঠেলে দেবে একই খাদ্যের জন্য 'প্রতিদ্বন্দ্বীদের' অপসারিত করার জন্য।

কিন্তু সহজ-প্রবৃত্তি কার্যকর শুধু নির্দিষ্ট কতকগুলি অবস্থায়, এবং সেই অবস্থাগুলির পরিবর্তন ঘটলে তা নিতান্তই অকেজো। সহজ-প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়াকলাপ আর নতুন অবস্থার মধ্যেকার গরমিল কাটিয়ে ওঠা হয় সাপেক্ষ প্রতিবর্তসমূহ ও সেগুলির ভিত্তিতে গঠিত দক্ষতাগুলির সাহায্যে। সাপেক্ষ প্রতিবর্তগুলি অর্জিত ও রক্ষিত হয় প্রতিক্রিয়া হিসেবে নতুন অবস্থার প্রভাবের সাড়ায়। এই প্রভাব যখন বদলে যায় বা শেষ হয়ে যায়, তখন সাপেক্ষ প্রতিবর্তগুলি অন্যান্য প্রতিবর্তের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, অথবা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়। জীবন্ত সত্তাগুলির জীবনে সেগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাহ্যিক পৃথিবীর সঙ্গে জীবসত্তার আন্তঃসংযোগকে সেগুলিই করে তোলে আরও নমনীয় ও অভিযোজনীয়। অ-সাপেক্ষ ও সাপেক্ষ প্রতিবর্তগুলির সাহায্যে পৃথিবীকে প্রতিফলিত করে প্রাণীরা নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় এবং নতুন পরিস্থিতিতে টিকে থাকে।

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বিকশিত মন হল নরাকার বানরের। তার চরম বহিঃপ্রকাশ হল মূর্ত-

নির্দিষ্ট ব্যবহারিক-পরিস্থিতিগত চিন্তন। 'পরখ ও ভুলের' মধ্য দিয়ে বানর সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলির মীমাংসা খুঁজে বার করে। যেমন, একটি কলা যদি ছাদ থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং মেঝের উপরে অনেকগুলি বাক্স ছড়িয়ে রাখা হয়, তা হলে একটা বানর শেষ পর্যন্ত কলাটার নাগাল পেতে সমর্থ হবে। মেঝে থেকে অথবা বিভিন্ন বাক্সের উপর থেকে লাফ দিতে-দিতে, সেটি শেষ পর্যন্ত বাক্সগুলি নিয়ে এদিক-ওদিক করবে, একটির উপরে আরেকটিকে জড়ো করবে, এবং তার পর কলাটার নাগাল পাবে। স্বভাবতই, এরূপ ক্রিয়াকে সচেতন বলে গণ্য করা যায় না।

চৈতন্য হল প্রতিফলনের সর্বোচ্চ ও একান্ত মানবিক রূপ। তা উদ্ভূত হয়েছিল মানুষ ও মানব সমাজের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে, এবং সেই সমাজের বাইরে তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

৩। চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ

জলবায়ুর অবস্থায় ও পৃথিবীতে প্রাণের অন্যান্য অবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনগুলির সঙ্গে মানুষের উদ্ভব সম্পর্কিত। এই পরিবর্তনগুলির ফলে বিরাট বিরাট এলাকার অরণ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রাণীদের বহু প্রজাতি এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না-পেরে মরে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু নরাকার বানররা জীবনের জন্য নিষ্ঠুর লড়াই করতে এক বিশেষ

পথ গ্রহণ করেছিল। গাছ থেকে মাটিতে নেমে আসতে বাধ্য হয়ে, শিকারী পশুদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে হয়েছিল এবং প্রাকৃতিক জিনিসগুলির সাহায্যে খাদ্য জোগাড় করতে হয়েছিল। এই ক্রিয়াগুলি প্রথমে ছিল আপতিক, কিন্তু সেগুলির দরুন সাধারণত ইতিবাচক ফল হত বলে এবং সেগুলি কোনো চাহিদা পূরণ করতে সাহায্য করত বলে সেগুলি ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠেছিল একটা অভ্যাস, স্বীয় অধিকারবলে একটা প্রয়োজন। আর, শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য হাতিয়ারপত্র ব্যবহার করার সেই প্রয়োজন আরেকটি চাহিদা সৃষ্টি করেছিল: মানুষের পূর্বপুরুষদের একটি যূথ যেখানে বসবাস করত সেখানে যখন প্রয়োজনীয় 'সাধিত্রগুলি' পাওয়া গেল না, তখন সেগুলি তৈরি করা দরকার হল। সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল বাড়তি হাতিয়ারপত্র — পাথরের ছুরি। ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছিল উৎপাদন-ক্রিয়ার গোটা একটা পরম্পরা: পাথরের ছুরি তৈরি করা, সেই ছুরির সাহায্যে বর্শা তৈরি করা, ইত্যাদি। মানুষের প্রাণী-পূর্বপুরুষদের সেই প্রবণতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলি ক্রমে ক্রমে বিবর্তিত হয়ে পরিণত হয়েছিল সচেতন ক্রিয়ায়, তার লক্ষ্য ছিল বিশেষভাবে তৈরি সাধিত্রগুলির সাহায্যে পারিপার্শ্বিক বাস্তবকে পরিবর্তিত করা।

ক্রিয়ার সাধিত্র হিসেবে জিনিসপত্রের ব্যবহার থেকে সাধিত্র তৈরি এবং সাধিত্রের সাহায্যে জিনিসপত্র ও ভোগের উপায় উৎপাদনে উত্তরণ মানুষের গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটা ছিল গুণগতভাবে এক নতুন

ধরনের মৌল ক্রিয়াকলাপে উত্তরণ, এক উচ্চতর, সবিশেষভাবে মানবিক ধরনের আচরণে, মানবচৈতন্য গঠনের দিকে উত্তরণ।

শ্রমই দেহ ও মস্তিষ্ককে, সামগ্রিকভাবে প্রতিফলন-যন্ত্রকে বিশেষভাবে মানবিক গুণাবলী প্রদান করেছিল। সামনের যে দুটি পা হাঁটার জন্য আর ব্যবহৃত হত না, সে দুটি বিকাশলাভ করে পরিণত হয়েছিল হাতে। দেহ ঋজু হয়েছিল এবং বহুবিধ ও সমন্বিত ক্রিয়ার অনেক বেশি ক্ষমতা অর্জন করেছিল। মস্তিষ্ক শুধু যে ওজনে ও আয়তনে বেড়েছিল তাই নয়, আভ্যন্তরিক গঠনকাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও গিয়েছিল।

মস্তিষ্কের ওজন ও আয়তনের উপরে মানুষের চৈতন্যের বিকাশের নির্ভরশীলতাকে গবেষকরা এখন চূড়ান্তভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। যেমন, বৃহত্তম বানরের সর্ববৃহৎ মস্তিষ্ক পরিমাণে ৬০০ ঘন সেন্টিমিটারের চেয়ে বেশি নয়, অথচ মানুষের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ পিথেকানথ্রোপাসের (বা জাভা মানুষ) মস্তিষ্কের পরিমাণ ছিল ৮০০-৯০০ ঘন সেন্টিমিটার, সিনানথ্রোপাসের (বা পিকিং মানুষ, আদিম বাক্‌শক্তি যার বৈশিষ্ট্য ছিল) — ১,০০০-১,২০০ ঘন সেন্টিমিটার, এবং ৩,০০,০০০ বছর আগে জীবিত নিআনডারথাল মানুষের — ১,৩০০-১,৬০০ ঘন সেন্টিমিটার। আধুনিক ধরনের মানুষ ক্রো-ম্যাগনন মানুষের মস্তিষ্কের পরিমাণ ১,৪০০ ঘন সেন্টিমিটার, বা তার দেহের ওজনের ছেচল্লিশতম অংশ। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে সংবেদজ ও গতিদায়ক এলাকাগুলির

সম্প্রসারণ, এবং বহির্ভাগীয় অনুষঙ্গ এলাকাগুলিরও সম্প্রসারণ মস্তিষ্কের গঠনকাঠামোগত বিকাশে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সামান্যীকরণের সামর্থ্যের এক নতুন স্তর — বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের উচ্চতর রূপগুলির গঠনের পক্ষে তা ছিল অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের গঠনে আরেকটি প্রধান বিষয় ছিল এই যে বড় বড় পশু শিকারে সাফল্য অধিকাংশই নির্ভর করত মানুষের পূর্বপুরুষরা কত সংগঠিত ছিল, তার উপরে। সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যেত তখন, যখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ পশুটিকে গুপ্তস্থান থেকে হতচকিত হয়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করত, অন্যরা সেটিকে কোণঠাসা করত, এবং অন্যরা সেটিকে হত্যা করত বর্শা, মুগুর ও অন্যান্য হাতিয়ার ব্যবহার করে। তাই, যৌথ শিকারের সময়ে প্রতিটি ব্যক্তিকে একটা বিশেষ স্থান নিতে হত এবং নির্দিষ্ট সব ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হত। ফলে, মানুষ নিজেকে একটা সমষ্টির মধ্যে সক্রিয় একজন বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে আলাদা করে নিতে শিখেছিল।

নতুন ধরনের ক্রিয়া (উৎপাদন) ও নতুন ধরনের সম্পর্কের (উৎপাদন-সম্পর্ক) ফলে পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতিফলনে গুণগত সব পরিবর্তন ঘটেছিল। পশুরা প্রকৃতি থেকে নিজেদের আলাদা করে না, অথচ মানুষ ক্রমে ক্রমে পারিপার্শ্বিক বস্তুনিচয় থেকে ও অন্যান্য লোকের কাছ থেকে নিজেকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। সে একটি বিশেষ সামর্থ্যেরও বিকাশ ঘটিয়েছিল: সচেতনভাবে নিজের সামনে একটা লক্ষ্য

নির্ধারণ করার সামর্থ্য। পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে সচেতনতা, একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিমানুষ হিসেবে নিজের সম্বন্ধে সচেতনতা এবং লক্ষ্য-নির্ধারণ — বাস্তবের প্রতিফলনের রূপের এই সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিই মানুষের গঠন চলাকালে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মানব-চৈতন্যের এই বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারিত হয়েছিল উৎপাদনের বিকাশে গড়ে-ওঠা বস্তুগত সম্পর্ক দিয়ে।

এই সমস্ত সম্পর্কের আত্মপ্রকাশ, অস্তিত্ব ও বিকাশের ফলে দরকার হয়েছিল ব্যক্তিমানুষদের সমবেত ক্রিয়া, এবং তার জন্য তাদের পক্ষে প্রয়োজন হয়েছিল লক্ষ্য ও কর্তব্যকর্ম নির্ণয় করা, কাজগুলি বণ্টন করা, এবং তথ্য বিনিময় করা। 'সংক্ষেপে, রূপলাভ করতে-থাকা মানুষেরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছিল যেখানে পরস্পরকে **কিছু বলা দরকার** হয়েছিল তাদের।'* নতুন প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে, ভাষা গড়ে উঠেছিল ভাব-বিনিময়ের উপায় হিসেবে। রূপলাভ করতে-থাকা মানুষ পৃথক পৃথক ব্যাপার ও সেগুলির গুণ-ধর্মকে, বস্তু ও ক্রিয়াকে বোঝাতে শুরু করল নির্দিষ্ট ধ্বনি ও প্রতীকের সাহায্যে, সেগুলিকে ব্যবহার করতে লাগল পরস্পরকে তথ্য আদানপ্রদান করার জন্য। যে শব্দগুলি তারা বস্তু ও ব্যাপারসমূহ বোঝাবার জন্য ব্যবহার করত, সেগুলিই শেষোক্তগুলির প্রতিকল্প হয়ে গিয়েছিল এবং মানুষ সেগুলিতে সাড়া দিত ঠিক সেইভাবেই, যেমন সাড়া দিত সেগুলি যেসমস্ত বস্তু ও ব্যাপারের পরিচায়ক সেই সব বস্তু ও ব্যাপারে।

* Frederick Engels, *Dialectics of Nature,* p. 173.

শব্দের সাহায্যে বাস্তবের প্রতিফলন বিশেষভাবেই মানবিক রূপ। পশুরা পারিপার্শ্বিক বাস্তবের প্রতিফলন ঘটায় সেই বাস্তবটিরই সংকেতগুলির মধ্য দিয়ে। সংকেতের এই ব্যবস্থাটা পশুপাখি ও মানুষের পক্ষে অভিন্ন, তা প্রথম সংকেত ব্যবস্থা নামে পরিচিত। বাস্তব বস্তু ও ব্যাপারসমূহকে যা প্রতীকীকৃত করে সেই শব্দগুলি দিয়ে গঠিত সংকেত ব্যবস্থাকে বলা হয় দ্বিতীয় সংকেত ব্যবস্থা।

সুতরাং, চৈতন্য উদ্ভূত হয়েছিল উৎপাদনের প্রয়োজন থেকে ও সামগ্রিকভাবে সমাজজীবন থেকে। সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের বাইরে চৈতন্য কখনোই উদ্ভূত হতে বা থাকতে পারে না। তা হল একটি সামাজিক উৎপাদ, শ্রম ও সম্মিলিত মানবিক ক্রিয়াকলাপের ফল।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সেই সিদ্ধান্তটি বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত। শুধু সামগ্রিকভাবে সমাজের গঠনের পক্ষেই নয়, একটি একক মানবচৈতন্যের গঠনের পক্ষেও তা সিদ্ধ। একটি নবজাত শিশু হল চৈতন্যহীন একটা সত্তা, সে চৈতন্য অর্জন করে শুধু ক্রমে ক্রমে। যে শিশু অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শ ছাড়া বড় হয়ে উঠছে তার আদৌ কোনো চৈতন্যই কখনও গড়ে উঠবে না। ঐতিহাসিক নজির থেকে দেখা যায় যে মানব-সমাজের বাইরে চৈতন্য বিকাশলাভ করে না। যেমন, ১৯২০ সালের ২১ অক্টোবরে, ভারতের গোদামুরি গ্রামের এক অরণ্যে একটা নেকড়ের পালের মধ্যে দুই ও নয় বছর বয়সের দুটি মেয়েকে পাওয়া গিয়েছিল। তাদের নাম দেওয়া হল অমলা ও কমলা। অমলা অল্প

কিছুকাল পরেই মারা যায়, কমলা আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিল। কিন্তু বিশেষ শিক্ষাগত ব্যবস্থা সত্ত্বেও, সে কখনোই পুরোপুরি মানুষ হয়ে ওঠে নি। বাক্‌শক্তি, চিন্তন ও মানুষের কাজকর্মের ধরন তার আয়ত্তের বাইরেই থেকে গিয়েছিল। অনুরূপ আরেকটি ঘটনায়, ১৭৯৭ সালে একটি অরণ্যে উদ্ধারকৃত ১২ বছর বয়সের ফরাসী বালক ভিক্তর ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিল, কিন্তু সে পুরোপুরি কথা বলা শিখতে পারে নি, তাকে কোনোমতে সোজা হয়ে হাঁটতে শেখানো হয়েছিল এবং বিপদের সামান্যতম চিহ্ন দেখলেই সে তার হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে চলতে চাইত। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে পড়তে বা লিখতে শেখে নি।

মানুষ ও মানবচৈতন্যের গঠন এটাই পূর্বানুমান করে নেয় যে ব্যক্তিমানুষ একেবারে গোড়ার দিনগুলি থেকে সামাজিক জীবনে জড়িত।

৪। চৈতন্যের সারমর্ম

তাই, আমরা দেখতে পাই যে মানুষের পূর্বপুরুষ তার নিজের সত্তা, তার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়ায়, বাহ্যিক জগৎ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে তার প্রতি নিজের মনোভাব নির্ধারণ করায়, চৈতন্য প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। আদিম মানুষ তার প্রকাশমান চৈতন্য দিয়ে সর্বপ্রথম লক্ষ করেছিল যে সে আছে, এবং কীভাবে সে আছে। তার চারপাশে কী

ঘটছে তা সে উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল। ভাষান্তরে, চৈতন্য হল চারপাশে কী ঘটছে সে সম্বন্ধে একটা সচেতনতা, একটা জ্ঞান। এরূপ সচেতনতা বাস্তবের প্রতিফলনের শুধু মানবিক রূপটিরই বৈশিষ্ট্যসূচক।

প্রতিফলনের সর্বোচ্চ ও বিশুদ্ধ মানবিক রূপ হিসেবে চৈতন্যের কথা বলতে গিয়ে, তার প্রধান প্রধান সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রণিধান করা উচিত।

প্রথম, মানুষ পৃথিবীকে প্রতিফলিত করে তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দিকগুলির ঐক্য হিসেবে, শুধু সংবেদজ প্রতিরূপগুলির রূপেই নয়, ধারণাগত, বিমূর্ত চিন্তা ও বাচনের মধ্য দিয়ে নিয়ম ও বর্গসমূহ, শৈল্পিক প্রতিরূপ, প্রভৃতির রূপেও।

দ্বিতীয়, মানবচৈতন্য তার নিজের ক্রিয়ার ফলাফল, প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ বিকাশের চরিত্র ও গতিমুখ দেখতে পায় দূরদৃষ্টিতে। প্রারম্ভিকভাবে তা অর্জিত হয় জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, এবং সমাজবিকাশের বর্তমান স্তরে, অনেকাংশে প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানের ভিত্তিতে।

তৃতীয়, চৈতন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে, আদর্শ সূত্রায়িত করতে, এবং ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকলাপের ভাবগত ফলাফল অভিক্ষেপ করতে সক্ষম। লক্ষ্য নির্ধারণ হল সচেতন, পরিকল্পিত ক্রিয়ার এক আবশ্যিক পূর্বশর্ত।

চতুর্থ, মানবচৈতন্য বাস্তবের মূল্যাবধারণ করে। লক্ষ্য, স্বার্থ ও আদর্শ নির্ণয় করার সময়ে, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পালন করার সময়ে মানুষ শুধু

জ্ঞানের দ্বারা চালিতই হয় না, ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন-সাপেক্ষে সে বিবেচ্য ব্যাপারটির মূল্যাবধারণও করে প্রয়োজনীয় অথবা অপ্রয়োজনীয় বলে, উপযোগী অথবা অকেজো বলে, অনুকূল অথবা ক্ষতিকর বলে।

পঞ্চম, মানবচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য হল আত্ম-চৈতন্য, শুধু বাহ্যিক জগৎই নয়, আন্তর জগৎকেও তা প্রতিফলিত করে, এবং আত্ম-চৈতন্যকে করে তোলে আরও একটি অবধারণার বস্তু।

ষষ্ঠ, চৈতন্য সৃষ্টিশীল, পারিপার্শ্বিক জগৎকে তা সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে। মানুষের চৈতন্যের কাজ হল সমাজজীবনের শুধু প্রকৃত অবস্থাই নয়, সম্ভাব্য অবস্থাকেও মানুষের স্বার্থে পরিবর্তিত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় বার করার উদ্দেশ্যে, ব্যক্তিমানুষ ও সমাজ উভয়েরই চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। এঙ্গেলস লিখেছেন, প্রাকৃতিক অবস্থা মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না, তার 'স্বাভাবিক অবস্থা হল তার চৈতন্যের উপযুক্ত অবস্থা, যে অবস্থা **তার নিজের দ্বারা সৃষ্ট হতে হয়**'।*

মানবচৈতন্যের সক্রিয়তা প্রকাশ পায় বাস্তবের ব্যবহারিক অবধারণা ও রূপান্তরের ব্যবস্থায় তার ক্রিয়াগুলির মধ্যে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অবধারণামূলক, গঠনমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক ক্রিয়া।

---

* Frederick Engels, *Dialectics of Nature*, p. 195.

প্রথমে, অবধারণামূলক ক্রিয়া। ব্যক্তিমানুষ তার চৈতন্য দিয়ে জগৎকে প্রতিফলিত করে তার সম্বন্ধে নতুন তথ্য পায়। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত তথ্যের উপরে, বিষয়টি সম্বন্ধে ব্যক্তিমানুষের আগেকার ধারণার উপরে সেই নতুন তথ্যটি আরোপিত হয়। এই সমস্ত ধারণা, সব সময়েই কিছুটা অ-যথাযথ, অসম্পূর্ণ ও অ-বিশদ। এর ফলে দেখা দেয় এক বিরোধ, যার মীমাংসার জন্য দরকার হয় তুলনা, যাচাই ও অনুসন্ধান। ফলে, বিষয়টি সম্বন্ধে ব্যক্তিমানুষ নতুন জ্ঞান লাভ করে।

চৈতন্যের সক্রিয় ভূমিকা পূর্ণতমভাবে প্রকাশ পায় তার গঠনমূলক ক্রিয়ায়, বাস্তবের অগ্র-প্রতিফলন ও উদ্দেশ্যপূর্ণ রূপান্তরে। ফলে মানুষ সৃষ্টি করে নতুন নতুন রূপ, যেগুলি প্রাকৃতিক জগতে নেই।

ভবিষ্যতের দিকে অভিমুখীনতা, চৈতন্যের অবধারণামূলক, গঠনমূলক ও পূর্বাভাসমূলক ভূমিকা নতুন সমাজ নির্মাণে, জনগণতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের এক সমাজ নির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাস ও পরিকল্পনার উপরে বিরাট গুরুত্ব আরোপ করে। সমাজজীবনে চৈতন্যের বিশাল সংগঠনমূলক ও রূপান্তরমূলক গুরুত্বের কথা মনে রেখে, তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিসমূহের ভিত্তিতে নিজেদের কর্মীদের ও শ্রমজীবী জনসাধারণকে শিক্ষিত করার কাজকে অতি জরুরি কাজ বলে মনে করে। তারা জনগণকে শিক্ষিত করতে চেষ্টা করে, যাতে

জনগণ বিশ্ব ঘটনাবিকাশ ও দেশের ঘটনাবলীর গতি ও পরিপ্রেক্ষিত দেখতে, বুঝতে ও সঠিকভাবে মূল্যাবধারণ করতে সক্ষম হয়, এক নতুন জীবনের জন্য লড়াই করতে ও সচেতনভাবে তা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

চৈতন্যের নিয়ন্ত্রণমূলক ক্রিয়ার দুটি রূপ আছে: প্রেষণাগত ও কার্যনির্বাহী। ভাবধারণাগুলি প্রেষণার শক্তি অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে, ব্যক্তিমানুষ তার মতপ্রত্যয় অনুযায়ী সচেতন ও উদ্দেশ্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমন, জনগণের অসংখ্য বিপ্লবী-মনস্ক সন্তান তাদের দেশ ও জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। কার্যনির্বাহী নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিমানুষকে সক্ষম করে তোলে তার লক্ষ্যকে সেই লক্ষ্য অর্জনের বাস্তবসম্মত উপায়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে।

মানবচৈতন্যের ক্রিয়া বৈজ্ঞানিক ধারায় তার গঠনকে প্রভাবিত করা আবশ্যকীয় করে তোলে। পৃথিবী সৃষ্ট, পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয় সচেতন মানুষদের দ্বারা, যারা বাস করে এক নির্দিষ্ট যুগে ও এক নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক-ব্যবস্থায়। পৃথিবীকে তারা কতখানি মাত্রায় রূপান্তরিত করতে পারে এবং তাদের নিজেদের অস্তিত্বের বস্তুগত অবস্থা কতখানি বদলাতে পারে, সেটা নির্ভর করে অতীত প্রজন্মগুলির কাছ থেকে তাদের পাওয়া সামাজিক সম্পর্ক ও তাদের নিজেদের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ উভয়েরই উপরে, তাদের নিজে-দের চৈতন্যের বিকাশের স্তরের উপরে। সেই জন্যই,

সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তনের সংগ্রামে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি জনগণের মধ্যে এক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের প্রতি, বৈপ্লবিক শিক্ষার সাহায্যে তাদের জনগণতন্ত্র, শান্তি ও সমাজ-তন্ত্রের জন্য সচেতন ও সক্রিয় যোদ্ধায় পরিণত করার প্রতি এত মনোযোগ দেয়।

৫। চৈতন্য ও ভাষার ঐক্য

অন্য যে কোনো বাস্তবের ব্যাপারের মতোই, চৈতন্যেরও আছে সত্তার নিজস্ব সব ধরন ও রূপ, যার বাইরে তা থাকতে পারে না। ভাষা হল তার সত্তার এই রকম একটি ধরন।

চৈতন্য তার আত্মপ্রকাশের সময় থেকেই ছিল ভাষার বস্তুগত বহিরাবরণের মধ্যে। ভাষার মধ্য দিয়ে, তা বাস্তবে পরিণত হয় এবং অন্যান্য লোকের দ্বারা প্রত্যক্ষণ ও অনুধাবনের পক্ষে অধিগম্য হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছেন: 'মানুষ 'চৈতন্যের'ও অধিকারী। কিন্তু এমন কি গোড়া থেকেই তা 'বিশুদ্ধ' চৈতন্য নয়। 'মন' শুরু থেকেই বস্তু দিয়ে 'ভারাক্রান্ত' হওয়ার অভিশাপগ্রস্ত, যে বস্তু এখানে আত্মপ্রকাশ করে বায়ু, ধ্বনির, সংক্ষেপে, ভাষার আলোড়িত স্তরগুলির রূপে। ভাষা চৈতন্যেরই বয়সী, ভাষাই **হল** ব্যবহারিক, বাস্তব চৈতন্য, যা আছে অন্যান্য মানুষের জন্যও, এবং একমাত্র তাই তা আছে আমার জন্যও; ভাষা, চৈতন্যের মতোই,

শুধু উদ্ভূত হয় অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আদানপ্রদানের চাহিদা, প্রয়োজন থেকে।'*

মানুষের কাছে তার নিজের ও অন্য লোকের চিন্তাও অধিগম্য হয়ে ওঠে একমাত্র শব্দের মধ্য দিয়ে, ভাষার মধ্য দিয়ে। ভাষা ও চৈতন্য একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে না, এবং যে সব শিশু কোনো কারণে কোনো ভাষা শেখে নি, তাদের যে চৈতন্য নেই, এই ঘটনাটাই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ভাষা থাকে প্রতীকসমূহের এক অখন্ড-সংবদ্ধ ও ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার রূপে। সেই ব্যবস্থার একটা সুনির্দিষ্ট গঠনকাঠামো আছে এবং বিকাশের কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম দিয়ে তা শাসিত হয়। এটা দেখায় যে ভাষার কিছু স্বাধীনতা আছে।

কিন্তু ঠিক চৈতন্যের মতোই, ভাষা সামাজিকভাবে শর্তাবদ্ধ। তা চৈতন্যের সঙ্গে যুগপৎভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছিল মানুষের আদানপ্রদান ও অবধারণার এক হাতিয়ার হিসেবে, মানুষের সামাজিক ও শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপের হাতিয়ার হিসেবে। চৈতন্য যেখানে বাস্তবকে প্রতিফলিত করে, সেখানে ভাষা তাকে আখ্যায়িত করে, এবং ভাব প্রকাশ করে। ভাষায় ও বাচনে, মানুষের ভাব, ধারণা ও অনুভূতিগুলিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক বস্তুগত রূপ দেওয়া হয়, এবং এইভাবে অন্যান্য লোকের আয়ত্তের মধ্যে আনা হয়।

---

* Karl Marx, Frederick Engels. *Collected Works*, Vol. 5, pp. 43-44.

সেই জন্যই বাচন একটি শক্তিশালী হাতিয়ার যা ব্যক্তিমানুষদের সক্ষম করে অন্যদের প্রভাবিত করতে, এবং সমাজকে সক্ষম করে ব্যক্তিমানুষকে প্রভাবিত করতে।

চৈতন্যের গঠন ও বিকাশে, ভাষা অনেকগুলি ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

প্রথম, আখ্যামূলক ক্রিয়া। লোকে শব্দগুলি ব্যবহার করে পারিপার্শ্বিক বস্তু ও ব্যাপারসমূহকে, সেগুলির সংযোগ ও সম্পর্ককে, তাদের নিজেদের বিষয়ীগত অবস্থাকে, পৃথিবীর প্রতি তাদের মনোভাব, প্রভৃতিকে আখ্যায়িত করার জন্য। শব্দ হল জগৎ সম্বন্ধে মানবজ্ঞানের এক বাহন, ভাব ও বস্তুনিচয়ের এক মধ্যগ, কেননা তা বস্তুটিকে যুগপৎভাবে প্রতিফলিত ও আখ্যায়িত করে। চিন্তনের বিমূর্তনমূলক ক্রিয়াকে তা বিধৃত করে।

শব্দ একভাবে বস্তুটির প্রতিকল্প হয়, মানবচৈতন্যে সেটির পরিচায়ক হয়। খোদ চিন্তনের প্রক্রিয়াকেই, বাস্তব বস্তুনিচয়, সেগুলির গুণ-ধর্ম ও সম্পর্কের প্রতীকস্বরূপ ভাবগত প্রতিরূপগুলি নিয়ে মানসিক অনুশীলনকে তা সম্ভব করে তোলে।

দ্বিতীয়, সামান্যীকরণমূলক ক্রিয়া। শব্দগুলি চৈতন্যে বাস্তবের এক সামান্যীকৃত প্রতিফলনের সম্ভাবনা তৈরি করে। লেনিন লিখেছেন, 'প্রত্যেকটি শব্দই (বাচন) **সর্বজনীনতা ঘটায়।**'* দৃষ্টান্তস্বরূপ,

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 38, 1976, p. 272.

'বস্তু' শব্দটিই নিন। তা একক-স্বতন্ত্র কিছুকে (যা শব্দ ও প্রত্যয়ের এক প্রণালী দিয়ে প্রকাশিত হয়) প্রকাশ করে না, বরং যা প্রত্যেক জিনিসের বৈশিষ্ট্যসূচক, বিষয়গতভাবে ও চৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে যার অস্তিত্ব আছে তাকেই বেষ্টন করে। এইভাবে, ভাষা ও বাক্‌শক্তি বাস্তবের এক সংক্ষেপিত ভাবগত পুনরুপস্থাপনের সম্ভাবনা, এবং ফলত, জ্ঞানের সুবিন্যস্ত প্রত্যক্ষণ, ধারণ, ব্যবহার ও হস্তান্তরের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। সেই অর্থে, ভাষা হল মানবজাতির জ্ঞানের বৃহত্তম সঞ্চয়কারী। তার ইতিহাস হল মানবজাতির জগৎ অবধারণার ইতিহাস।

তৃতীয়, আদানপ্রদানমূলক ক্রিয়া। ভাষা হল বিভিন্ন ব্যক্তিমানুষ, জাতি, অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলির মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের উপায়। ভাষার সেই ক্রিয়াটি লিপির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তখন থেকে, মানবজাতির সামাজিক ও শ্রমমূলক অভিজ্ঞতা, অবধারণাগত ও নান্দনিক ক্রিয়াকলাপ, এবং বৈষয়িক ও আত্মিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কৃতিত্বগুলি বিশেষ কার্যকরতার সঙ্গে সঞ্চিত ও নথিবদ্ধ হয়েছে। আমাদের কালে, পৃথিবীর অবধারণা ও বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনের ক্ষেত্রে ভাষার আদানপ্রদানমূলক ক্রিয়া আরও বেড়েছে, কেননা শান্তি, আন্তর্জাতিক সহজ সম্পর্ক, গণতন্ত্র, প্রগতি, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের সংগ্রামে কোটি কোটি মানুষ জড়িত হচ্ছে। সেটা হয়েছে জাতিগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক-কৃৎকৌশলগত

ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের দরুন, আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের স্বাভাবিক গতিধারার দরুন।

ভাষা শুধু অবধারণার একটা হাতিয়ার নয়, পৃথিবীর ব্যবহারিক রূপান্তরসাধনেরও হাতিয়ার। সেই জন্যই, এই তিনটি ক্রিয়া ছাড়াও ও এই ক্রিয়াগুলির ভিত্তিতে, তা ভাব-প্রকাশ ও প্রভাবের ক্রিয়াগুলিও সম্পন্ন করে।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া ও ঘটনাসমূহের সঙ্গে মানুষ নানাভাবে যুক্ত, কেননা সেগুলি তার স্বার্থ ও প্রয়োজনকে প্রভাবিত করে। সেই জন্যই সে এই সমস্ত প্রক্রিয়া ও ঘটনার প্রতি একটা নির্দিষ্ট ভাবাবেগগত মনোভাব গ্রহণ করে সর্বদাই সেগুলির মূল্যাবধারণ করে। ভাষায় মুদ্রিত সেই ভাবাবেগগত মনোভাবই ভাব-প্রকাশের ক্রিয়াকে মূর্ত করে।

মানুষ তার বাচনে সর্বদাই কিছুটা পরিমাণে, সচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে, হয় নিজেকে না হয় অন্যান্য লোককে সম্বোধন করে। তাতে সর্বদাই থাকে প্রস্তাব, প্রশ্ন, কর্তব্যকর্ম, অভিযোগ, অনুরোধ, আদেশ, ইত্যাদি, যেগুলি কোনো না কোনোভাবে লোককে ক্রিয়ায় প্ররোচিত করে। এই হল প্রভাবমূলক ক্রিয়া।

ভাষার সমস্ত ক্রিয়াই চৈতন্যের সঙ্গে ঐক্যে ও আন্তঃসংযোগে প্রকাশ পায়। চৈতন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ভাষা অর্থহীন বা অস্তিত্বহীন। চৈতন্য ও ভাষা তাদের আন্তঃসংযোগে সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় বিকশিত হয়।

প্রসঙ্গ ৬।

সার্বিক সংযোগ ও বিকাশের মতবাদ হিসেবে ডায়ালেকটিকস

১। একটি বিজ্ঞান হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনে 'ডায়ালেকটিকস' প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয় বাস্তবের অবধারণা ও রূপান্তরের তত্ত্ব ও পদ্ধতি বোঝানোর জন্য। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস আর দার্শনিক বস্তুবাদ হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অখন্ড-সংবদ্ধ দার্শনিক মতবাদের দুটি পরস্পর-অনুপ্রবেশকারী দিক।

দার্শনিক বস্তুবাদের উপজীব্য হল বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য প্রশ্নগুলি, পারিপার্শ্বিক জগতের চরিত্র। পৃথিবীর কী ঘটছে, তা উদ্ভূত হয়েছিল না চিরন্তনভাবে ছিল, তা অপরিবর্তনীয় না পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়ে চলেছে — এই প্রশ্নের উত্তর দেয় বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস।

প্রথমে একটি বিজ্ঞান হিসেবে ডায়ালেকটিকসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

ডায়ালেকটিকসের দুটি সুপরিচিত সংজ্ঞার্থ সূত্রায়িত করেছিলেন এঙ্গেলস। Dialectics of Nature-এ তিনি এর সংজ্ঞার্থনিরূপণ করেছেন সংযোগসমূহের বিজ্ঞান বলে, এবং Anti-Dühring-এ, সমস্ত গতি ও বিকাশের বিশ্বজনীন নিয়মগুলির বিজ্ঞান বলে। বিশ্বজনীন সংযোগের নীতিটিকে এঙ্গেলস বিবেচনা করেছিলেন গতি ও বিকাশের নীতির ঘনিষ্ঠ ঐক্যে, কেননা বস্তুগত জগতে সংযোগ বলতে বোঝায় মিথষ্ক্রিয়া, আর মিথষ্ক্রিয়া হল গতি ও বিকাশ। 'আমাদের অধিগম্য প্রকৃতির গোটাটাই গঠন করে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র, পদার্থসমূহের এক আন্তঃসংযুক্ত সামগ্রিকতা, এবং পদার্থসমূহ বলতে আমরা এখানে বুঝি সমস্ত বস্তুগত অস্তিত্ব... এই পদার্থগুলি যে আন্তঃসংযুক্ত এই ঘটনাটির মধ্যেই এটা অন্তর্ভুক্ত যে সেগুলি একটি অপরটির প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায়, আর এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াই হল গতি।'* সেই জন্যই এঙ্গেলস যখন বিশ্বজনীন সংযোগের বিজ্ঞান বলে ডায়ালেকটিকসের সংজ্ঞার্থ-নিরূপণ করেছিলেন, তখন তিনি এই সংযোগগুলির দ্বারা নির্ধারিত মিথষ্ক্রিয়ার বিশ্বজনীন নিয়মগুলিকেও, গতি ও বিকাশের নিয়মগুলিকেও বুঝিয়েছেন। সেই সঙ্গে সকল গতির বিশ্বজনীন নিয়মগুলির বিজ্ঞান বলে ডায়ালেকটিকসের সংজ্ঞার্থ-নিরূপণ করার সময়ে এঙ্গেলস বিশ্বজনীন

* Frederick Engels, *Dialectics of Nature*, p. 70.

সংযোগগুলিকেও বোঝান, কেননা মিথষ্ক্রিয়া বা গতি ছাড়া কোনো সংযোগ নেই, ঠিক যেমন সংযোগ বা মিথষ্ক্রিয়া ছাড়া কোনো গতি নেই।

এঙ্গেলসের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত হয়ে লেনিন ডায়ালেকটিকসকে বর্ণনা করেছিলেন বিকাশের সমৃদ্ধতম মতবাদ বলে।*

মার্কসীয় ডায়ালেকটিকস যাত্রারম্ভ করে পৃথিবীর বস্তুগত ঐক্য থেকে এবং বস্তুর গতি ও বিকাশের সকল রূপের বিষয়মুখতা থেকে। বিষয়মুখ ও বিষয়ীমুখ ডায়ালেকটিকসের মতবাদে তার বস্তুবাদী চরিত্র সবচেয়ে বেশি প্রকট। এঙ্গেলস লিখেছেন: 'ডায়ালেকটিকস, তথাকথিত **বিষয়মুখ** ডায়ালেকটিকস, সারা প্রকৃতি জুড়ে বিরাজমান, এবং তথাকথিত বিষয়ীমুখ ডায়ালেকটিকস, দ্বান্দ্বিক চিন্তন, গতির প্রতিফলন মাত্র... যে গতি প্রকৃতিতে সর্বত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে...'**

ফলত, বিষয়মুখ ডায়ালেকটিকস হল এক অখণ্ড, অন্তঃসংযুক্ত সমগ্রের মতো খোদ বস্তুগত জগতে গতি ও বিকাশ। বিষয়ীমুখ ডায়ালেকটিকস, বা দ্বান্দ্বিক চিন্তন হল চিন্তা, ধারণা, প্রভৃতির গতি ও বিকাশ, যেগুলি মানবচৈতন্যে বিষয়মুখ ডায়ালেকটিকসের প্রতিফলন ঘটায়।

বিষয়মুখ ডায়ালেকটিকসের প্রতিফলন হওয়ার ফলে,

---

* দ্রষ্টব্য: V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 21, 1980, pp. 54-55.

** Frederick Engels, *Dialectics of Nature,* p. 211.

বিষয়ীমুখ ডায়ালেকটিকস তার অন্তর্বস্তুর দিক দিয়ে পূর্বোক্তটির সঙ্গে মেলে। দুটি একই বিশ্বজনীন নিয়মসমূহের দ্বারা শাসিত। সত্তা ও চিন্তনের এই বিশ্বজনীন নিয়মগুলি হল 'নিয়মগুলির দুই শ্রেণী, যেগুলিকে আমরা একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করতে পারি বড় জোর শুধু চিন্তায়, বাস্তবে নয়'।*

একটা বিজ্ঞান হিসেবে ডায়ালেকটিকসের বিষয়বস্তু হল অস্তিত্বের বিশ্বজনীন বিষয়মুখ নীতিগুলি এবং বস্তুগত জগতের বিকাশের নিয়মগুলি। বিষয়মুখ ডায়ালেকটিকস বিষয়ীমুখ ডায়ালেকটিকসের অন্তর্বস্তু গঠন করে। সেই জন্যই তার বুনিয়াদি নিয়ম ও মূল প্রত্যয়গুলি যুগপৎ সত্তা ও অবধারণা উভয়েরই নিয়ম ও মূল প্রত্যয়সমূহও বটে। 'এর নিহিতার্থ এই যে তার নিয়মগুলি সিদ্ধ হতে হবে প্রকৃতিতে ও মানবেতিহাসে গতির পক্ষে যতখানি, ঠিক ততখানি চিন্তনের গতির পক্ষে।'**

তার ভিত্তিতে, লেনিন এই অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত টানেন যে মার্কসীয় দর্শনে ডায়ালেকটিকস, যুক্তিবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্বের সমাপতন ঘটেছে। এর মানে এই যে প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তনের (অবধারণার) বিকাশের সবচেয়ে সাধারণ নিয়মগুলি একই। এগুলি হল বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের নিয়ম। সেই জন্যই বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের যুক্তি ও জ্ঞানের তত্ত্ব। লেনিন লিখেছেন,

---

* Frederick Engels, *Anti-Dühring*, p. 137.

** Frederick Engels, *Dialectics of Nature*, p. 267.

'ডায়ালেকটিকসই হল... মার্কসবাদের জ্ঞানের তত্ত্ব।'*

বিকাশের এক সাধারণ তত্ত্ব হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। এটা ছাড়া, পৃথিবীর এক আধুনিক, অখণ্ড ও বৈজ্ঞানিক চিত্র কখনোই উপস্থিত করা যায় না। সেই সঙ্গে, তা হল পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক অবধারণা ও বৈপ্লবিক রূপান্তরের এক অপরিহার্য হাতিয়ার। সেই জন্যই লেনিন ডায়ালেকটিকসকে মার্কসবাদের 'অন্তরাত্মা' বলে অভিহিত করেছিলেন।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসকে সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এবং বিশেষভাবে মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের 'অন্তরাত্মা' বলে গণ্য করার কারণগুলি কী?

প্রথম, বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস সারমর্ম ও অন্তর্বস্তুতে বৈপ্লবিক। সব কিছুকে তা দেখে গতি, পরিবর্তন ও বিকাশের মধ্যে। এইভাবে, তা পৃথিবীতে সমস্ত ব্যাপারের, বিশেষত সামাজিক সম্পর্কের সমস্ত রূপের ঐতিহাসিকভাবে অচিরস্থায়ী চরিত্র উদ্ঘাটন করে। মার্কস লিখেছেন, বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস 'বুর্জোয়াতন্ত্রের কাছে ও তার মতান্ধ অধ্যাপকদের কাছে একটা কেলেঙ্কারি ও ঘৃণ্য বস্তু, কারণ তা বিদ্যমান অবস্থা সম্বন্ধে তার অনুধাবন ও ইতিবাচক স্বীকৃতির মধ্যে একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে সেই অবস্থার নিরাকরণের, তার অবশ্যম্ভাবী ভাঙনের

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 38, p. 360.

স্বীকৃতি, ... তা তার উপরে কিছুই চাপিয়ে দিতে দেয় না, এবং তার সারমর্মে তা সমালোচনাত্মক ও বৈপ্লবিক।'*

দ্বিতীয়, বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস সমাজপ্রগতির সামগ্রিক গতিমুখ এবং পুঁজিবাদ (কিংবা এমন কি বিকাশের প্রাক-পুঁজিবাদী রূপগুলি) থেকে সমাজতন্ত্রে ও কমিউনিজমে উত্তরণের যুক্তি শুধু ব্যাখ্যাই করে না। প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক কর্মব্রত, তার প্রগতিশীল আদর্শগুলি, এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শোষণমূলক ব্যবস্থা বিলুপ্ত করার জন্য তার অজেয় প্রয়াসের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস অবধারণার সাধারণ নিয়মগুলি ও শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করে বলেই, তা তাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির রণনীতি ও রণকৌশলের এক তত্ত্বগত ভিত্তি যোগায়। লেনিন লিখেছেন, 'প্রলেতারীয় রণকৌশলের বুনিয়াদি কর্তব্যকর্ম মার্কস-কর্তৃক সংজ্ঞায়িত হয়েছিল তাঁর বস্তুবাদী-দ্বান্দ্বিক Weltanschauung-এর সমস্ত মৌলিক নীতিগুলির সঙ্গে কঠোর সামঞ্জস্য রেখে।'**

তৃতীয়, প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার, মানবজাতির সমগ্র বস্তুগত ও আত্মিক জীবনের বিকাশের বিশ্বজনীন নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করে, বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস শ্রমিক শ্রেণী ও অন্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শ, লক্ষ্য ও স্বার্থকে বৈজ্ঞানিক ধারায়

* Karl Marx, *Capital,* Vol. I, p. 29.

** V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 21, p. 75.

সূত্রায়িত করা সম্ভব করে তোলে। জনসাধারণের সৃষ্টিশীল কর্মশক্তির তা এক অগাধ উৎস, তাদের বৈপ্লবিক-রূপান্তরসাধক ক্রিয়াকলাপের পরিসর, গতিহার ও অভিমুখীনতাকে তা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

চতুর্থ, প্রাকৃতিক ও সামাজিক ব্যাপারসমূহের অবধারণায়, সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য সংগ্রামের নিয়মগুলি, এবং সামাজিক ন্যায়বিচারপূর্ণ এক সমাজ নির্মাণের নিয়মগুলির অবধারণায় বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস এক জরুরি বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পদ্ধতিতত্ত্বগত ভূমিকা পালন করে। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের গুরুত্ব এবং মার্কসবাদের মূল প্রতিজ্ঞাগুলি সূত্রায়ণে তার ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন: 'একেবারে বনিয়াদ থেকে শুরু করে সমস্ত অর্থশাস্ত্রকে নতুন করে আকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের প্রয়োগ, ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, দর্শনে এবং শ্রমিক শ্রেণীর কর্মনীতি ও রণকৌশলে তার প্রয়োগ — এটাই মার্কস ও এঙ্গেলসকে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী করেছিল, এখানেই তাঁরা যা সবচেয়ে আবশ্যিক ও নতুন তাই দান করেছিলেন, এবং সেটাই ছিল বৈপ্লবিক চিন্তার ইতিহাসে তাঁদের পরম পাণ্ডিত্যপূর্ণ অগ্রগতি।'*

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 19, 1977, p. 554.

২। ডায়ালেকটিকসের মূল নীতিগুলি

বস্তুজগতের বিকাশ ও সেই জগৎকে প্রতিফলনকারী মানবচৈতন্যের বিকাশের বিশ্বজনীন সংযোগ ও বিশ্বজনীন নিয়মগুলির বিজ্ঞান হিসেবে ডায়ালেকটিকসের সংজ্ঞার্থ-নিরূপণ করে, আমরা শুরু করি সংযোগ ও বিকাশের নীতি থেকে।

ক) বিশ্বজনীন সংযোগের নীতি। সংযোগ ও মিথষ্ক্রিয়া

ব্যাপারসমূহের বিশ্বজনীন সংযোগ হল বস্তুজগতের সাধারণতম সমানুবর্তিতা। তা উদ্ভূত হয় পৃথিবীর সমস্ত বস্তু, প্রক্রিয়া ও ব্যাপারের অভিন্ন বস্তুগত চরিত্র থেকে। বিশ্বজনীন বলতে এখানে এই বোঝায় যে, যে কোনো বস্তু বা ব্যাপারের আত্মপ্রকাশ, পরিবর্তন, বিকাশ ও গুণগতভাবে এক নতুন অবস্থায় উত্তরণ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অসম্ভব, এবং তা ঘটে একমাত্র অন্যান্য ব্যাপার ও বস্তুগত ব্যবস্থার সঙ্গে আন্তঃসংযোগে ও পরস্পরনির্ভরশীলতায়। যে কোনো একটি বস্তু বা ব্যবস্থা নানা সম্পর্কের এক শাখায়িত জালবিস্তারের মধ্য দিয়ে অন্যান্য বস্তু বা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, এবং এগুলির কোনো কোনোটিতে পরিবর্তন অন্যগুলিতেও পরিবর্তন ঘটায়।

বিশ্বজনীন ধারণার প্রত্যয়টি সমস্ত ধরন ও রূপের

সম্পর্ককে বেষ্টন করে। সেই সংযোগের অন্যতম সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য হল মিথষ্ক্রিয়া। মিথষ্ক্রিয়া বলতে বোঝায় সেই সমস্ত ধরন, প্রণালী ও রূপকে, যার মধ্যে বস্তু ও প্রক্রিয়াসমূহ পরস্পরকে প্রভাবিত করে। বস্তুগুলির যখন মিথষ্ক্রিয়া ঘটে, তখন তার ফলে সর্বদাই সেগুলির পারস্পরিক পরিবর্তন ও গতি ঘটে। বাস্তব বস্তুসমূহের মধ্যে অসংখ্য মিথষ্ক্রিয়ার জালটি সামগ্রিকভাবে হয়ে দাঁড়ায় বিকাশের সামগ্রিক বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া। এঙ্গেলস জোর দিয়ে বলেছেন: 'এই পদার্থগুলি যে আন্তঃসংযুক্ত এই ঘটনাটার মধ্যেই এটাও অন্তর্ভুক্ত যে সেগুলি পরস্পরের উপরে প্রতিক্রিয়া ঘটায়, আর এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াই তৈরি করে গতি।'*

তাই, সৌরজগতের অভ্যন্তরস্থ গ্রহগুলির সঙ্গে সূর্যের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপেই দেখা দেয় সূর্যের চারপাশে সেগুলির গতি। চেতন ও অচেতন প্রকৃতির মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া শুধু যে উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলিরই পরিবর্তন ঘটায় তাই নয়, সেগুলির পরিবেশকেও পরিবর্তন করে। বৈষয়িক উৎপাদন চলার সময়ে মানুষের মিথষ্ক্রিয়া ঘটে প্রকৃতির সঙ্গে, তারা প্রকৃতি ও নিজেদেরও পরিবর্তন ঘটায়।

বিষয়গত পৃথিবীর পদার্থসমূহ ও ব্যাপারসমূহ শুধু মিথষ্ক্রিয়াই করে না, একে অপরকে পারস্পরিকভাবে নির্ধারিত করে। বস্তু ও ব্যাপারসমূহের

---

* Frederick Engels, *Dialectics of Nature*, p. 70.

এই পরস্পর-শর্তাবদ্ধতা (পরস্পরনির্ভরশীলতা) এটাই বোঝায় যে বিকাশের ধারায় সেগুলি পরস্পরকে নির্ধারিত করে ও পরস্পরের উপরে নির্ভর করে।

প্রকৃতি, সমাজজীবন ও মানবচৈতন্যে সর্বত্র পরস্পরনির্ভরশীলতা দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আধুনিক পদার্থবিদ্যা ইলেকট্রনের ভর ও তার গতির দ্রুতির পরস্পরনির্ভরশীলতা প্রতিপন্ন করেছে। সমাজজীবনে, বৈষয়িক সামাজিক সম্পর্কগুলি ব্যক্তিমানুষদের মনে প্রতিফলিত হয়ে তাদের ভাবাদর্শ নির্ধারণ করে, সেটা আবার তার দিক দিয়ে এক সক্রিয় প্রত্যাগতিমূলক প্রভাব বিস্তার করে। মানবচৈতন্যে সংবেদন ও প্রত্যয়গুলির মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ পরস্পরনির্ভরশীলতা আছে।

বিশ্বজনীন সংযোগ ও মিথষ্ক্রিয়ার নীতি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ, তা পৃথিবীর বস্তুগত ঐক্য সম্বন্ধে, আত্ম-গতি হিসেবে বস্তুর গতি সম্বন্ধে এক গভীরতর উপলব্ধি যোগায়।

বিশ্বজনীন সংযোগ ও মিথষ্ক্রিয়ার রূপগুলিও সীমাহীনভাবে বিচিত্র। সংযোগের রূপগুলির চরিত্র ও বৈচিত্র্য নির্ধারিত হয় বিষয়গত জগতের ঐক্য ও অখন্ডতা দিয়ে এবং তার বস্তুনিচয় ও ব্যাপারসমূহের বৈচিত্র্য দিয়ে। বস্তুজগতের প্রতিটি পৃথক পদার্থ বা ব্যাপারের অসংখ্য বহুবিধ দিক ও গুণ-ধর্ম আছে, এবং ফলত অন্যান্য পদার্থ ও ব্যাপারের সঙ্গে ও সামগ্রিকভাবে বাকি পৃথিবীর সঙ্গেও অসংখ্য পরস্পরসম্পর্ক আছে। সেই সঙ্গে, সেগুলি

রয়েছে নিয়ত গতি, পরিবর্তন ও বিকাশের অবস্থায়। বিকাশ চলাকালে পরস্পরের সঙ্গে ও বাকি পৃথিবীর সঙ্গে সেগুলির পরস্পরসম্পর্ক পরিবর্তিত হতে থাকে, যার ফলে বাস্তবের বিশ্বজনীন সংযোগের রূপগুলি অত্যন্ত চলমান, তথা জটিল ও বহুবিচিত্র।

ডায়ালেকটিকসের সমস্ত মূল প্রত্যয় ও নিয়মই বাস্তবের বিভিন্ন সংযোগ ও সম্পর্ককে কোনো না কোনোভাবে প্রকাশ করে। সেগুলির প্রণালীতন্ত্রের ভিতরেই বিশ্বজনীন সংযোগের সবচেয়ে সাধারণ ও বিমূর্ত প্রত্যয়কে মূর্ত-নির্দিষ্ট করা হয়। সেই সংযোগের বহুবিধ রূপগুলি বিচ্ছিন্ন হয়, বরং সেগুলি এক অখণ্ড-সংবদ্ধ প্রণালীতন্ত্র গঠন করে।

মিথষ্ক্রিয়ার রূপগুলিও সমান বিচিত্র। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল যান্ত্রিক, পদার্থগত, রাসায়নিক, জীববিদ্যাগত ও সামাজিক রূপ। এই রূপগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে অসংখ্য মিথষ্ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত, এবং প্রত্যেকটি অন্যান্য রূপের সঙ্গে জটিল ও বহুবিধ মিথষ্ক্রিয়ায় প্রবেশ করে যুগপৎভাবে।

বিশ্বজনীন সংযোগ ও মিথষ্ক্রিয়ার প্রত্যয়টি মানুষের অবধারণা ও ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের অবধারণার গোটা ইতিহাসটাই হল বিশ্বজনীন সংযোগ ও মিথষ্ক্রিয়ার সীমাহীনভাবে বিচিত্র রূপগুলির রহস্যভেদের ইতিহাস, সেগুলির প্রায়োগিক ব্যবহারের ইতিহাস।

খ) বিকাশের নীতি

ডায়ালেকটিকসের দ্বিতীয় মূল নীতি হল বিকাশের নীতি। এর মানে এই যে পৃথিবীকে দেখা হয় না 'তৈরি **বস্তুনিচয়ের** এক সমাহার হিসেবে, বরং [দেখা হয়] **প্রক্রিয়াসমূহের** এক সমাহার হিসেবে, যেখানে আপাতভাবে স্থিতিশীল বস্তুনিচয়... অস্তিত্বশীল হওয়া ও বিলীন হওয়ার এক ছেদহীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, যেখানে, সমস্ত আপাত আপতিকতা ও সমস্ত সাময়িক প্রতীপগতি সত্ত্বেও, শেষে এক প্রগতিশীল বিকাশ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে...'*

পৃথিবীতে চলমান পরিবর্তনগুলির চরিত্র ও গতিমুখ ভিন্ন ভিন্ন। এগুলির কোনো কোনোটি হল পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে পদার্থসমূহের গতি, অন্যগুলি হল একটি বস্তুর গুণ-ধর্ম, গঠনকাঠামো ও ক্রিয়ায় পরিবর্তন। কোনো কোনো পরিবর্তন বিপরীতগামী করা যায় (জল-বরফ-জল), অন্যগুলি বিপরীতগামী করা যায় না (ভ্রূণ-জীবাঙ্গ)। কোনো কোনো প্রক্রিয়া বোঝায় নিম্নতর থেকে উচ্চতরতে এবং সরল থেকে জটিলে উত্তরণ, অন্যগুলি বোঝায় উচ্চতর থেকে নিম্নতরতে, এবং জটিল থেকে সরলে উত্তরণ। 'বিকাশ', 'প্রগতি' ও 'প্রতীপগতির' প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন বোঝানোর জন্য।

---

* Karl Marx, Frederick Engels, *Selected Works in three Volumes*, Vol. 3, pp. 362-363.

বিকাশ হল এক ধরনের গতি, একটি বস্তু বা প্রক্রিয়ার আন্তর গঠনকাঠামোয় পরিবর্তন যার সঙ্গে জড়িত। আমরা যখন বলি যে একটা প্রণালীতন্ত্র বিকশিত হয়, তখন আমরা তার গঠনকাঠামোর এক আভ্যন্তরিক, গুণগত রূপান্তরকে বোঝাই। গঠনকাঠামোগত রূপান্তরগুলিকে বিপরীতগামী করা যায় না এবং সেগুলির এক সুস্পষ্ট গতিমুখ থাকে।

এক উচ্চতর ধরনের সংগঠনের দিকে আরোহী বিকাশ প্রগতি বলে পরিচিত, এবং বিপরীত দিকে পরিবর্তনগুলি প্রতীপগতি বলে পরিচিত। বিকাশ হল প্রগতি ও প্রতীপগতির এক জটিল দ্বান্দ্বিক মিথষ্ক্রিয়া। এঙ্গেলস লিখেছেন: ‘মহাবিশ্বের, তার বিবর্তনের, মানবজাতির বিকাশের, এবং মানুষের মনে এই বিবর্তনের প্রতিফলনের যথাযথ পরিচয়... একমাত্র পাওয়া যেতে পারে জীবন ও মৃত্যুর, প্রগতিশীল বা প্রতীপগতিশীল পরিবর্তনের অসংখ্য ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার প্রতি তার নিয়ত অভিনিবেশ সহ ডায়ালেকটিকসের পদ্ধতিসমূহের দ্বারা।’*

ফলত, সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর গতিকে একটি দিকে বিকাশ বলে — হয় আরোহী (প্রগতিশীল) না হয় অবরোহী (প্রতীপগতিশীল) — বর্ণনা করা যায় না। শুধু আলাদা এক-একটি ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার ব্যাপারেই একটি নির্দিষ্ট দিকে পরিবর্তনের কথা বলা যায়। প্রগতি ও প্রতীপগতির মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্ক

---

* Frederick Engels, *Anti-Dühring,* p. 33.

বস্তুজগতের এক ক্ষেত্র থেকে আরেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। অজৈব প্রকৃতিতে 'নিরপেক্ষ' প্রক্রিয়াগুলির প্রাধান্য থাকে (প্রগতিশীল ও প্রতীপগতিশীল উভয়প্রকার পরিবর্তনই তাতে জড়িত)। চেতন, জৈব প্রকৃতিতে প্রধান প্রবণতাটি প্রগতিশীল: প্রাণীদের আরও জটিল এক আভ্যন্তরিক সংগঠন, গঠনকাঠামো ও ক্রিয়ার দিকে। কিন্তু এখানেও, প্রগতি প্রতীপগতির উপাদানগুলির সঙ্গে মিলিত থাকে।

সমাজ বিকশিত হয় প্রগতির পথে, যদিও প্রগতি সোজাসুজি নয়। বিপরীতগামী হওয়া, আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার বহু ঘটনা ইতিহাসে দেখা গেছে। তা হলেও, তার সাধারণ গতিমুখটি আরোহী ও প্রগতিশীল। '...পর পর সমস্ত ঐতিহাসিক ব্যবস্থাই নিম্নতর থেকে উচ্চতরতে মানবসমাজের বিকাশের অন্তহীন গতিধারায় ক্ষণস্থায়ী পর্যায় মাত্র।'* ঐতিহাসিক প্রগতির যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের দিকে সকল জাতি এগিয়ে চলেছে, তা হল কমিউনিস্ট সমাজ।

গতি ও বিকাশ যে বিশ্বজনীন এই ঘটনাটি বিতর্কাতীত হলেও, বিশ্ব প্রক্রিয়া বোঝার দুটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে, বিকাশের দুটি ধারণা আছে: অধিবিদ্যাগত ও দ্বান্দ্বিক।

বিকাশের দ্বান্দ্বিক ধারণাটি হল সমৃদ্ধতম। তা জবাব দেয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বুনিয়াদি প্রশ্নগুলির: গতি ও

---

* Karl Marx, Frederick Engels, *Selected Works in three Volumes*, Vol. 3, p. 339.

বিকাশের উৎস, সেগুলির চরিত্র, ব্যবস্থাপ্রণালী, রূপ ও গতিমুখ সম্বন্ধে।

অধিবিদ্যাগত ধারণা গতি ও বিকাশের উৎসকে ভুলভাবে বোঝে, বিকাশকে দেখে যা ইতিমধ্যেই আছে তার এক সরল বৃদ্ধি বা হ্রাস হিসেবে, স্থিতিশীলতার উপাদানটিকে পরম করে তোলে, গতি ও বিকাশের পরস্পরবিরোধী চরিত্র বুঝতে অপারগ হয়, ইত্যাদি।

লেনিন দ্বান্দ্বিক ও অধিবিদ্যাগত ধারণার মধ্যেকার বৈপরীত্য দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: 'বিকাশের (বিবর্তনের) দুটি মূল... ধারণা হল: হ্রাস ও বৃদ্ধি হিসেবে, পুনরাবৃত্তি হিসেবে বিকাশ, **এবং** বিপরীতের ঐক্য হিসেবে (একটি ঐক্যের পারস্পরিকভাবে বর্জনকর বিপরীতসমূহে ও সেগুলির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় বিভাজন) বিকাশ।

'গতি সম্বন্ধে প্রথম ধারণাটিতে, **আত্ম**-গতি, তার **চালিকা** শক্তি, তার উৎস, তার প্রেষণা, ছায়াচ্ছন্ন থাকে (কিংবা এই উৎসকে করা হয় **বাহ্যিক** — ঈশ্বর, বিষয়ী, ইত্যাদি)। দ্বিতীয় ধারণাটিতে আসল মনোযোগ চালিত করা হয় **'আত্ম'**-গতির **উৎস** সম্বন্ধে জ্ঞানের দিকেই।

'প্রথম ধারণাটি নিষ্প্রাণ, বিবর্ণ ও শুষ্ক। দ্বিতীয়টি জীবন্ত।'*

আজকের দিনের বুর্জোয়া দর্শন বিকাশের যে অধিবিদ্যাগত ধারণা প্রচার করে তার একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীগত উদ্দেশ্য আছে; তার প্রয়াস হল

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 38, p. 358.

ডায়ালেকটিকসের বৈপ্লবিক অন্তর্বস্তুকে নির্বীর্য করা, বিকাশকে এমনভাবে উপস্থিত করা যাতে সমাজপ্রগতির ধারণাটা বর্জন অথবা বিকৃত করা যায়, এটা দেখানো যে শোষণমূলক সমাজ চিরন্তন, শ্রেণী সংগ্রামে কোনো কাজ হবে না, এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে মানবজাতির অবশ্যম্ভাবী উত্তরণের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদ অপ্রমাণ করা।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস সারগতভাবেই বৈপ্লবিক। মানুষকে তা পারিপার্শ্বিক জগতের সমস্ত প্রক্রিয়া ও ব্যাপারকে গতি ও বিকাশের মধ্যে দেখতে শিক্ষা দেয়। প্রকৃতি ও সমাজে চলমান প্রকৃত প্রক্রিয়াগুলির প্রগাঢ়তম ও বিস্তৃততম রূপ উপস্থাপনে তা হল সেগুলির বৈজ্ঞানিক অবধারণা ও বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার।

৩। বাস্তবের অবধারণা ও রূপান্তরের বিশ্বজনীন পদ্ধতি হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস

মার্কস বলেছেন, যে কোনো বিজ্ঞান বা জ্ঞান শুধু অতীত অবধারণার ফলই নয়, নতুন নতুন সত্য আবিষ্কারের এবং বাস্তবের এক পূর্ণতর ও গভীরতর প্রতিফলন লাভের একটি হাতিয়ারও বটে। এর মানে এই যে, যে কোনো মানবিক জ্ঞান, নতুন জ্ঞান অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হলে, সেই জ্ঞান অর্জনের একটি পদ্ধতি। এই অর্থে বলা যেতে পারে যে, যে কোনো সাধারণ বা

বিশেষ তত্ত্ব অবধারণা ও ক্রিয়ার এক তদনুরূপ সাধারণ বা বিশেষ পদ্ধতিও বটে। এর বিপরীতটাও সমানভাবে সত্য: যে কোনো পদ্ধতির একটি তত্ত্বগত দিক আছে এবং তা তত্ত্বগত গুরুত্বসম্পন্ন।

বিজ্ঞান হিসেবে ডায়ালেকটিকস একটি তত্ত্বও বটে। তা হল পৃথিবী ও মানবজ্ঞানের বিকাশের সবচেয়ে সাধারণ নিয়মগুলির এক মততন্ত্র। সুতরাং, তা হল বিষয়গত পৃথিবীতে ঘটমান পরিবর্তন ও বিকাশের প্রক্রিয়াগুলির এক মানসিক মডেল।

গতি ও বিকাশের সমস্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যা অভিন্ন তার এক বৈজ্ঞানিকভাবে সামান্যীকৃত তত্ত্বগত মডেল হিসেবে, ডায়ালেকটিকস অবধারণা ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সবচেয়ে সাধারণ, সার্বিক পদ্ধতিও বটে; তা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ও বিকাশের সবচেয়ে সাধারণ প্রবণতা, অভিন্ন যুক্তি হৃদয়ঙ্গম ও উপলব্ধি করা সম্ভব করে তোলে।

সেই জন্যই, ডায়ালেকটিকস সম্বন্ধে জ্ঞান ও তা ব্যবহার করার সামর্থ্য, অবধারণায় ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে সাফল্যের নিশ্চিতি। মূর্ত-নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলির সঙ্গে ডায়ালেকটিকসের বিচক্ষণতাপূর্ণ মিলন চিন্তনের অধিবিদ্যাগত যে কোনো বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। ডায়ালেকটিকস থেকে যে কোনো বিচ্যুতির ফলে তত্ত্বে ও কর্মপ্রয়োগে ভুল হতে বাধ্য।

দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী পদ্ধতির সঠিক ব্যবহারের জন্য এক প্রস্ত দাবি মেনে চলা দরকার।

এই দাবিগুলি সূত্রায়িত করতে গিয়ে, লেনিন বলেছিলেন, 'বিবেচনার বিষয়মুখতা (দৃষ্টান্ত নয়, বিপথগমন নয়, বরং স্বরূপী সত্তা)।' তিনি লিখেছেন: 'প্রথমত, একটি বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যদি সত্যকার জ্ঞান পেতে হয়, তা হলে তার সমস্ত দিক, তার সংযোগগুলি ও 'মধ্যস্থতাগুলি' আমাদের অবশ্যই দেখতে ও পরীক্ষা করতে হবে। সেটা এমন একটা কিছু যা আমরা সম্পূর্ণরূপে অর্জন করার আশা কখনও করতে পারি না, কিন্তু সর্বাত্মকতার নিয়মটা ভুল ও অনমনীয়তার বিরুদ্ধে একটা রক্ষাকবচ। দ্বিতীয়ত, দ্বান্দ্বিক যুক্তি দাবি করে যে একটি বস্তুকে নিতে হবে বিকাশে, পরিবর্তনে ও 'আত্ম-গতিতে' (হেগেল যেমন কখনও কখনও বলেছিলেন)... তৃতীয়ত, একটি বস্তুর একটি সম্পূর্ণ 'সংজ্ঞার্থের' মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতা, সত্যের মানদণ্ড হিসেবে তথা মানুষের চাহিদার সঙ্গে তার সংযোগের ব্যবহারিক সূচক হিসেবে। চতুর্থত, দ্বান্দ্বিক যুক্তি এই মত পোষণ করে যে 'সত্য সর্বদাই মূর্ত, কখনোই বিমূর্ত নয়'...'*

ফলত, প্রধান দাবিগুলি হল:

প্রথম, সামাজিক প্রক্রিয়া ও ব্যাপারসমূহ সম্বন্ধে এক বিষয়মুখ দৃষ্টিভঙ্গি, যার মানে এই যে সেগুলিকে অধ্যয়ন করতে হবে সেগুলি বাস্তবিকই যেমন, সেইভাবে,

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 38, p. 220; Vol. 32, 1973, p. 94.

কোনো সংযোজন, সরলীকরণ বা জটিলীকরণ ছাড়া। বৈজ্ঞানিক বিষয়মুখতার নিহিতার্থ হল প্রক্রিয়া ও ব্যাপারটির সারমর্ম, তার প্রকৃত চরিত্র অধ্যয়ন করার আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা। তত্ত্বগত জ্ঞান সঠিক, যদি তা বাস্তব প্রক্রিয়া ও ব্যাপারের বিষয়গত বিকাশের এক সঠিক প্রতিফলন হয়।

বিষয়মুখতার অর্থ হল প্রক্রিয়া ও ব্যাপারটির সারমর্মের এক সত্য ব্যাখ্যা দেওয়া, জীবনের এক বাস্তবসম্মত চিত্র উপস্থিত করা, তার বিকাশের প্রধান প্রবণতা প্রকাশ করা, এবং সেই বিকাশের পিছনকার শক্তিগুলি দেখানো। অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত, বিষয়মুখ ও সত্যনিষ্ঠ বলে, বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের প্রতিজ্ঞাগুলি সত্য, কারণ সেগুলি বিষয়গত বাস্তবের সঙ্গে, খোদ জীবনের সঙ্গে মেলে। লোককে সমাজবিকাশের নিয়মগুলি সম্বন্ধে, ও সমাজকে রূপান্তরিত করার উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়ে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক বন্ধন-মোচনের জন্য, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য সংগ্রামের একমাত্র সত্যকার পথ নির্দেশ করে। তার যথার্থতা ও বিষয়মুখতা চালিত হয় বিষয়ীমুখতার যে কোনো বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে, এবং পক্ষভুক্তির অস্বীকৃতি হিসেবে বুর্জোয়া 'বিষয়মুখতার' বিরুদ্ধে ও স্বতঃস্ফূর্ত সমাজবিকাশের অনুকূলে যুক্তি হিসেবে 'বিষয়মুখতার' সংশোধনবাদী উপলব্ধির বিরুদ্ধেও। 'সামাজিক ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে অভিমত অবশ্যই

প্রতিষ্ঠিত হতে হবে বাস্তবের এক অকাট্য বিষয়মুখ বিশ্লেষণের উপরে ও বিকাশের **বাস্তব ধারার** উপরে'*— লেনিনের এই চিন্তা এই ব্যাপারে অসাধারণ পদ্ধতিতত্ত্বগত গুরুত্বসম্পন্ন।

দ্বিতীয়, বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস বাস্তবের প্রক্রিয়া ও ব্যাপারসমূহের এক সর্বাত্মক বিশ্লেষণ দাবি করে। অবধারণায় সর্বাত্মকতার প্রয়োজন উদ্ভূত হয় ডায়ালেকটিকসের প্রধান নীতি থেকে: বিশ্বজনীন সংযোগ। তা পূর্বানুমান করে অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে পদার্থটির বহুবিধ সংযোগ ও সম্পর্কের সামগ্রিকতা অধ্যয়ন। এই সমস্ত সংযোগ ও সম্পর্কের এক সর্বাত্মক বিশ্লেষণই শুধু তার মূল ও সারগত সংযোগ, গুণ-ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে আলাদা করে দেখা সম্ভব করে তোলে। একটি পদার্থের সারমর্ম বোঝার উপায় হল একটা সর্বাত্মক পরীক্ষার ভিত্তিতে যেটা তার মূল ও সারগত সেটা প্রকাশ করা। সর্বাত্মকতা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হিসেবে জাহির করা যে কোনো মেকি তত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতেও সাহায্য করে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে আজকের দিনের সংশোধনবাদ ও মতান্ধতা তাদের তত্ত্বে ও কর্মপ্রয়োগে বাস্তবের প্রক্রিয়া ও ব্যাপারসমূহের এক সর্বাত্মক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে আর স্রেফ অস্বীকার করে না। সেগুলির দৃষ্টিভঙ্গি সীমিত এই কারণে নয় যে সেগুলি বিষয়মুখতা ও সর্বাত্মকতাকে

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 2, 1977, p. 53.

অস্বীকার করে, বরং এই কারণে যে সেগুলি বিষয়মুখতা ও সর্বাত্মকতাকে একটা দ্বান্দ্বিকতাবিরোধী রূপ দেয়। বরংচ, আজকের দিনের সংশোধনবাদীরা ও মতান্ধরা সমাজজীবন সম্বন্ধে তাঁদের 'সর্বাত্মক' দৃষ্টিভঙ্গি জাহির করে বেড়ান, তাকে প্রতিটি অনুপুঙ্খে বিশ্লেষণ করার দাবি করেন। কিন্তু সর্বাত্মকতার নীতিটিকে তাঁরা অত্যন্ত বেশি 'সর্বাত্মক'ভাবে ব্যাখ্যা ও ব্যবহার করেন বলে, তার অন্তঃসারটাকেই তাঁরা বিকৃত করেন। পরীক্ষাধীন প্রক্রিয়া বা ব্যাপারটির সমস্ত অনুপুঙ্খ, দিক ও বৈশিষ্ট্যকে বেষ্টন করার চেষ্টা করে তাঁরা উপেক্ষা করেন তার অন্তঃসারকে, তার পক্ষে যেটা আত্যন্তিক গুরুত্বপূর্ণ, সেটাকেই। এরূপ 'সর্বাত্মকতার' ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা দেয় অজ্ঞাবাদ এবং বিবেচনাধীন প্রক্রিয়া বা ব্যাপারটির উৎস নির্দিষ্ট করার অক্ষমতা, তার রূপগুলি ও প্রধান প্রবণতা প্রকাশ করার অক্ষমতা। কার্যক্ষেত্রে, বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সাধারণ সমানুবর্তিতা-গুলি, শ্রেণী সংগ্রামের নিয়মগুলি, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের জন্য প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি উপেক্ষা করা হয়।

তৃতীয়, বিকাশের আন্তর উৎসগুলি নির্ধারণ করেই, যে বিরোধগুলি তাকে সংঘটিত করেছে সেগুলি উদ্ঘাটন করেই একটি প্রক্রিয়া বা ব্যাপারের সারমর্মে গিয়ে পৌঁছনো যায়। বিকাশের মধ্যে প্রক্রিয়াসমূহ ও ব্যাপারসমূহের পুনরুৎপাদন চিন্তনে সেগুলির যথোপযুক্ত প্রতিফলনের, সেগুলির অবধারণার এক অপরিহার্য শর্ত।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির বৈপ্লবিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে সমাজবিকাশের আভ্যন্তরিক উৎসগুলি আবিষ্কার অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ, তা সমাজবিকাশের প্রধান প্রধান প্রবণতা ও সম্ভাব্য রূপগুলি নির্ধারণ করা সম্ভব করে তোলে, এবং তাই সমাজের প্রগতিশীল শক্তিগুলির ও শ্রমজীবী জনসাধারণের বৈপ্লবিক-রূপান্তরসাধক ক্রিয়াকলাপ পুনর্বিন্যস্ত করাও সম্ভব করে তোলে।

চতুর্থ, সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ ও ব্যাপারসমূহ বিশ্লেষণ করার সময়ে এক সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত। 'মার্কসবাদের সমগ্র মর্মভাব, তার সমগ্র মততন্ত্র দাবি করে যে প্রতিটি প্রতিজ্ঞা বিবেচনা করতে হবে (α) শুধু ঐতিহাসিকভাবে, (β) শুধু অন্যগুলির সঙ্গে সংযুক্তভাবে, (γ) শুধু ইতিহাসের মূর্ত-নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্তভাবে।'*

মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল প্রক্রিয়াটি যে জায়গায় ও যে সময়ে ঘটছে তা গণ্য করার প্রয়োজনীয়তা, 'অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক সংযোগ না-ভোলার, নির্দিষ্ট ব্যাপারটি ইতিহাসে কীভাবে দেখা দিয়েছিল ও তার বিকাশে প্রধান প্রধান স্তর কী ছিল সেই দৃষ্টিকোণ থেকে, এবং তার বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করার, আজ তা

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 35, 1976, p. 250.

কী হয়েছে সেটা পরীক্ষা করার'* প্রয়োজনীয়তা।

এক মূর্ত-নির্দিষ্ট ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির দাবি তত্ত্বগত প্রতিজ্ঞাগুলিকে ব্যবহার করার স্থানগত ও কালগত গণ্ডিগুলি দেখাতে সাহায্য করে। তত্ত্ব হল বাস্তব প্রক্রিয়াসমূহ ও ব্যাপারসমূহের এক সামান্যীকৃত মানসিক প্রতিফলন। দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক কর্মপ্রয়োগ নতুন নতুন প্রশ্ন তোলে, যেগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দরকার হয়। লেনিন যেমন বলেছেন, পরিবর্তনশীল অবস্থাকে উপেক্ষা করা, সেকেলে প্রতিজ্ঞাগুলিকে আঁকড়ে থাকা এবং সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থা গণ্য না করে সেগুলি ব্যবহার করার অর্থ হল 'শিক্ষাকে আক্ষরিকভাবে মেনে চলা, কিন্তু তার মর্মভাবের প্রতি সনিষ্ঠ না হওয়া'।**

মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অবধারণা আর বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়োগের পক্ষে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মূর্ত-নির্দিষ্ট ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ না করে, সেগুলির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি যথাযথভাবে গণ্য না করে সাধারণ সিদ্ধান্তগুলির যান্ত্রিক প্রয়োগ রোধ করতে তা সাহায্য করে, এবং পরীক্ষাধীন ব্যাপারটির সুনির্দিষ্ট চরিত্রের অজুহাতে সাধারণ নিয়ম ও নীতিগুলি উপেক্ষা করার প্রবণতাকে রোধ করতেও সাহায্য করে।

পঞ্চম, ব্যবহারিক দাবিগুলি। অবধারণার একটি

---

* ঐ, খণ্ড ২৯, পৃঃ ৪৭৩।

** V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 6, 1977, p. 456.

শর্ত হিসেবে, এই দাবিগুলির কাম্য হল জনসাধারণের বৈপ্লবিক-রূপান্তরসাধক, গঠনমূলক কাজকর্ম অধ্যয়ন, এক বিষয়মুখ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পারিপার্শ্বিক জগৎ ও সমাজবিকাশের নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য এক অপরিহার্য শর্ত। সামাজিক কর্মপ্রয়োগের প্রয়োজনগুলি যথাযথভাবে গণ্য না করে, একটি নির্দিষ্ট যুগে অবধারণার লক্ষ্য ও গতিমুখ নির্ধারণ করা অসম্ভব। কর্মপ্রয়োগ ছাড়া, সত্যকে কখনোই অধ্যাস থেকে আলাদা করে বোঝা যায় না। জীবনের গভীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক প্রক্রিয়াগুলির সারমর্ম নির্ণয় করার, উদ্ভূত অসুবিধা ও বিরোধগুলি যথাসময়ে আবিষ্কার ও অতিক্রম করার, জরুরি সমস্যাগুলি সূত্রবদ্ধ করা ও সেগুলি সমাধানের অনুকূলতম উপায় খুঁজে বার করার একমাত্র পথ হল সামাজিক কর্মপ্রয়োগের চাহিদাগুলি, সমাজবিকাশের কর্তব্যকর্মগুলি যথাযথভাবে গণ্য করা।

পৃথিবীর বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনের কাজটা হল অবধারণার ভিত্তি ও চালিকা শক্তি, কারণ পৃথিবীকে বদলানোর জন্য প্রথমে তাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার, তার বিষয়গত নিয়মগুলি জানা দরকার এবং সেই সমস্ত নিয়ম অনুযায়ী কাজ করা দরকার। সামাজিক কর্মপ্রয়োগের চাহিদাগুলিতে সাড়া দিয়েই, পৃথিবীর বিকাশ ও বৈপ্লবিক রূপান্তরের সারমর্ম ও নিয়মগুলি সম্বন্ধে শ্রমিক শ্রেণীর — ইতিহাসে সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণীর — জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তায় সাড়া দিয়েই

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটানো হয়েছিল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করে, তার বিকাশের নিয়মগুলি উদ্ঘাটন করে, এবং সমাজবিকাশের উৎস ও প্রবণতাগুলি দেখায়। বাস্তবের এক সঠিক প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব সমাজবিকাশের সাধারণ ধারা ও পরিপ্রেক্ষিত ছকে নেওয়া সম্ভব করে তোলে, এক সঠিক কর্মনীতি বিশদ করা ও তাকে কার্যে প্রয়োগ করা সম্ভব করে তোলে।

ষষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক অবধারণা ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে ঘটনামালায় প্রধান, মূল গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থিটি খুঁজে বার করা, নানান কর্তব্যকর্মের সমগ্র সমাহারের মধ্যে প্রধান কর্তব্যকর্মটি নির্দিষ্ট করে দেখানো আবশ্যক।

সমাজবিকাশের প্রত্যেকটি পর্যায়ে প্রধান গ্রন্থিটি, প্রধান কর্তব্যকর্মটি নিধারণ করার সামর্থ্য হল সমগ্র অবধারণামূলক ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে দক্ষতা ও সাফল্যের আবশ্যিক শর্ত। প্রধান গ্রন্থিটিই হল নিয়ামক শর্ত ও নিয়ামক সংযোগ, যা শেষ পর্যন্ত সমাজপ্রগতির চরিত্র, গতিহার ও গতিমুখ নির্ধারণ করে। জনসাধারণের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের সাফল্যের পক্ষে, শান্তি ও গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য সংগ্রামের পক্ষে সেই গ্রন্থিটি খুঁজে বার করাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেনিন লিখেছেন যে 'একজন বিপ্লবী ও সমাজতন্ত্রের অনুগামী হওয়া, কিংবা সাধারণভাবে একজন কমিউনিস্ট হওয়াটাই যথেষ্ট নয়। প্রতিটি বিশেষ মুহূর্তে শিকলটিতে বিশেষ গ্রন্থিটি খুঁজে

পেতে অবশ্যই সক্ষম হতে হবে, গোটা শিকলটিকে ধরে রাখার জন্য এবং পরবর্তী গ্রন্থিটিতে উত্তরণের জন্য দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি দিয়ে সেই গ্রন্থিটি আঁকড়ে ধরতে হবে; ঐতিহাসিক ঘটনার শিকলে গ্রন্থিগুলির ক্রমপর্যায়, সেগুলির রূপ, সেগুলি যেভাবে একত্র যুক্ত, সেগুলি যেভাবে একটি অপরটি থেকে পৃথক, তা একজন কামারের বানানো মামুলি শিকলের মতো তত সরল নয়, ও তত অর্থহীন নয়'।*

স্বভাবতই, প্রধান গ্রন্থিটি খুঁজে বার করা সহজ নয়। সমাজ এক জটিল ও বিকাশশীল ব্যবস্থা, তার অভ্যন্তরে কাজ করে অসংখ্য বিষয়গত ও বিষয়ীগত উপাদান; একমাত্র বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস ও সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি ও দাবিগুলির সৃষ্টিশীল ব্যবহারের মধ্য দিয়েই প্রধান কর্তব্যকর্মগুলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্ধারণ করা যায় এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলি সমাধানে প্রধান গ্রন্থিটি নির্ণয় করা যায়।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস সম্বন্ধে জ্ঞান মানুষকে বাস্তবের বিশ্লেষণ করার এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যোগায়, দৈনন্দিন জীবনের পৃথক পৃথক ঘটনা, তথ্য ও ব্যাপারের তলায় কী ঘটছে তার সারমর্ম নির্ণয় করতে সাহায্য করে, এবং সমাজবিকাশের বিষয়গত নিয়মগুলি অনুযায়ী কাজ করতে সাহায্য করে।

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 27, 1977, p. 274.

প্রসঙ্গ ৭।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের নিয়মগুলি

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস হল বিশ্বজনীন সংযোগ ও বিকাশের মতবাদ, এবং তার নিয়মগুলির মধ্যে তা পূর্ণতমভাবে প্রকাশ পায়।

নিয়ম হল বস্তুনিচয় ও ব্যাপারসমূহের এক বিষয়গত, বিশ্বজনীন, আবশ্যিক ও সারগত সংযোগ, যা স্থিতিশীলতা ও পুনঃসংঘটনশীলতায় চিহ্নিত। দর্শনের অধীত নিয়মগুলি বাস্তব জগতের সমস্ত বস্তু ও ব্যাপারে প্রযোজ্য হয়।

১। বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রামের নিয়ম

প্রাচীনকাল থেকে লোকে প্রকৃতি ও সমাজে পরিবর্তনগুলির কারণ নিয়ে চিন্তা করেছে, সেগুলির উৎস ও চালিকা শক্তির সন্ধান করেছে।

এ বিষয়ে চিন্তকরা নানান অনুমান করেছিলেন, হয় সত্যের কাছাকাছি এসেছিলেন

না হয় সত্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। যেমন, পৃথিবীতে ঘটমান পরিবর্তনগুলির কারণ ধর্ম আরোপ করে ঈশ্বরের উপরে, ভাববাদীরা আরোপ করেন কোনো বিশ্বজনীন ইচ্ছা ও অতিপ্রাকৃত পরম ভাবের ক্রিয়ার উপরে, আর অধিবিদ্যাবাদীরা গতি ও পরিবর্তনের উৎস সন্ধান করেন কোনো বাহ্যিক শক্তির মধ্যে, কোনো প্রারম্ভিক প্রেরণার মধ্যে, এবং তাই শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়েন ভাববাদে।

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন বিকাশের কারণ সংক্রান্ত প্রশ্নের যে বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দেয়, তা প্রকাশিত হয় বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রামের নিয়মে। সেই নিয়মটিকে লেনিন বলেছিলেন বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের অন্তঃসার, শাঁস। তা বিকাশের আন্তর কারণ প্রকাশ করে, দেখায় যে তার উৎস নিহিত রয়েছে ব্যাপার ও প্রক্রিয়াসমূহের পরস্পরবিরোধী চরিত্র, সেগুলিতে অন্তর্নিহিত বিপরীতসমূহের মিথষ্ক্রিয়া ও সংগ্রামের মধ্যে।

এই নিয়মটি বোঝার জন্য, প্রথমে বিপরীত আর বিরোধের অর্থ পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

বিপরীত হল একটি বস্তু বা ব্যাপারের আন্তর দিকগুলি, প্রবণতা বা শক্তিগুলি, যেগুলি পরস্পরকে পূর্বানুমান করার সঙ্গে সঙ্গে একটি অপরটিকে বাতিল করে। বিপরীতসমূহের আন্তঃসংযোগ দিয়ে তৈরি হয় একটি বিরোধ।

অচেতন প্রকৃতিতে বিপরীতসমূহের একটি দৃষ্টান্ত হল চুম্বক। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিপরীত মেরুপ্রান্তের মতো পরস্পর-বর্জনকর অথচ ঘনিষ্ঠভাবে

আন্তঃসংযুক্ত দিকগুলির উপস্থিতি। উত্তর মেরুপ্রান্তকে দক্ষিণ মেরুপ্রান্ত থেকে পৃথক করার যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, তা করা যায় না। এমন কি, দুই, চার, আট বা আরও বেশি ভাগে কাটা হলেও চুম্বকটির তখনও সেই একই রকম মেরুপ্রান্ত থাকবে।

জীবন্ত সত্তাগুলির অস্তিত্ব ও বিকাশও বিপরীত দিয়ে চিহ্নিত। যেমন, উপচিতি আর অপচিতি* হল বিপরীত। কিন্তু এর যে কোনো একটি লোপ পেলে, জীবসত্তা। মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য। বংশগতি আর অভিযোজনক্ষমতার মতো গুণ-ধর্মগুলিও বিপরীত। এক দিকে, জীবসত্তা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রলক্ষণগুলি ধরে রাখার প্রবণতা দেখায়, অন্য দিকে, পরিবর্তমান অবস্থা অনুযায়ী নতুন নতুন প্রলক্ষণ বিকশিত করার প্রবণতা দেখায়।

বৈর শ্রেণীভিত্তিক সমাজগুলিতে, বিপরীত শ্রেণীসমূহ থাকে: দাস-মালিক সমাজে দাস ও দাস-মালিক; সামন্ততন্ত্রে কৃষক ও সামন্তপভু; পুঁজিবাদে প্রলেতারীয় ও বুর্জোয়া।

বিরোধী দিকগুলি অবধারণার প্রক্রিয়াকেও, চিন্তনের প্রক্রিয়াকেও চিহ্নিত করে।

---

* উপচিতি হল দেহের ভিতরে সরলতর পদার্থসমূহ থেকে জটিল পদার্থসমূহ গঠন, আর অপচিতি হল দেহের ভিতরে এই জটিল জৈব পদার্থগুলির বিযুক্তি, যার মধ্য দিয়ে শক্তি মুক্ত হয় জৈব প্রক্রিয়াসমূহে ব্যবহারের জন্য; উপচিতি ও অপচিতি হল দেহের ভিতরে পদার্থসমূহের বিপাকীয় বিনিময়।

সুতরাং, বাস্তবের সমস্ত ব্যাপার ও প্রক্রিয়ার বিপরীত দিক আছে। সব কিছুই দ্বন্দ্ব-বিরোধে পূর্ণ।

ব্যাপার ও বস্তুসমূহের অভ্যন্তরে বিপরীতগুলি কীভাবে মিথষ্ক্রিয়া করে? সেগুলির ঐক্য ও সংগ্রাম উভয়ই এই মিথষ্ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

বিপরীতের ঐক্য বলতে এই বোঝায় যে সেগুলি একটি অপরটিকে ছাড়া থাকতে পারে না এবং পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল। তাদের ঐক্যের আরেকটি প্রকাশ এই যে নির্দিষ্ট অবস্থায় সেগুলি সমভার হয়ে যায়। দুটি বিপরীত দিকের কোনোটিরই যখন প্রাধান্য থাকে না, এই রকম একটা সমভার একটি জিনিসের বিকাশে স্থিতিশীলতার একটি পর্যায় সূচিত করে। সমভারের অবস্থাটা অবশ্য শুধুই আপেক্ষিক ও সাময়িক। বিকাশ ধারায় এই সমভার বিপর্যস্ত হয়, তার ফলে শেষ পর্যন্ত একটি জিনিস বিলুপ্ত হয়ে আরেকটি জিনিস আত্মপ্রকাশ করে। দেখা দেয় বিপরীতের নতুন ঐক্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি তরুণ প্রাণীর দেহে উপচিতির প্রাধান্য থাকে; বয়স্ক প্রাণীতে উপচিতি ও অপচিতি প্রক্রিয়া সমভার হয়; এবং বয়োবৃদ্ধ প্রাণীতে প্রাধান্য ঘটে অপচিতির।

ঐক্যের মধ্যে থাকার সঙ্গে সঙ্গে, বিপরীতগুলি পরস্পরের সঙ্গে 'সংগ্রামের' মধ্যেও থাকে, অর্থাৎ তা একে অপরকে পারস্পরিকভাবে নাকচ ও বাতিল করে। বিপরীতগুলির ঐক্য যেখানে আপেক্ষিক, সেখানে তাদের সংগ্রাম গতি ও বিকাশের মতোই অনাপেক্ষিক ও স্থায়ী। বস্তুতপক্ষে, বিরোধগুলির অস্তিত্বই একটি

বিপরীতের আরেকটি বিপরীতের প্রতি প্রতিক্রিয়া ও তার ফলে পারস্পরিক পরিবর্তনকে বোঝায়।

যেমন, সমাজজীবনে উৎপাদন ও ভোগের মতো বিপরীত দিকগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপেই এর উভয়টিতেই পরিবর্তন ঘটে, এবং তার পরে সামগ্রিকভাবে সমাজে পরিবর্তন ঘটে। সমাজের চাহিদা উৎপাদনকে প্রভাবিত করে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। এই চাহিদাগুলিকে গণ্য করে উৎপাদন বিকাশ লাভ করে সেই দিকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঔপনিবেশিক পরাধীনতার কালপর্বে উৎপাদন অনেকাংশেই প্রভু দেশগুলির প্রয়োজন মেটানোর দিকে অভিমুখী ছিল, কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হলে সমগ্র সামাজিক উৎপাদনকে জাতীয় বিকাশের প্রয়োজন মেটানোর দিকে আবার অভিমুখী করা দরকার হয়। আর সমাজে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর শ্রমজীবী জনসাধারণের চাহিদা ও প্রয়োজনের দিকে উৎপাদনকে অভিমুখী করে তোলার সুস্পষ্ট কর্তব্যকর্ম উপস্থিত করে।

জনগণের চাহিদার দিকে সমগ্র সামাজিক উৎপাদনের এই রকম পুনরভিমুখীনতার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপেই পুরনো অর্থনৈতিক গঠনকাঠামো ভেঙে পড়ে এবং নতুন নতুন অর্থনৈতিক গঠনকাঠামো আত্মপ্রকাশ করে ও শক্তিশালী হয়, সেগুলি মুখ্যত সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির স্বাভাবিক মিত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সংযোগের দিকে অভিমুখী হয়।

জনগণের চাহিদা পূরণের চেষ্টায় উৎপাদন উন্নত

ও আরও বিকশিত হয়, এবং চাহিদাগুলিও পরিবর্তিত ও বিকশিত হয় তদনুযায়ী। পরিবর্তিত চাহিদাগুলি উৎপাদনের সামনে নতুন কর্তব্যকর্ম উপস্থিত করে, উৎপাদন আবার তাতে সাড়া দিয়ে পরিবর্তিত হয়, এবং এইভাবে চলতে থাকে অন্তহীনভাবে। ভাষান্তরে, বিপরীতসমূহের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তন ও এক নতুন গুণগত অবস্থায় উত্তরণ ঘটে। এটা দেখায় যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ হল বস্তু ও ব্যাপারসমূহের গতি ও বিকাশের উৎস।

তাই, বস্তু ও ব্যাপারসমূহের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয় সেই সমস্ত বিপরীতের দ্বারা যেগুলি রয়েছে ঐক্যের মধ্যে। সেই সঙ্গে, সেগুলি শুধু যে সহাবস্থান করে তাই নয়, সেগুলি রয়েছে নিয়ত বিরোধ ও পারস্পরিক সংগ্রামের দশায়। বিপরীতসমূহের সংগ্রামই হল বাস্তবের বিকাশের অন্তর্বস্তু, উৎস।

পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব-বিরোধ অসংখ্য ও বহুবিধ। লোকে দৈনন্দিন জীবনে সেগুলি দেখতে পায় এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে সেগুলিকে পরীক্ষা করে। মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন অধ্যয়ন করে সবচেয়ে সামান্য বিরোধগুলি: আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক, বৈরমূলক ও অ-বৈরমূলক, বুনিয়াদি ও অ-বুনিয়াদি।

আভ্যন্তরিক বিরোধগুলি উদ্ভূত হয় একই বস্তু বা ব্যাপারের বিপরীত দিকগুলির মধ্যে, আর বাহ্যিক দ্বন্দ্ব-বিরোধগুলি দেখা দেয় একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যাপার ও অন্যান্য বস্তু বা ব্যাপারের মধ্যে।

যে কোনো বস্তু বা ব্যাপারের বিকাশে আভ্যন্তরিক

বিরোধগুলি নিয়ামক গুরুত্বসম্পন্ন, কেননা সেগুলি তার অন্তর্বস্তুর সঙ্গে, তার সারমর্মের সঙ্গে যুক্ত, এবং তার পরিবর্তন ও বিকাশের কেন্দ্রী বিষয়। যেমন, যে কোনো বৈরমূলক সমাজের আভ্যন্তরিক বিরোধগুলি হল শোষক ও শোষিতের মধ্যে বিরোধ, যেগুলি যে কোনো বৈরমূলক সমাজের সারমর্ম ও প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে।

বাহ্যিক বিরোধগুলি বস্তু ও ব্যাপারসমূহের বিকাশকে প্রভাবান্বিত করে, আভ্যন্তরিক বিরোধগুলির মীমাংসার উপরে প্রায়শই অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। সেই জন্যই, বিভিন্ন বিকাশ প্রক্রিয়া অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সেগুলিকে গণ্য করা উচিত।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সফল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের সঙ্গে আভ্যন্তরিক বিরোধগুলির নিরসন জড়িত, সেই বিরোধগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শ্রমজীবী জনগণ আর উৎসাদিত শোষক শ্রেণীগুলির মধ্যেকার বিরোধ। বাহ্যিক বিরোধও — সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যেকার বিরোধ — সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের গতিধারাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু সেগুলির নিরসন বেশির ভাগই নির্ভর করে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির আভ্যন্তরিক বিকাশের উপরে।

সেই সঙ্গে, মনে রাখা দরকার যে বিরোধগুলির আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক বিরোধে এই বিভাজন আপেক্ষিক মাত্র, কেননা দুটি ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধ যেমন এদের প্রতিটির পক্ষে বাহ্যিক, তেমনি

সামগ্রিকভাবে মানবজাতির পক্ষে সেগুলি আভ্যন্তরিক।

একটি বস্তু বা ব্যাপারের বিকাশে যে আভ্যন্তরিক বিরোধ নিয়ামক ভূমিকা পালন করে তাকে বলা হয় বুনিয়াদি। তা সেই বস্তু বা ব্যাপারের সারমর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত, যার অন্যান্য বিরোধ ও সামগ্রিক বিকাশ বুনিয়াদি দ্বন্দ্ব-বিরোধের উপরে নির্ভর করে। যেমন, পুঁজিবাদের বুনিয়াদি বিরোধ হল উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর উপযোজনের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী রূপের মধ্যে বিরোধ। তা নির্ধারণ করে পুঁজিবাদের প্রধান প্রধান বিরোধের সব কটিকেই: প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে, সমগ্র জাতি ও মুষ্টিমেয় কিছু একচেটিয়াপতির মধ্যে, উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে, ইত্যাদি।

আমাদের যুগের বুনিয়াদি বিরোধ হল সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যেকার বিরোধ, এবং মানবজাতির বিকাশের গতিধারা নির্ভর করে তার বিবর্ধন ও নিরসনের উপরে। সমাজতন্ত্র হল সেই বিরোধের ঊর্ধ্বগ দিক, এবং এই বিরোধের নিরসন হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের অনুকূলে।

বুনিয়াদি বিরোধ বিষয়ক প্রতিজ্ঞাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে কোনো প্রক্রিয়ায় সেই বিরোধটি প্রকাশ করার অর্থ হল সেই প্রক্রিয়ার সারমর্ম প্রদর্শন করা।

সমাজজীবনে, বিরোধগুলি বৈরমূলক ও অ-বৈরমূলক হতে পারে। সামঞ্জস্যহীন স্বার্থসম্পন্ন বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভাজনের দরুনই

বিরোধগুলি বৈরমূলক হয়, এই বিভাজন উদ্ভূত হয় উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা থেকে। বৈরমূলক বিরোধগুলি যে সমাজব্যবস্থার অবস্থায় উদ্ভূত হয় সেই সমাজব্যবস্থার অবস্থায় সেগুলি নিরসন করা যায় না। সেগুলি নিরসন করা যেতে পারে একমাত্র শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে, যা পুরনো সমাজব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে এক নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এরূপ বিরোধ দাস-মালিক সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্যসূচক। তাই, পুঁজিবাদের বুনিয়াদি বিরোধ বিকাশলাভ করায় পুঁজিবাদকে তা নিয়ে যায় তার অবশ্যম্ভাবী পতনের দিকে।

অ-বৈরমূলক বিরোধগুলি দেখা দেয় তখন, যখন একটি সমাজে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অভিন্ন মৌল স্বার্থ থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুঁজিবাদে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার বিরোধ বৈরমূলক নয়। কৃষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা আছে: জমি, গবাদি পশু ও চাষের উপকরণাদি, এবং তারা সেই সম্পত্তি ধরে রাখতে ও বাড়াতে চায়। অন্য দিকে, শ্রমিকদের কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা নেই, তারা এই ধরনের সম্পত্তি পুরোপুরি বিলোপ করতেই আগ্রহী। তাই, কৃষকদের স্বার্থ আর শ্রমিকদের স্বার্থের মধ্যে কিছুটা বিরোধ থাকে। কিন্তু, প্রধান বিষয়ে, এই দুটি সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থ মিলে যায়, কেননা উভয়েই বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা শোষিত। তার ফলেই, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী

কৃষকসমাজকে নিজের দিকে টেনে আনতে সক্ষম হয়। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্ম চলার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যেকার বিরোধগুলি চিরতরে বিদূরিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য হল অ-বৈরমূলক বিরোধ। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সমস্ত শ্রেণী, সামাজিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তিমানুষের একই বুনিয়াদি অর্থনৈতিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক-নৈতিক নীতি থাকে। জনগণের এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ থাকে নতুনের সপক্ষে, এবং যা কিছু সেকেলে আর অচল সেগুলির সঙ্গে লড়াই করে এক অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে যেতে প্রয়াসী হয়। ফলে, সমাজতন্ত্রে দেখা দেয় বিরোধ প্রকাশ ও নিরসন করার নতুন নতুন ধরন ও রূপ। যেমন, বিরোধগুলির নিষ্পত্তি করা হয় সমগ্র জনগণের সংগঠিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এবং সমাজের নতুন চালিকা শক্তিগুলির — যেমন, সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্য, আইনানুগতার শক্তিবৃদ্ধি, সমাজতান্ত্রিক দেশাত্মবোধ, সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা — ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। বিরোধগুলি যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত ও মীমাংসিত হত, আগেকার সেই সমস্ত গঠনরূপের প্রতিতুলনায়, সমাজতন্ত্রে সেগুলিকে প্রকাশ করা ও মীমাংসা করা হয় জনগণের সচেতন সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে, সেই জনগণ তাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির দ্বারা পরিচালিত হয়, আর সেই পার্টির কর্মনীতির ভিত্তি হল সামাজিক নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান।

সুতরাং, বিপরীতসমূহের ঐক্য ও সংগ্রামের

নিয়মটি সমস্ত গতি ও বিকাশের সারমর্ম প্রকাশ করে এবং দেখায় যে আভ্যন্তরিক বিপরীতসমূহের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এগুলি ঘটে। এই মিথষ্ক্রিয়াই সমস্ত প্রক্রিয়া ও ব্যাপারের গতি ও বিকাশের আভ্যন্তরিক উৎস।

একটি বস্তু বা ব্যাপারের বিশ্লেষণ করার সময়ে তার বিরোধগুলিকে প্রস্থান-বিন্দু হিসেবে নেওয়া উচিত এবং সেটিকে গণ্য করা উচিত বিপরীত দিক, গুণ-ধর্ম ও প্রবণতাগুলির আন্তঃসংযোগ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে সেগুলির এক ঐক্য হিসেবে। প্রতিটি বস্তু ও ব্যাপারের মধ্যে শুধু তার ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিকটিকে, নতুন বা পুরনোকে, এমন কি উভয়কে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা নয়, বরং সেগুলির ঐক্য, সেগুলির পরস্পরসম্পর্ক ও বিরোধী মিথষ্ক্রিয়া দেখাটাই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। বস্তু ও ব্যাপারসমূহের এরূপ এক পরীক্ষাই সেগুলির সারমর্মে গিয়ে পেঁছনোর একমাত্র পথ। সেই জন্যই, ডায়ালেকটিকসের চাহিদা অনুযায়ী, সেগুলির বিকাশে ব্যাপারসমূহ বিশ্লেষণ করতে হলে, সেগুলিতে সহজাত বিপরীতসমূহের ঐক্য ও সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলিকে দেখতে হবে। 'সেগুলির 'আত্ম-গতিতে', সেগুলির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে, সেগুলির বাস্তব জীবনে, পৃথিবীর সমস্ত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানের শর্ত হল বিপরীতসমূহের ঐক্য হিসেবে সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান। বিকাশ হল বিপরীতসমূহের 'সংগ্রাম'।'*

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 38, p. 358.

পরীক্ষাধীন ব্যাপারগুলির মধ্যে বিরোধগুলি সনাক্ত করাটা শুধু এই ব্যাপারগুলির পিছনকার চালিকা শক্তি আবিষ্কার করার পক্ষেই নয়, সেগুলির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করার পক্ষেও সহায়ক হয়। তার কারণ, যে কোনো ব্যাপারের সুনির্দিষ্ট যে সমস্ত বিরোধ তার গতির প্রধান অন্তর্বস্তু ও উৎসস্বরূপ, সেগুলি তার বিকাশের প্রধান নিয়মগুলির সঙ্গে যুক্ত। তার মানে এই যে একটি ব্যাপারের সারমর্ম ও তার বিকাশের প্রধান নিয়মগুলি উদ্ঘাটন করার জন্য তার অন্তর্নিহিত বিরোধগুলি, সেগুলির প্রণালীতন্ত্র ও আন্তঃসংযোগ উদ্ঘাটন করা দরকার, এবং নির্দিষ্ট অবস্থায়, বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরে ক্রিয়াশীল বুনিয়াদি বিরোধগুলি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা দরকার। লেনিন লিখেছেন, 'যথার্থ অর্থে ডায়ালেকটিকস হল **বস্তুসমূহের অন্তঃসারের মধ্যেই** বিরোধগুলির অধ্যয়ন।'*

বস্তু ও ব্যাপারসমূহের মধ্যে অন্তর্নিহিত বিরোধগুলি কখনোই উপেক্ষা করা উচিত নয়, বরং সেগুলি উদ্ঘাটন ও অতিক্রম করা উচিত। যেমন, পুঁজিবাদের বিরোধগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান শ্রমিক শ্রেণীকে ও অন্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণকে সক্ষম করে সেগুলি নিরসন করার উপায় বুঝতে এবং সংগ্রামের রূপ ও পদ্ধতিগুলি বেছে নিতে।

যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ তার অ-বৈরমূলক বিরোধগুলি কাটিয়ে উঠে বিকাশলাভ করে, সেই

---

* ঐ, পৃঃ ২৫১-৫২।

সমাজে কোনো বিরোধ দেখা দিলে সেগুলি উপেক্ষা করা উচিত নয়। গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হল যথাসময়ে এই সমস্ত বিরোধ সনাক্ত করা এবং সেগুলির জটিলতা বৃদ্ধি রোধ করা।

বিরোধ এবং সেগুলি নিরসনের উপায় বহুবিধ বলে, কর্মপ্রয়োগে যে সমস্ত বিরোধ দেখা দেয় সেগুলির সুনির্দিষ্টতা দক্ষতার সঙ্গে সনাক্ত করা এবং নির্দিষ্ট অবস্থায় সেগুলি নিরসনের অনুকূলতম উপায় খুঁজে বার করা গুরুত্বপূর্ণ।

২। পরিমাণের গুণে রূপান্তরের নিয়ম

পরিমাণের গুণে রূপান্তরের নিয়মটির বিকাশ কীভাবে ঘটে তা দেখায়, সেই প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপ্রণালী দেখায়। বস্তু ও প্রক্রিয়াসমূহের পরিমাণগত ও গুণগত দিকের মতো বিপরীতের আন্তঃসংযোগ তা প্রকাশ করে। এই নিয়মটি বোঝার জন্য, গুণ ও পরিমাণের অর্থ প্রথমে বিশদে ব্যাখ্যা করা দরকার।

আমরা অসংখ্য বস্তু ও ব্যাপারের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এগুলি রয়েছে নিয়ত গতি ও পরিবর্তনের মধ্যে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলি সুনির্দিষ্ট একটা কিছু ধারণ করে রাখে, এমন একটা কিছু যা সেগুলির প্রত্যেকটির পক্ষে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক এবং একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করে। যেমন, চেতন প্রকৃতি অচেতন প্রকৃতি থেকে পৃথক, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতি

আছে, এবং মানুষ ও সমাজ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার। সেই সঙ্গে, সব জিনিসেরই অভিন্ন কিছু একটা আছে এবং সব জিনিসই কোনো কোনো দিক দিয়ে অনুরূপ। চেতন প্রকৃতি ও অচেতন প্রকৃতি উভয়েই বস্তুগত। উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমস্ত প্রজাতিরই আছে একই জৈব গুণ-ধর্ম। সমাজবিকাশ বিষয়গত নিয়ম-শাসিত, ইত্যাদি।

বস্তুসমূহের মধ্যে প্রভেদ ও সাদৃশ্যগুলিতে প্রকাশ করা হয় গুণের প্রত্যয়ে। গুণ হল একটি বস্তুর প্রকৃতি ও সুনির্দিষ্ট লক্ষণ প্রকাশকারী আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলির সামগ্রিকতা। গুণ বস্তুটির আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা ও নির্ধারকতা নির্দেশ করে। এই নির্ধারকতা বস্তুটির অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত। বস্তুটির গুণে কোনোরূপ পরিবর্তন স্বয়ং বস্তুটিরই একটি পরিবর্তন। যেমন, একটি জীবাঙ্গে বিপাকের ক্ষান্তি হওয়ার অর্থ সেটির মৃত্যু ও বিনাশ ,জীবাঙ্গটির অস্তিত্বেরই অবসান।

গুণগুলি বস্তুসমূহের মধ্যে থাকে এবং বস্তুসমূহের পরিবর্তনের সঙ্গে সেগুলি পরিবর্তিত হয়। একটি বস্তু সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করা ও তার সারমর্ম বোঝার জন্য, অন্যান্য বস্তু থেকে সেটিকে পৃথক করা দরকার, সেগুলির মধ্যে সাদৃশ্য ও প্রভেদগুলি নির্ণয় করা ও সেগুলির গুণ-ধর্ম শ্রেণীবদ্ধ করা দরকার। গুণ নিজেকে প্রকাশ করে গুণ-ধর্মগুলির মধ্য দিয়ে। গুণ-ধর্ম হল সেটাই, যা একটি বস্তুকে অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে অথবা সেগুলির সঙ্গে সেটির সাদৃশ্য নির্দেশ করে।

প্রতিটি বস্তুর আছে অসংখ্য গুণ-ধর্ম, এবং তার কোনো কোনোটির পরিবর্তন বা বিলুপ্তি হলেই সেই বস্তুটির পরিবর্তন ঘটে না। যেমন, রঙ পেট্রলের পক্ষে আবশ্যিক নয়, পেট্রলের রঙ বাড়তে বা কমতে পারে, কিন্তু তাতেও তা পেট্রলই থাকে। অন্য দিকে, দাহ্যতার গুণ-ধর্মটি পেট্রলের পক্ষে অপরিহার্য, এবং কোনো রাসায়নিক উপাদানের সঙ্গে তার মিথষ্ক্রিয়ায় সেই গুণ-ধর্মটি যদি খোয়া যায়, তা হলে তার গুণ তদনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। পেট্রল একবার তার গুণ হারালে আর জ্বালানি থাকে না।

পারিপার্শ্বিক জগতের সমস্ত বস্তু ও ব্যাপারের বহু গুণ আছে, তাই পরীক্ষাধীন বস্তু বা ব্যাপারটির বুনিয়াদি ও অ-বুনিয়াদি গুণগুলির মধ্যে প্রভেদ-নির্ণয় করা প্রয়োজন। যেমন, বিভিন্ন শ্রম ক্রিয়া সম্পন্ন করে একজন ব্যক্তিমানুষ একজন মেহনতি মানুষ হিসেবে তার গুণ-ধর্মগুলি প্রদর্শন করে। এই প্রেক্ষিতে, সে হতে পারে একজন অদক্ষ শ্রমিক, ফিটার, ড্রাফটসম্যান, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কার্যনির্বাহী, ইত্যাদি। অন্যান্য সম্পর্কের ব্যাপারে সেই একই ব্যক্তি পৃথক গুণ-ধর্ম দেখায়। যেমন, তার পিতামাতার কাছে সে একটি পুত্র, তার স্ত্রীর কাছে স্বামী, তার সন্তানদের কাছে পিতা। সে যদি ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক পরিপক্কতার এক উচ্চ স্তরে পৌঁছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি-ভিত্তিক পার্টিতে যোগ দেয়, তখন সে হয়ে ওঠে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য এক সক্রিয় সংগ্রামী।

কিন্তু যে সমস্ত গুণ-ধর্ম কোনো কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে ও অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে অদৃশ্য হয়ে যায়, সেগুলির পাশাপাশি এমন সব গুণ-ধর্মও আছে যেগুলি যে কোনো সময়েই উপস্থিত থাকে। এই সমস্ত গুণ-ধর্মের সামগ্রিকতা দিয়েই তৈরি হয় বুনিয়াদি গুণটি। একটি বস্তুর বুনিয়াদি গুণ সেই বস্তুটিরই আত্মপ্রকাশের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে এবং বস্তুটির কোনো পরিবর্তন ঘটলেই শুধু তারও পরিবর্তন ঘটে। একজন মানুষের বুনিয়াদি গুণ হল, দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই ধরনের সব গুণ-ধর্ম, যেমন — চৈতন্য, পরিপার্শ্বিক বাস্তবকে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে পরিবর্তন করার ও বৈষয়িক মূল্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা, এবং একমাত্র সমাজের মধ্যেই, অর্থাৎ, অন্যান্য মানুষের সঙ্গে একত্রে থাকার সম্ভাব্যতা।

গুণ ছাড়াও, বস্তু ও প্রক্রিয়াগুলির বৈশিষ্ট্য হল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ।

পরিমাণ হল একটি নির্ধারকতা, যা একটি নির্দিষ্ট গুণের পরিমাণ, বিকাশের গতিহার ও মাত্রার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে। পরিমাণ সাধারণত প্রকাশ করা হয় সংখ্যায়। বাস্তব সম্বন্ধে জ্ঞানের জন্য ব্যাপার ও প্রক্রিয়াসমূহের গুণগত বিশ্লেষণ শুধু নয়, এক পরিমাণগত বিশ্লেষণও দরকার হয়। বিজ্ঞান ও কর্মপ্রয়োগের বিকাশের স্তর যত উঁচু, ততই বেশি করে পরিমাণগত সূচকগুলির আশ্রয় নেওয়া হয় এবং বস্তুসমূহের বিশ্লেষণ করা হয় পরিমাণগত দিক দিয়ে।

বস্তুনিচয়ের পরিমাণগত ও গুণগত দিকগুলি

ঘনিষ্ঠভাবে আন্তঃসংযুক্ত। সেগুলি তাদের অচ্ছেদ্য ঐক্যে যে কোনো বস্তু বা ব্যাপারের দুটি দিকের মতো পরস্পরকে শর্তাবদ্ধ করে। একটি বস্তু বা ব্যাপারের পরিমাণগত ও গুণগত দিকগুলির ঐক্যকে বলা হয় পরিমাপ। পরিমাপের প্রত্যয়টি বোঝায় যে একমাত্র অতি নির্দিষ্ট একটা পরিমাণই একটি বিশেষ গুণের অনুসঙ্গী।

গুণের পরিবর্তন না ঘটিয়ে পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে শুধু নির্দিষ্ট কতকগুলি সীমার মধ্যে, যে সীমাগুলি একটি বস্তুর পরিমাপ। পরিমাণগত পরিবর্তনগুলি যখন এই সমস্ত সীমায় গিয়ে পেঁছয়, তখন পরিমাপ ব্যাহত হয় ও বস্তুর গুণ পরিবর্তিত হতে শুরু করে। যেমন, স্বাভাবিক জলবায়ুগত চাপে, 0° থেকে ১০০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা হল জলের তরল অবস্থার পরিমাপ। তাপমাত্রা যখন শূন্যাঙ্কের নিচে নেমে যায়, তখন জল জমে গিয়ে বরফে পরিণত হয়, চলে যায় কঠিন ঘন অবস্থায়; এবং জল যখন ১০০° সেণ্টিগ্রেডের উপরে উত্তপ্ত করা হয়, তখন তা উবে যায়, অর্থাৎ গ্যাসীয় অবস্থায় চলে যায়।

পরিমাপের দার্শনিক ধারণাটি এক অর্থে এই লোকপ্রিয় ধারণার সঙ্গে মেলে যে অমিতাচারের মধ্য দিয়ে (অর্থাৎ, পরিমাপের একটা ব্যাঘাতের মধ্য দিয়ে) সদর্থক পরিণত হয় নঞর্থকে, এবং যা উপযোগী তা ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। যেমন, জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য খাদ্যের মতো একটা আবশ্যিক জিনিস যদি মাত্রাতিরিক্ত

ব্যবহার করা হয়, তা হলে তার ফলে ঘটে বিপাকীয় গোলযোগ ও স্বাস্থ্যহানি।

পরিমাপ যখন বিঘ্নিত হয়, পুরনো গুণটি তখন আর নতুন পরিমাপের সঙ্গে মেলে না, সেগুলির মধ্যে এক বিরোধ দেখা দেয়। সেই বিরোধ জটিল হয়ে উঠতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত তার নিরসন হয় এক নতুন গুণ গঠন ও এক নতুন পরিমাপের আত্মপ্রকাশের সাহায্যে। সেটাই পরিমাণগত পরিবর্তনসমূহের গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তর বলে পরিচিত।

পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তনগুলির মধ্যে সংযোগ এক স্বাভাবিক সমানুবর্তিতা। পরিমাণের গুণে রূপান্তরের নিয়মটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেলস লিখেছেন যে, 'প্রকৃতিতে ... গুণগত পরিবর্তনসমূহ ঘটতে পারে শুধু বস্তু বা গতির পরিমাণগত সংকলন বা পরিমাণগত ব্যবকলনের দ্বারাই।'*

সেই নিয়মটি বিশ্বজনীন, বিষয়গত পৃথিবী ও মানবজ্ঞান উভয়ক্ষেত্রেই তা কাজ করে। যেমন, জীবাঙ্গগুলিতে প্রারম্ভিকভাবে অকিঞ্চিৎকর পরিমাণগত পরিবর্তনসমূহ সঞ্চিত হতে পারে এবং তার ফলে ঘটতে পারে গুণগত পরিবর্তন, নতুন নতুন জাত ও প্রজাতির আত্মপ্রকাশ। নতুন নতুন জাতের কৃষিশস্য ও পশু প্রজনে মানুষ সেই ব্যাপারটিকে ব্যবহার করতে শিখেছে। যেমন, বর্ণসংকর সৃজন ও নির্বাচনের ফলে

---

* Frederick Engels, *Dialectics of Nature,* p. 63.

বহু নতুন ধরনের আপেল, লেবু, প্রভৃতি উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

পরিমাণের গুণে রূপান্তর ঘটে সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রেও। যেমন, সহযোগিতা, অর্থাৎ একই উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বহু মেহনতি মানুষের প্রচেষ্টা একত্রীকরণ, এক নতুন সামাজিক উৎপাদিকা শক্তি সৃষ্টি করে, যা তার অঙ্গ-উপাদানগুলির একটা সরল যোগফল থেকে সারগতভাবে পৃথক। সহযোগিতার বহুবিধ রূপ আরও উৎপাদনশীল কাজের অবস্থা সৃষ্টি করে এবং উৎপাদনে ও জনগণের মৌল চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় সেগুলি সম্মিলিতভাবে সমাধান করার অবস্থাও সৃষ্টি করে।

পরিমাণের গুণে রূপান্তরের নিয়মটি অবধারণার ক্ষেত্রেও ক্রিয়া করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আত্মপ্রকাশ সমাজ সম্বন্ধে মানুষের অবধারণায় এক গুণগত নতুন পর্যায় সূচিত করেছিল, কিন্তু তার আগে ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয়েছিল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

বাস্তবের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন ব্যাপারে, গুণগত পরিবর্তনগুলি ঘটে বিভিন্নভাবে এবং সেগুলির থাকে নিজস্ব সুনির্দিষ্টতা। কিন্তু এই পরিবর্তনগুলি সর্বদাই নিয়ম-শাসিত এবং সেগুলি ঘটে পরিমাণগত পরিবর্তনসমূহের ফলে।

পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তনের নির্ভরশীলতা পারস্পরিক। প্রকৃতিতে ও সমাজে, শুধু যে পরিমাণই গুণে রূপান্তরিত হয় তাই নয়, এর উল্টোটাও ঘটে।

সেই জন্যই এঙ্গেলস পরিমাণের গুণে ও তদ্বিপরীত রূপান্তরের নিয়মের কথা বলেছেন।

গুণের পরিমাণে রূপান্তর বলতে বোঝায় যে, যে কোনো ব্যাপার একটি নতুন গুণ অর্জন করার সময়ে নতুন পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যও অর্জন করে। যেমন, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহারের ফলে উচ্চতর শ্রম উৎপাদনশীলতা ঘটে, এবং কৃষি উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক রূপগুলিতে উত্তরণ ছোট ছোট একক খামারের তুলনায় উচ্চতর উৎপাদনশীলতা ঘটায়।

পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তনের মিথস্ক্রিয়া কর্মপ্রয়োগে গণ্য করা উচিত। পরিমাণগত প্রস্তুতির ভিত্তিতেই শুধু যে কোনো বাঞ্ছিত গুণ অর্জন করা যেতে পারে, আর পুরনো পরিমাণ থেকে পৃথক এক নতুন পরিমাণে উপনীত হওয়ার পথটা সাধারণত যায় এক নতুন গুণের মধ্য দিয়ে। সামনের সারির শ্রমিকরা বেশির ভাগই উচ্চতর শ্রম উৎপাদনশীলতা অর্জন করে গুণগতভাবে নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি অথবা শ্রম সংগঠনের নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে, তাদের দক্ষতার মান বাড়িয়ে, ইত্যাদি।

পরিমাণগত পরিবর্তনগুলি সাধারণত ক্রমান্বিত, মসৃণ এবং প্রায়শই বড় একটা নজরে পড়ে না। পক্ষান্তরে, গুণগত রূপান্তরগুলি সর্বদাই অনেক বেশি দ্রুত, আরও দৃঢ় ও আবশ্যিকভাবেই লাফ ধরনের। লাফ হল একটি গুণগত পরিবর্তনের রূপ, একটি ব্যাপার বা তার কোনো দিকের এক গুণ থেকে আরেক গুণে উত্তরণ। পূর্ববর্তী পরিমাণগত পরিবর্তনগুলির

তুলনায়, লাফগুলি অনেক কম সময় নেয়, কিন্তু সেই সময়েই বস্তু বা ব্যাপারটির গভীর রূপান্তর ঘটে যায়।

পরিমাণের গুণে রূপান্তরের নিয়মটি সার্বিক হলেও, তা বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট অবস্থায় বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। লাফগুলি প্রকৃতিতে, স্থায়িত্বকালে ও গুরুত্বে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সেগুলি তীব্র হতে পারে, যখন পুরনো গুণ থেকে নতুন গুণে উত্তরণ তৎক্ষণাৎই ঘটে, এবং সেগুলি ক্রমান্বিত হতে পারে, যখন সেই উত্তরণের থাকে একাধিক মধ্যবর্তী পর্যায় বা উত্তরণকালীন রূপ, যেগুলি ঘটে ধাপে ধাপে। যেমন, সামাজিক জীবনে সমাজবিপ্লবের সময়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন সাধারণত দ্রুত হয়, পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক ও ভাবাদর্শগত রূপান্তরগুলি অল্পবিস্তর ক্রমান্বিত, সেগুলি যায় একাধিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে।

ক্রমান্বিত পরিমাণগত পরিবর্তন ও ক্রমান্বিত গুণগত পরিবর্তনের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করা দরকার। প্রথম ক্ষেত্রে, একটি বস্তুর গুণ পরিবর্তিত হয় না, তা একটা নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত একই থাকে, কেননা পরিমাণগত পরিবর্তনগুলি বুনিয়াদি, গুণগত পরিবর্তনের পথই প্রশস্ত করে শুধু। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, বস্তুটির গুণেরই এক প্রস্ত ক্রমান্বিত পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে গঠিত হয় পুরনো গুণটি থেকে পৃথক একটি নতুন গুণ।

তাই, যে কোনো বিকাশেরই থাকে দুটি দিক — পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন — এবং সেটাই গঠন করে সেগুলির অবিচ্ছেদ্য ঐক্য। বিকাশ শুধুই গুণগত

বা পরিমাণগত পরিবর্তন হতে পারে না, তা উভয়েরই এক মিথষ্ক্রিয়া। সমাজজীবনে বিবর্তন একটি বিপ্লবকে প্রস্তুত ও কার্যকর করে, বিপ্লব আবার বিবর্তনকে সম্পূর্ণ করে।

পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তনের মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্কের মূল্যায়ন করা এবং পরিমাণের গুণে উত্তরণ সনাক্ত করা ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অন্যথায় পুরনো থেকে নতুনে যাওয়ার সঠিক পথগুলি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের রূপগুলি সংক্রান্ত প্রশ্নটি আমাদের কালে অতি গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটতে পারে শুধু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই। একটা বিশাল গুণগত লাফ ছাড়া, বিপ্লব ছাড়া, এরূপ উত্তরণ অসম্ভব। কিন্তু প্রতিটি আলাদা আলাদা দেশে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কোন সুনির্দিষ্ট পথ ধরে হবে, তা নির্ভর করে তার সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের মানের উপরে, শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্রদের শক্তি ও সংগঠনের উপরে, এক সুপরীক্ষিত বিপ্লবী অগ্রবাহিনীর অস্তিত্বের উপরে, জনগণের আচারপ্রথা ও ঐতিহ্যের উপরে, বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তি ও বৈপ্লবিক রূপান্তরগুলি বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ এবং অন্য অনেক আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক বিষয়ের উপরে।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের বাস্তব অভিজ্ঞতা দেখায় যে বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সদৃশ রূপ ধারণ

করতে পারে না। ভবিষ্যতে, এই রূপগুলি বহুবিচিত্র হতে বাধ্য।

উপসংহার টেনে বলা যাক যে পরিমাণের গুণে রূপান্তরের নিয়মটি দেখায়, কীভাবে বিকাশ চলাকালে একটি গুণগত অবস্থা থেকে আরেকটি গুণগত অবস্থায় উত্তরণ ঘটে। ভাষান্তরে, এই নিয়মটি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিকে চিহ্নিত করে, প্রকাশ করে নতুনের উদ্ভবের অন্যতম প্রধান একটি দিককে।

৩। নিরাকরণের নিরাকরণ সংক্রান্ত নিয়ম

নিরাকরণের নিরাকরণ সংক্রান্ত নিয়মটি বিকাশের ধারাবাহিক পর্যায়গুলির মধ্যেকার, পুরনো ও নতুনের মধ্যেকার সংযোগকে দেখায়। বিকাশের সাধারণ প্রবণতা ও গতিমুখকে তা প্রকাশ করে। এই নিয়মটি বোঝার জন্য, প্রথমে বোঝা দরকার দ্বান্দ্বিক নিরাকরণের অর্থ এবং বিকাশে তার স্থান।

নিরাকরণে, পুরনো প্রতিস্থাপিত হয় নতুনের দ্বারা, অর্থাৎ, বিকাশের একটি পর্যায় আরেকটি পর্যায়কে স্থান ছেড়ে দেয়। পুরনো থেকে নতুনে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি, একটি পর্যায় আরেকটি পর্যায়ের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি দর্শনে দ্বান্দ্বিক নিরাকরণ বলে পরিচিত।

নিরাকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ-ধর্ম ও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

প্রথমত, নিরাকরণ সার্বিক। প্রকৃতিতে ও সমাজে যে কোনো বিকাশেই তা সহজাত, এরূপ বিকাশের এক অপরিহার্য দিক। সচেতন প্রকৃতিতে, সমস্ত জৈব প্রজাতিই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিরাকৃত হয় নতুন নতুন প্রজাতির দ্বারা, যেগুলি আত্মপ্রকাশ করে পুরনো প্রজাতিগুলির ভিত্তিতে এবং আরও বেশি প্রাণবন্ত হয়। ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়া হল নতুন ও উচ্চতর সমাজগুলির দ্বারা পুরনো সমাজগুলির প্রতিস্থাপন: আদিম-সম্প্রদায়গত সমাজের প্রতিস্থাপন দাস-মালিক সমাজের দ্বারা, দাস-মালিক সমাজের প্রতিস্থাপন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দ্বারা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিস্থাপন পুঁজিবাদী সমাজের দ্বারা, এবং পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিস্থাপন সমাজতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা। অবধারণা বিকাশের ক্ষেত্রে, কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রতিজ্ঞা অন্যান্য এমন সব প্রতিজ্ঞাকে স্থান ছেড়ে দেয়, যেগুলি বাস্তবের সংযোগগুলিকে আরও যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে।

বিপরীতসমূহের ঐক্য ও সংগ্রামে নিরাকরণ সহজাত। একটি বিরোধের বিপরীত দিকগুলির একটি ভিন্ন তাৎপর্য থাকে এবং একটি বস্তু বা ব্যাপারের বিকাশে সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। এগুলির মধ্যে একটি বস্তু বা ব্যাপারটিকে পরিবর্তন করার দিকে চালিত এবং ফলত, সেটি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে। অন্যটি প্রকাশ করে বস্তু বা ব্যাপারটির স্থিতিশীলতা, এবং তাই রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করে। নিরাকরণ হল সেই আভ্যন্তরিক বিরোধটির

নিরসন — সেটির পুরনো, রক্ষণশীল দিকটি পরাস্ত হয়ে নতুন, প্রগতিশীল দিকটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাই, বিকাশ হল একটি প্রক্রিয়া, যার মধ্যে পুরনো নিয়তই নিরাকৃত ও নতুনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। সেটা ছাড়া কোনো বিকাশই থাকে না। মার্কস লিখেছেন: 'যে কোনো বিকাশকে, তার সারবস্তু যাই হোক না কেন, উপস্থিত করা যেতে পারে বিকাশের এক প্রস্ত ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় হিসেবে, যেগুলি এমনভাবে সংযুক্ত যে একটি অপরটির **নিরাকরণ** গঠন করে... অস্তিত্বের আগেকার ধরনের নিরাকরণ না করে কোনো ক্ষেত্রেই একটি বিকাশের মধ্য দিয়ে যাওয়া যায় না।'*

নিরাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, যে কোনো বিকাশশীল প্রক্রিয়াতেই তা সহজাত এবং কখনোই বহিঃস্থ বা বাইরে থেকে প্রবর্তিত নয়।

আরেকটি গুণের দ্বারা একটি গুণের পরিবর্তন ও প্রতিস্থাপনের বিভিন্ন রূপ থাকে। যেমন, শস্যের দানা একটি পাখি খেয়ে ফেলতে পারে অথবা একটা মিল্-এ পেষা হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, নিরাকরণটা হয়ে দাঁড়ায় বাহ্যিক শক্তির দ্বারা শস্যদানাটির বিনাশ, যার ফলে তার অধিকতর বিকাশে ইতি ঘটে। এখানে নিরাকরণ যান্ত্রিক। দ্বান্দ্বিক নিরাকরণের কথা বলতে গেলে, বিকাশকে স্তব্ধ করা তো দূরের কথা, তা হল অধিকতর বিকাশেরই এক শর্ত। শস্যের সেই দানাটির কথাই ধরা

---

* Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 6, 1976, p. 317.

যাক। সেটি যদি যথোপযুক্ত উত্তাপ ও আর্দ্রতাযুক্ত যোগ্য জমিতে পড়ে, তা হলে তা থেকে অঙ্কুরোদ্গম হবে। সেটির স্থলে যে উদ্ভিদটি দেখা দেয় তা হল শস্যের দানাটির এক নিরাকরণ। কিন্তু এই নিরাকরণ বিকাশের এক আবশ্যকীয় দিক এবং তা প্রক্রিয়াটির চরিত্রের দ্বারা নির্ধারিত।

দ্বান্দ্বিক নিরাকরণের আভ্যন্তরিক বিষয়গুলি একটা নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তার প্রস্তুতি ও গতিধারার উপরে বাহ্যিক অবস্থাগুলিও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যেমন, অ-পর্যাপ্ত উত্তাপ ও আর্দ্রতা শস্যের দানাটির বিকাশকে এবং চারাগাছটির দ্বারা তার নিরাকরণকে বিলম্বিত, এমন কি রোধও করতে পারে।

ডায়ালেকটিকস নিরাকরণকে দেখে বিকাশের একটি উপাদান হিসেবে, নতুনের যুগপৎ প্রতিষ্ঠা সহ পুরনোর দূরীভবন হিসেবে। নতুন শর্তাবদ্ধ ও প্রস্তুত হয় পুরনোর দ্বারা, উদ্ভূত হয় তার অন্ত্রের মধ্যে এবং জাত হয় তার দ্বারা। তাই দ্বান্দ্বিক নিরাকরণ পুরনোকে শুধু দূরই করে না, নতুনকে প্রতিষ্ঠাও করে।

পুরনো নতুনের দ্বারা কখনোই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না। দ্বান্দ্বিক নিরাকরণ পুরনোর সদর্থক উপাদানগুলিকে বজায় রাখে, এবং অতীত বিকাশের কৃতিত্বগুলি নতুনের দ্বারা আত্তীকৃত হয়। যা অচল-সেকেলে তার নিরাকরণ দরকার হয় যা সুস্থ ও প্রগতিশীল তাকে ধারণ করে রাখার জন্য এবং তার অধিকতর বিকাশের অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য। যেমন,

পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক ধ্বংস করার সময়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে বজায় রাখে, এবং সামাজিক অতিসৌধ পরিবর্তিত করার সময়ে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে যা কিছু মূল্যবান সেগুলিকে বজায় রাখে।

নিরাকরণের প্রক্রিয়া একেবারে বিশুদ্ধরূপে উদ্ঘাটিত হয় না। পুরনোর সমস্ত সদর্থক উপাদান যে নতুনের মধ্যে সংরক্ষিত হয়, শুধু তাই নয়, তার কিছু কিছু নেতিবাচক জেরও শেষোক্তটিতে স্থানান্তরিত হতে পারে। যেমন, অর্থনীতিতে ও জনগণের একাংশের মনে ঔপনিবেশিক অতীতের জেরগুলি বিপ্লবের পরও কিছুকাল টিকে থাকে। শেষ পর্যন্ত, অতীতের এই উপাদানগুলি ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হয়।

বিকাশের আগেকার পর্যায়গুলিতে যে সমস্ত প্রগতিশীল উপাদান আত্মপ্রকাশ করেছিল সেগুলিকে বজায় রাখার অর্থ হল ধারাবাহিকতা, নতুন ও পুরনোর মধ্যে সংযোগ। অচল-সেকেলের দূরীকরণ ছাড়া, প্রগতিশীল বিকাশ অসম্ভব, ঠিক যেমন অসম্ভব ধারাবাহিকতা ছাড়া। মানবজাতির ইতিহাস দেখায় যে তার বিকাশকালে মানবিক শ্রম ও চিন্তার কৃতিত্বগুলি সংরক্ষিত ও সঞ্চিত হয়, যার ফলে বিকাশের প্রতিটি নতুন পর্যায় আগেকার পর্যায়গুলির চেয়ে সমৃদ্ধতর ও আরও বেশি অর্থপূর্ণ হয়। প্রতিটি নতুন প্রজন্মকে যদি শূন্যাবস্থা থেকে শুরু করতে হত, তা হলে সমাজপ্রগতি অসম্ভব হত।

দ্বান্দ্বিক নিরাকরণে অচল-সেকেলের দূরীকরণ ও

পুরনোর সদর্থক বৈশিষ্ট্যগুলি ধারণ করে রাখা, উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। সেই জন্য, যাঁরা বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা, বিশেষত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার বিরোধিতা করেন, সেই সব বুর্জোয়া ভাবাদর্শবিদ, সংশোধনবাদী ও সংস্কারবাদী তত্ত্বগতভাবে ভ্রান্ত ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। নতুন উদ্ভূত হয় পুরনোর অন্ত্রের মধ্যে, এই ঘটনাটির প্রসঙ্গোল্লেখ করতে গিয়ে তাঁরা এই কথাটা ভুলে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেন যে নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ কায়েম করার জন্য পুরনো, পুঁজিবাদী সমাজের নিশ্চিহ্নকরণ দরকার।

ধারাবাহিকতাহীন নিরাকরণ হিসেবে বিপ্লব সম্বন্ধে নৈরাজ্যবাদী অভিমতও সমান ভ্রান্তিপূর্ণ ও অধিবিদ্যাগত। যে সমস্ত তাত্ত্বিক অতীত সংস্কৃতিকে পুরোপুরি বর্জন করতে চাইতেন, লেনিন তাঁদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রলেতারীয় সংস্কৃতি যদিও বুর্জোয়া সংস্কৃতি সমেত অতীতের সমস্ত সংস্কৃতি থেকে গুণগতভাবে পৃথক, এবং শেষোক্তের এক নিরাকরণ, তা হলেও তা শিকড়হীন নয়, মানবজাতির অতীত বিকাশের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বগুলিকে তা আত্তীকৃত করে। মার্কসবাদকে তিনি অতীতের ভাবগত সম্পদ সম্বন্ধে সঠিক মনোভাবের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। অতীতের দর্শন, অর্থশাস্ত্র ও ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের এক প্রবল নিরাকরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদ সেগুলির সমস্ত সত্যকার বৈজ্ঞানিক উপাদানকে ধারণ করে রেখেছে।

বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানোর সময়ে মার্কস ও এঙ্গেলস নির্ভর করেছিলেন মানবজাতির সঞ্চিত জ্ঞানের এক দৃঢ় বনিয়াদের উপরে।

নতুন যে কোনো জিনিস আজই হোক বা পরেই হোক পুরনো হয়ে যায় এবং, পুরনো সব কিছুর মতোই, শেষ পর্যন্ত তা আবার নতুন একটা কিছুকে স্থান ছেড়ে দেয়, অর্থাৎ, এককালে যা নিজেই একটা নিরাকরণ ছিল তারই এক নিরাকরণ ঘটে। ভাষান্তরে, বিকাশের নিয়মটি হল নিরাকরণের নিরাকরণ, নতুনের দ্বারা পুরনোর প্রতিস্থাপন এবং পরবর্তীকালে আরও নতুন একটা কিছুর দ্বারা শেষোক্তের প্রতিস্থাপন।

যেহেতু নিরাকরণ সেকেলেকে শুধু দূরই করে না, তার সদর্থক দিককে ধারণও করে, তাই বিকাশ প্রগতিশীল।

প্রগতিশীল ,আরোহী বিকাশ সরল রেখা অনুসরণ করে না। তার কারণ, বিকাশ মোটের উপরে এক আরোহী প্রক্রিয়া, সেই বিকাশ চলাকালে বদ্ধাবস্থা কিংবা এমন কি সাময়িক পশ্চাদপসরণের কালপর্বও থাকতে পারে। সমাজবিকাশে, এই ধরনের বিপত্তিগুলি ঘটে সাধারণত পুরনোর প্রতিরোধ আর সাময়িক জয়ের দরুন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিপ্লবগুলি প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পরাস্ত হতে পারে, ইত্যাদি। কিন্তু এই ধরনের পশ্চাদপসরণগুলি সর্বদাই আংশিক ও সাময়িক, এবং বিকাশ মোটের উপরে প্রগতিশীল। যেমন, যা পুরনো তা বিকাশকে মন্থর করতে পারে, কিন্তু কখনোই তাকে থামাতে বা তার স্বকীয় চরিত্রকে বদলাতে পারে না।

মানবজাতির ইতিহাস থেকেই তা স্পষ্ট, সেই ইতিহাস সামাজিক জীবনের নিম্নতর ও আদিম রূপগুলি থেকে উচ্চতর রূপগুলিতে আরোহণ করে চলেছে।

বিকাশ একটা সরল রেখা অনুসরণ করে না এই কারণেও যে পুরনো, প্রারম্ভিক পর্যায়ের কিছু কিছু গুণ-ধর্মের শেষ পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই ধরনের পুনরাবৃত্তি অতীতে সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন বোঝায় না, এক উচ্চতর স্তরে, এক নতুন ভিত্তির উপরে তার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের শুধু এক পুনরুৎপাদন বোঝায়।

লেনিন লিখেছেন, নিরাকরণের নিরাকরণ হল এক 'বিকাশ যা, যেন বা, সেই পর্যায়গুলিরই পুনরাবৃত্তি ঘটায় যেগুলি ইতিমধ্যেই চলে গেছে, কিন্তু সেগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটায় এক ভিন্নভাবে, এক উচ্চতর ভিত্তিতে'।* দৃষ্টান্তস্বরূপ, সমাজজীবনে শ্রেণীহীন আদিম-সম্প্রদায়গত ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা। পরে, উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের ফলে সামাজিক মালিকানার নিরাকরণ ঘটেছিল এবং ব্যক্তিগত মালিকানা দিয়ে তা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, তার পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল দাসপ্রথায়, সামন্ততন্ত্রে ও পুঁজিবাদে। কিন্তু উৎপাদিকা শক্তিগুলির অধিকতর বিকাশের ফলে অপরিহার্যভাবেই আসে কমিউনিস্ট সমাজ, যেখানে উৎপাদনের উপায়ের

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 21, 1980, p. 54.

উপরে সামাজিক মালিকানা আরেকবার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলত, প্রারম্ভিক পর্যায়ের গুণ-ধর্মগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটে এক উচ্চতর স্তরে।

সুতরাং, বিকাশ একটা সোজাসুজি গতিও নয়, আবার পুরনোর সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি সহ এক চক্রবৎ গতিও নয়, বরং প্রগতিশীল গতি ও আপেক্ষিক পুনঃসংঘটনের এক দ্বান্দ্বিক ঐক্য — সেই গতি ও পুনঃসংঘটন এক ধরনের সর্পিল আকারে ঊর্ধ্বগামী। এই ধরনের বিকাশ ঘটে বাস্তবের সমস্ত ক্ষেত্রে: প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তনে।

নিরাকরণের নিরাকরণ সংক্রান্ত নিয়মটি সার্বিক নিয়ম। কিন্তু ডায়ালেকটিকসের অন্যান্য নিয়মের মতোই, বিভিন্ন প্রক্রিয়া, বস্তুর বৈশিষ্ট্য এবং সেগুলির বিকাশের অবস্থা সাপেক্ষে, তা সর্বদাই ক্রিয়া করে সুনির্দিষ্টভাবে। এঙ্গেলস লিখেছেন যে, 'নিরাকরণের ধরন নির্ধারিত হয়, প্রথমত, প্রক্রিয়াটির সাধারণ ও দ্বিতীয়ত, বিশেষ চরিত্র দ্বারা... সুতরাং প্রত্যেক ধরনের জিনিসেরই এমনভাবে নিরাকৃত হওয়ার এক অদ্ভুত উপায় আছে, যে তা এক বিকাশের উদ্ভবের ঘটায়, এবং প্রত্যেক ধরনের প্রত্যয় বা ভাবের বেলাতেও ঠিক সেই রকমই' ।*

সমাজতন্ত্রে, নিরাকরণের নিরাকরণ সংক্রান্ত নিয়মটির কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে, সেগুলি উদ্ভূত হয় উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা-

---

* Frederick Engels, *Anti-Dühring*, p. 169.

ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নতুন চরিত্র থেকে, জনগণের সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্য, এবং সমাজবিকাশের বিষয়গত নিয়মগুলি সম্বন্ধে উন্নততর জ্ঞান থেকে। সেই জন্যই এখানে নিরাকরণ বৈরমূলক সমাজগুলিতে নিরাকরণ থেকে সারগতভাবে ও বিশিষ্টভাবে পৃথক।

প্রথমত, সমাজতন্ত্রে নিরাকরণ সামাজিক-রাজনৈতিক বিপ্লবগুলির রূপ ধারণ করতে পারে না, সেই বিপ্লবগুলি সমাজজীবনকে বুনিয়াদিভাবে পুনর্গঠন করে। তার কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিরোধগুলি বৈরমূলক নয় এবং সেগুলি নিরসনের জন্য সমাজজীবনের বুনিয়াদি পুনর্গঠন প্রয়োজন হয় না। এখানে যার নিরাকরণ হয় তা সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদ নয়, বরং সামাজিক কাঠামোর কিছু কিছু সেকেলে হয়ে যাওয়া উপাদান, বিকাশের কিছু কিছু সেকেলে ব্যাপার ও অতীত পর্যায়।

সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদগুলি যখন স্থাপিত হয়, বৈরমূলক শ্রেণীগুলি যখন নিশ্চিহ্ন হয় এবং প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি বিলুপ্ত হয়, তখন নিরাকরণ অ-বৈরমূলক বিরোধগুলি নিরসন করে। এই ধরনের নিরসন আর শ্রেণী সংগ্রামের রূপ নেয় না, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বে জনগণের সংগঠিত প্রচেষ্টার রূপ নেয়। এখানেও, পুরনো নতুনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, কিন্তু সমাজতন্ত্রে জনগণের বৃহদংশ থাকে নতুনের পক্ষে।

সমাজতন্ত্রে নিরাকরণগুলি সংসাধিত হয় এক সুষম

ও সচেতন উপায়ে। সেগ্নলি তখনও বিষয়গত, কেননা সেগ্নলি বিষয়গতভাবেই উদ্ভূত ও পরিপক্ক হয়, কিন্তু অতীতের মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংসাধিত হয় না, হয় সমাজবিকাশের নিয়মগ্নলির ভিত্তিতে সচেতন মানবিক সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে।

সমাজতন্ত্রে বিরাট পরিসরের নিরাকরণগ্নলি ঘটে ক্রমে ক্রমে, এক প্রস্ত মধ্যবর্তী পর্যায়ের মধ্য দিয়ে, এবং সেগ্নলি এক ক্ষ্নদ্রতর পরিসরের নিরাকরণ দিয়ে তৈরি। সমাজতন্ত্র নির্মাণ থেকে উন্নততর সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হল এই ধরনের বিরাট পরিসরের ও ক্রমান্বিত নিরাকরণ। গোটা সমাজকে বেষ্টন করে, তা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক প্রস্ত ক্ষ্নদ্রতর পরিসরের নিরাকরণকে অন্তর্ভুক্ত করে।

একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের অবস্থায় বিকাশের সামগ্রিক চরিত্রও কিছ্ন কিছ্ন স্ননির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। এক নতুন ধরনের সমাজপ্রগতি ঘটে, তা অ-বৈরম্নলক ও স্নষম, সেখানে বিষয়গত অর্থনৈতিক নিয়মগ্নলির সচেতন ব্যবহার হয় এবং জনগণের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ফলাফল সম্পর্কে প্নর্বাভাসগ্নলির ব্যবহার হয়। সমাজতন্ত্রে প্রগতি দ্রুত, অখণ্ডিত ও অফুরন্ত। এই সমাজ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বেশি করে তার নিজের ভিত্তিতেই ত্র্নটিহীন হবে।

স্নতরাং, নিরাকরণের নিয়মটি বিকাশের অন্নক্রমিক পর্যায়গ্নলি আর তার সাধারণ গতিম্নখের মধ্যেকার আন্তঃসংযোগকে প্রকাশ করে। তা দেখায় যে নতুন জয়ী

হতে বাধ্য, কিন্তু অচল-সেকেলের বিরূদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম ছাড়া সমাজজীবনে প্রগতি অসম্ভব।

এই নিয়মটি শেখায় যা কিছু মূল্যবান ও প্রগতির সহায়ক তা রক্ষা ও ব্যবহার করতে, অতীতের ইতিবাচক উত্তরলব্ধিকে সমালোচনাত্মক ও সৃষ্টিশীলভাবে আত্তীকৃত ও মূল্যায়ন করতে, অচল-সেকেলে রূপগুলির নিরাকরণ বিলম্বিত না-করে নতুনের জন্য দৃঢ় সংগ্রাম চালিয়ে যেতে।

সমাজের গতির প্রগতিশীল চরিত্র ও নতুনের অপরাজেয়তা শ্রমজীবী জনগণকে তাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের জয়যুক্ত পরিণতিতে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের অবশ্যম্ভাবী জয়ে আশা ও আস্থা যুগিয়ে অনুপ্রাণিত করে।

প্রসঙ্গ ৮।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের মূল প্রত্যয়গুলি

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস বিকাশমান বাস্তবের সামান্যতম ও জরুরি সংযোগগুলি প্রকাশকারী নীতি ও নিয়মসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুজগতের বিকাশের সেই সমস্ত সারগত সংযোগ ও দিককেও তা অধ্যয়ন করে, যেগুলি প্রকাশিত হয় দার্শনিক ক্যাটিগরি বা মূল প্রত্যয়গুলিতে।

মূল প্রত্যয়গুলি হল এক-একটি বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা। যেমন, ভর, শক্তি ও আধান হল পদার্থবিদ্যার মূল প্রত্যয়; উৎপাদন সম্পর্ক, পণ্য ও মূল্য হল অর্থশাস্ত্রের মূল প্রত্যয়, ইত্যাদি। দার্শনিক মূল প্রত্যয়গুলির বৈশিষ্ট্য এই যে সেগুলি হল সবচেয়ে সামান্য প্রত্যয়। সেগুলির পরস্পরসম্পর্ক ব্যাপারসমূহের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সার্বিক দ্বান্দ্বিক সমানুবর্তিতা ও

স্থিতিশীল সংযোগগুলিকে প্রকাশ করে। এই সমস্ত সংযোগ আর ডায়ালেকটিকসের প্রধান, বুনিয়াদি নিয়মগুলিতে অন্তর্গত সংযোগগুলির মধ্যে কোনো সারগত পার্থক্য নেই, ফলে সেগুলিকে কখনও কখনও ডায়ালেকটিকসের অ-বুনিয়াদি নিয়ম বলা হয়।

১। একক, সুনির্দিষ্ট ও সামান্য (সার্বিক)

বস্তু ও ব্যাপারসমূহের গুণগত নির্ধারকতা বিবেচনা করার সময়ে আমরা দেখেছিলাম যে সেগুলি একটি অপরটির থেকে পৃথক। পৃথিবীতে একেবারে সদৃশ দুটি জিনিস নেই, এমন কি পৃথিবীতে শত শতকোটি লোকের মধ্যে দুটি সদৃশ আঙুলের ছাপ নেই। একটা বস্তুর যে একক বৈশিষ্ট্যগুলি অন্য সমস্ত বস্তু থেকে তাকে পৃথক করে, সেগুলির সামগ্রিকতাই একক বলে পরিচিত। এই বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতেই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, হাজার হাজার মানুষের মধ্য থেকে একজন পরিচিত ব্যক্তিকে আলাদা করে চেনা যায়।

কিন্তু বিভিন্ন বস্তু শুধু সুনির্দিষ্ট ও বিশিষ্টই নয়, কোনো কোনো দিক দিয়ে একটি অপরটির অনুরূপও বটে। এমন কোনো বস্তু নেই যেগুলির মধ্যে কোনোই অভিন্নতা নেই। এমন কি প্রথম নজরে যখন মনে হয় যে বস্তুসমূহের মধ্যে অভিন্ন কোনো কিছু নেই, তখনও আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে কোনো কোনো আবশ্যিক গুণ-ধর্ম ও গুণের ব্যাপারে অনুরূপতা দেখা যাবে।

যেমন, সমস্ত লোকই একজন আরেকজনের থেকে বিশিষ্টভাবে পৃথক। কিন্তু তাদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য তারা সকলেই মানুষ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে কোনো মানুষই পৃথিবীতে বাস করে অন্যান্য বহু মানুষের মধ্যে এবং হাজার হাজার নানা যোগসূত্রে ও অনুরূপতায় তাদের সঙ্গে সে পরস্পরসম্পর্কিত। একজন মানুষের শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত অন্যান্য লোকের শারীরস্থান ও শারীরবৃত্তের অনুরূপ। অন্যান্য লোকের মতো সেও অনুভব করতে, চিন্তা করতে, কথা বলতে ও কাজ করতে পারে। সে এক নির্দিষ্ট বর্ণ ও জাতির লোক। সে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী বা সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তও বটে এবং সেগুলির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, ইত্যাদি।

এক প্রস্ত বস্তুর অনুরূপ, সদৃশ, পুনঃসংঘটনশীল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পায় সামান্য বা সার্বিক হিসেবে।

উপরের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে বস্তুসমূহের অভিন্ন গুণ-ধর্ম বা দিকগুলি প্রথম নজরে সর্বদা স্বপ্রকাশ নয়। সেগুলির শিকড় থাকতে পারে অভিন্ন উদ্ভবের মধ্যে, বিকাশের একই নিয়মের মধ্যে, ইত্যাদি।

সেই সঙ্গে, সামান্যতার মাত্রা ভিন্ন হতে পারে। যেমন, একটি গাছ হওয়ার গুণ-ধর্ম একটি আম বা পাম গাছ হওয়ার গুণ-ধর্মের তুলনায় বেশি সামান্য। কিন্তু, একটি উদ্ভিদ হওয়ার গুণ-ধর্মের তুলনায় তা কম সামান্য। একটি বেশি সামান্য গুণ-ধর্মের তুলনায় কম সামান্য গুণ-ধর্মটি আত্মপ্রকাশ করে সুনির্দিষ্ট হিসেবে। এই ক্ষেত্রে, গাছ একটি সুনির্দিষ্ট উদ্ভিদ।

যে সমস্ত গুণ-ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য ব্যতিক্রমহীনভাবে সমস্ত ব্যাপারে সহজাত, সেগুলিকে বলা হয় সার্বিক বা সবচেয়ে সামান্য। বস্তু ও ব্যাপারসমূহের বিকাশে সার্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি, তাদের অস্তিত্বের রূপগুলিকে ডায়ালেকটিকস অধ্যয়ন করে এবং সেগুলি প্রতিফলিত হয় তার নিয়ম ও মূল প্রত্যয়গুলির মধ্যে।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস শুরু করে এই অনুমিতি থেকে যে একক ও সার্বিক পরস্পরসংযুক্ত। লেনিন লিখেছেন: 'একক থাকে একমাত্র সেই সংযোগের মধ্যে যা সার্বিকের দিকে নিয়ে যায়। সার্বিক থাকে শুধু এককের মধ্যে ও এককের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি এককই (কোনো না কোনোভাবে) একটি সার্বিক। প্রতিটি সার্বিকই একটি একক (তার একটি খন্ড, বা একটি দিক, বা সারমর্ম)। প্রতিটি সার্বিক সমস্ত একক বস্তুকে শুধু মোটামুটিভাবে বেষ্টন করে। প্রতিটি একক সার্বিকের মধ্যে প্রবেশ করে অসম্পূর্ণভাবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।'*

যা সামান্য সে সম্বন্ধে ও এককের সঙ্গে তার আন্তঃসংযোগ সম্বন্ধে এক দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী উপলব্ধি বাস্তব সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামান্যের শিকড় রয়েছে বস্তুসমূহের সারমর্মের মধ্যে এবং তা হল সেগুলির আভ্যন্তরিক ঐক্যের এক বহিঃপ্রকাশ। সেই জন্যই, বস্তু ও ব্যাপারসমূহের সারমর্ম, ও সেগুলির বিকাশের নিয়ম বোঝার উপায়

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 38, p. 359.

হল সামান্যকে বোঝা। আর সামান্যকে বোঝা যায় একমাত্র এককের মধ্য দিয়ে। প্রথমে, একজন মানুষ তার ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়ে একক, পৃথক পৃথক ব্যাপার ও সেগুলির বহুবিধ গুণ-ধর্ম উপলব্ধি করে, তার পর তার চিন্তন এই উপলব্ধিগুলিকে বিশ্লেষণ করে, অনাবশ্যক থেকে আবশ্যককে, একক থেকে সামান্যকে পৃথক করে। তার পরে, এক প্রস্ত ব্যাপারের সামান্য ও আবশ্যক বৈশিষ্ট্যগুলি সংশ্লেষিত ও সম্মিলিত করে সে এই ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে একটা ধারণা বিশদ করে, যা এক প্রস্ত ব্যাপারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক সামান্য ও সেই সঙ্গে আবশ্যক লক্ষণগুলিকে প্রকাশ করে। মোটের উপরে অবধারণার প্রক্রিয়াটি অগ্রসর হয় একক থেকে সুনির্দিষ্টের মধ্য দিয়ে সামান্য ও সার্বিকের দিকে।

একক ও সামান্য সংক্রান্ত মূল প্রত্যয়গুলি নতুনের উদ্ভবের প্রক্রিয়া বুঝতেও সাহায্য করে। ব্যাপারটা এই যে প্রকৃতি ও সমাজে নতুন প্রায়শই সরাসরি আত্মপ্রকাশ করে না। প্রথমে তা উদ্ভূত হয় একক হিসেবে, তার পরে শক্তিশালী ও গঠিত হয়, সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত সামান্য, এমন কি সার্বিকও হয়ে ওঠে। সেইভাবেই উদ্ভূত হয় সমস্ত নতুন উদ্যোগ ও আন্দোলন, যেমন সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা। এইভাবেই বৈপ্লবিক চৈতন্য উদ্ভূত ও শক্তিশালী হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রথমে রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছিল একটি একক দেশে, এবং এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে বিরাট এক গুচ্ছ দেশে, তাদের নিয়ে গঠিত

হয়েছে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সারা পৃথিবী জুড়ে সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী জয় তাকে করে তুলবে সার্বিক।

সামান্য ও এককের মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্কের সমস্যাটির বেঠিক সমাধানের ফলে গুরুতর তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি ঘটে। যেমন, মতান্ধরা এটা বুঝতে অপারগ হয় যে সুনির্দিষ্ট ও এককের মধ্যেই সামান্যের অস্তিত্ব থাকে এবং তাই তা একটি ব্যাপারের বিকাশের অবস্থা-সাপেক্ষে, মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-সাপেক্ষে এক মূর্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মতান্ধরা যেহেতু পরিবর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতি নির্বিচারে এককের সুনির্দিষ্টতাগুলিকে উপেক্ষা করে এবং সামান্যের ব্যবহারের উপরে জোর দেয়, সেই হেতু তারা নতুন পরিস্থিতির যথাযথ বিশ্লেষণ ছাড়াই সামান্য সূত্রগুলি স্রেফ পুনরাবৃত্তি করে, এবং তাই জীবনের সঙ্গে ও জনসাধারণের সঙ্গে সংস্পর্শ হারায়।

সামান্যের ভূমিকা অস্বীকার আর সুনির্দিষ্ট ও এককের উপরে অহেতুক জোর দেওয়াও সমানভাবে গুরুতর ভ্রান্তিপূর্ণ। সেই ভুলটাই দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদের অন্যতম তত্ত্বগত উৎস। যেমন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে সমানুবর্তিতাগুলি সকল দেশের পক্ষেই অভিন্ন, সংশোধনবাদীরা সেগুলিকে অস্পষ্ট করে রাখতে চেষ্টা করে অথবা স্রেফ তার অস্তিত্বই অস্বীকার করে, এবং একক দেশগুলির সুনির্দিষ্টতার গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেখে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সামান্য সমানুবর্তিতাগুলির রূপায়ণ বাধ্যতামূলক, কেননা সেগুলি প্রকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ —

এটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ধরে নেয় এবং প্রতিটি দেশের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থা-সাপেক্ষে প্রতিটি দেশে এই সমস্ত সমানুবর্তিতার বিশিষ্ট বহিঃপ্রকাশগুলির বিশ্লেষণ ও যথোপযুক্ত মূল্যায়ন দাবি করে।

২। আধেয় ও আধার

আধেয় ও আধারের মূল প্রত্যয়গুলি একটি বস্তু বা ব্যাপারের অন্তঃসার বুঝতে সাহায্য করে।

সমস্ত বস্তু ও ব্যাপারের আছে নিজস্ব আধেয় ও নিজস্ব আধার।

আধেয় হল সেই সমস্ত উপাদান, দিক, প্রক্রিয়া ও সেগুলির সম্পর্কের সামগ্রিকতা, যেগুলি একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যাপারের অস্তিত্বের মূলস্বরূপ এবং তার আধারগুলির বিকাশ ও পরিবর্তনকে নির্ধারণ করে। আধার হল আধেয়র সংগঠন ও অস্তিত্বের ধরন, একটি নির্দিষ্ট আধেয়র উপাদান, দিক ও প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে আন্তর সুনির্দিষ্ট সংযোগ, যা বাহ্যিক অবস্থার সঙ্গে তার মিথষ্ক্রিয়ায় আধেয়টিকে কিছুটা সংবদ্ধতা পান করে।

আধেয় ও আধার হল বাস্তবের যে কোনো বস্তু বা ব্যাপারের দুটি অবিচ্ছেদ্য দিক। পৃথিবীতে আধার বা আধেয় ছাড়া কিছুই নেই। যেমন, যে কোনো জীবাঙ্গ গঠিত নানা উপাদান (কোষ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) ও প্রক্রিয়া

দিয়ে (বিপাক, পরিব্যক্তি), সেগুলি দিয়েই গঠিত হয় তার আধেয়। যে সমস্ত উপাদান ও প্রক্রিয়া সেই আধেয়টিকে বিদ্যমান থাকতে সক্ষম করে তোলে, সেগুলির সংযোগ ও সংগঠনের ধরন দিয়ে গঠিত হয় তার আধার। এঙ্গেলস লিখেছেন, 'সমগ্র জৈব প্রকৃতি আধার ও আধেয়র একাত্মতা বা অবিচ্ছেদ্যতার এক ধারাবাহিক প্রমাণ।'*

সমস্ত সামাজিক প্রক্রিয়া ও ব্যাপারেও আধেয় ও আধারের এক অঙ্গাঙ্গী ঐক্য দেখা যায়। যেমন, উৎপাদিকা শক্তিগুলি হল উৎপাদন-প্রণালীর আধেয়, আর উৎপাদন-সম্পর্ক হল তার আধার। আমাদের যুগের আধেয় হল পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ। সেই উত্তরণ রূপায়িত হয় বহুবিধ আধারে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রামে, এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও প্রতিবিপ্লব রপ্তানির বিরুদ্ধে, বিশ্ব শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সমাজের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংগ্রামে।

সাহিত্য ও শিল্পকর্মে, শৈল্পিক রূপকল্পে প্রতিফলিত জীবন হল আধেয়, এবং এই রূপকল্পগুলি সংগঠিত ও প্রকাশ করার নির্দিষ্ট ধরন হল আধার। যেমন, ভাষা, রচনাবিন্যাস, শৈলী, ইত্যাদি হল একটি সাহিত্যকর্মের আধার।

যে কোনো বস্তু ও প্রক্রিয়ার আধেয়র আছে একটি

---

* Frederick Engels, *Dialectics of Nature*, p. 305.

বাহ্যিক ও একটি আভ্যন্তরিক আধার। বস্তুসমূহের বাহ্যিক আধার হল সেগুলির ত্রৈমাত্রিক আয়তন, বাহ্যিক গঠন, রঙ, ইত্যাদি, এবং আভ্যন্তরিক আধার হল সেগুলির আধেয়র সংগঠন।

বাহ্যিক আধার আধেয়র সঙ্গে আভ্যন্তরিক আধারের মতো তত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত নয়। আধেয়তে কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই তার মধ্যে অনেক বেশি পরিবর্তন করা যেতে পারে। যেমন, মার্কসের প্রধান রচনা, ‘পুঁজি’ বিভিন্ন আয়তনের চারটি বা দশটি গ্রন্থে প্রকাশ করা যেতে পারে, বিভিন্ন গুণমানের কাগজে ছাপা হতে পারে, তার অঙ্গসজ্জা নানানভাবে করা যেতে পারে, ইত্যাদি। একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত, বাহ্যিক আধার বইটির আধেয়কে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কোনোরূপ প্রভাবিত করে না। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন বিমান-নির্মাণ বা জাহাজ-নির্মাণে, আধেয়তে সমানভাবে সারগত পরিবর্তন ছাড়া বাহ্যিক আধারে যথেচ্ছ সারগত পরিবর্তন করা যায় না। এখানে বাহ্যিক আধার এতই কৃৎকৌশলগতভাবে যথোপযুক্ত যে তা আধেয়র সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

আভ্যন্তরিক আধার আধেয়র সঙ্গে আরও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। তাতে যে কোনো পরিবর্তনই কোনো না কোনোভাবে আধেয়তে প্রতিফলিত হয়। যেমন, শৈলীতে বা রচনাবিন্যাসে পরিবর্তন একটি সাহিত্য কর্মের আধেয়, বিষয়বস্তুকে অবশ্যম্ভাবীরূপেই প্রভাবিত করে, একটা ভিন্ন ভাবাবেগগত অভিঘাত সৃষ্টি করতে তা বাধ্য। শিল্পে আধেয় ও আধারের

ঐক্য হল তার প্রাণবন্ততার একটি বড় নিয়ম ও উৎস।

আধেয় ও আধারের ঐক্য, অবিচ্ছেদ্য সংযোগ ও মিথষ্ক্রিয়া একটা সার্বিক সমানুবর্তিতা। এই ঐক্য উদ্ভূত হয় এই ঘটনা থেকে যে, প্রথমত, সেগুলি একটি অপরটিকে বাদ দিয়ে থাকতে পারে না: আধেয় সর্বদাই আধৃত থাকে একটি আধারের মধ্যে, এবং আধার পরিবেষ্টন করে রাখে একটি আধেয়কে। দ্বিতীয়ত, আধেয় থাকতে পারে একমাত্র একটি নির্দিষ্ট আধারের মধ্যে, আর যে কোনো মূর্ত-নির্দিষ্ট আধার সর্বদাই একটি সুনির্দিষ্ট আধেয়র অনুসঙ্গী হয়।

সেই সঙ্গে, আধেয় ও আধারের ঐক্য মোটেই পরিবর্তনাতীত বা চিরতরে নির্দিষ্ট নয়। তা চলিষ্ণু ও দ্বান্দ্বিকভাবে পরস্পরবিরোধী। বস্তুসমূহে আধেয় ও আধার সর্বদাই আত্মপ্রকাশ করে সেগুলির বিকাশের বিপরীত দিক বা উপাদান হিসেবে। যে কোনো বস্তু সার্বিক মিথষ্ক্রিয়ায় থাকে বলে, তার আধেয় পরিবর্তিত হয়ে চলে। বিপরীতপক্ষে, তার অস্তিত্বের আধার বস্তুটির আত্ম-সংরক্ষণ ও স্থিতিশীলতার প্রবণতা প্রকাশ করে; সংযোগ ও সম্পর্কগুলি, আধেয়র উপাদানগুলি যেভাবে সংগঠিত, সেগুলি আধেয় গঠনকারী দিক ও প্রক্রিয়াগুলির মতো তত দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে না।

আধার আত্মপ্রকাশ করে ও পরিবর্তিত হয় আধেয়র অভিঘাতে, ফলে তার পরিবর্তন আধেয়র পরিবর্তনের চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে থাকে। এ থেকেই দেখা দেয় আধেয় ও আধারের মধ্যে সংগ্রাম।

সেগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের বিকাশ ও নিরসন হল বাস্তবের বস্তুসমূহের বিকাশের অন্যতম প্রধান উৎস, সেগুলির আধারে পরিবর্তন ও সেগুলির আধেয়তে রূপান্তরের প্রধান কারণ। আধেয় ও আধারের দ্বান্দ্বিকতার এই দিকটি সম্পর্কে লেনিন এই কথা লিখেছেন: 'আধারের সঙ্গে আধেয়র সংগ্রাম ও তার বিপরীত। আধার নিক্ষিপ্ত করা, আধেয়র রূপান্তর।'*

বস্তুসমূহে পরিবর্তন সেগুলির অধেয়তে পরিবর্তন দিয়ে শুরু হয়, সেটাই শেষ পর্যন্ত সেগুলির আধারের বিকাশকে নির্ধারণ করে। সেই জন্যই, আধেয় ও আধারের দ্বান্দ্বিক ঐক্যে আধেয় এক নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু আধেয়র উপরে আধারের এই নির্ভরশীলতাকে অনাপেক্ষিক পরম করে দেখা উচিত নয়, কেননা আধারের আপেক্ষিক স্বাধীনতা থাকে।

বস্তুসমূহে বিভিন্ন দিকের আধেয় ও আধারে বিভাজনও অনাপেক্ষিক নয়: এক দিক দিয়ে যা আধেয়, আরেক দিয়ে সেটাই আধার হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে, এবং এর বিপরীত। যেমন, উৎপাদন-সম্পর্ক হল উৎপাদন-প্রণালীর আধার, আর উৎপাদিকা শক্তিগুলি তার আধেয়। একই সঙ্গে, উৎপাদন-সম্পর্ক হল সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের ভিত্তি, এবং এই দিক দিয়ে সেগুলি প্রকাশ পায় আধেয় হিসেবে।

আধার আপেক্ষিক হয় এইজন্য যে, তা শেষ পর্যন্ত আধেয়র দ্বারা নির্ধারিত হলেও, তার বিকাশের নিজস্ব

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 38, p. 222.

নিয়ম আছে। যেমন, সামাজিক চৈতন্য হল মানুষের সামাজিক সত্তার আধার, কিন্তু, সামাজিক সত্তার বিকাশের নিয়ম-শাসিত বলে, একই সঙ্গে তার থাকে নিজস্ব, সুনির্দিষ্ট বিকাশের নিয়ম: ধারাবাহিকতা, অসমতা, ঐতিহ্যের প্রভাব, ইত্যাদি। ফলে, আধার ও আধেয়র বিকাশ সমকালিক নয়, এবং তাদের মধ্যে স্বভাবতই একটা বিরোধ দেখা দেয়।

আধার ও আধেয়র পরস্পরবিরোধী মিথষ্ক্রিয়া মুখ্যত প্রকাশ পায় এইখানে যে বিকাশ চলাকালে একটি নতুন আধেয় কিছুকালের জন্য পুরনো আধার বজায় রাখতে পারে। যেমন, একাধিক দেশে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল পুরনো আধারগুলি বজায় রেখে: অর্থ সঞ্চলন, ব্যাংক, পণ্য উৎপাদন, ইত্যাদি।

আধার ও আধেয়র দ্বান্দ্বিকতা প্রকাশ পায় এইখানেও যে একই আধেয় বহুবিধ আধার গ্রহণ করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের বিভিন্ন আধার আছে: প্যারিস কমিউন, সোভিয়েত ক্ষমতা, জনগণতন্ত্র, ইত্যাদি।

আধার ও আধেয়র দ্বান্দ্বিকতার আরেকটি বহিঃপ্রকাশ এই যে সেগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবীরূপেই বেড়ে জটিল হয় এবং কোনো কোনো নির্দিষ্ট অবস্থায়, একটা সংঘাতের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়। সেই পর্যায়ে, আরও বিকাশ ঘটতে পারে একমাত্র যদি পুরনো আধারটি নতুন আধার দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়, যাতে আধেয় ও আধারের মধ্যে নতুন একটা সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত

হতে পারে। তার পরে, চক্রটি নতুন করে শুরু হয়। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা, উৎপাদন-প্রণালীর পারম্পর্য দিয়ে এই সমানুবর্তিতার উদাহরণ দেখা যায়।

আধার ও আধেয়র এক সক্রিয় প্রতিদানমূলক প্রভাব বাদ দেওয়া তো দূরের কথা, সেগুলির বিষয়গত দ্বান্দ্বিকতা এই ধরনের প্রভাব পূর্বানুমান করে নেয়। বিকাশ প্রক্রিয়াকে আধার মন্থরও করে ফেলতে পারে অথবা ত্বরিত করতে পারে এবং সেগুলির ক্ষয় ও বিলোপ ঘটাতে পারে। যেমন, পুঁজিবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা সম্পর্ক সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের বিকাশকে মন্থর করে ফেলে, পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ভুক্ত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের এক জোরদার বেগবর্ধক শক্তি।

আধার ও আধেয়র বিষয়গত দ্বান্দ্বিকতা অবধারণার পক্ষে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তা বাস্তবের বস্তু ও প্রক্রিয়াসমূহের আধার ও আধেয়র ঐক্য, সেগুলির একটির সঙ্গে আরেকটির দ্বান্দ্বিক সংযোগ, সেগুলির রূপান্তর, দ্বন্দ্ব, প্রভৃতির দিকে নজর রেখে সেগুলি অধ্যয়নের দিকে অভিমুখী করে তোলে। আধার যেহেতু অধেয়র সঙ্গে যুক্ত এবং আধেয়র এক অভিব্যক্তি, তাই অবধারণা অগ্রসর হওয়া উচিত আধারটির উপলব্ধি থেকে আধেয়টির উদ্ঘাটনের দিকে, তার পরে আবার সামগ্রিকভাবে বস্তুটির দিকে, তার পরে এক উচ্চতর স্তরে আধারটি অধ্যয়নের দিকে, ইত্যাদি। সত্যকার

বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান রূপ পরিগ্রহ করে তখনই, যখন অবধারণা আধেয়কে এবং আধেয় ও আধারের মধ্যেকার বিষয়গত দ্বান্দ্বিকতাকে উন্মোচন করতে প্রয়াস পায়। যেমন, জৈব প্রকৃতির অবধারণা শুরু হয়েছিল উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞানের সঞ্চয় দিয়ে, এবং সেগুলিকে প্রজাতি, বর্গ ও শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধকরণ দিয়ে, তার পর তা এগিয়ে গিয়েছিল তার আধেয় উদ্ঘাটন করার দিকে: ক্রমবিকাশের সুনির্দিষ্ট পার্থক্যগুলি ও সবচেয়ে সামান্য সমানুবর্তিতার উদ্ভবগত ভিত্তি স্থাপন করার দিকে।

আধার ও আধেয়র প্রশ্নটি বিবেচনা করার সময়ে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে সেগুলির দ্বান্দ্বিক মিথষ্ক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করা দরকার। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে, সর্বপ্রথমে, সমাজতন্ত্রে আধার ও আধেয়র মধ্যে দ্বন্দ্বের অ-বৈরমূলক চরিত্র, এবং ফলত, গভীর সামাজিক সংঘাত বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা। সমাজতন্ত্রে সমাজবিকাশের সচেতন চরিত্র মোটামুটি যথাসময়ে নতুন আধেয় অনুযায়ী আধারকে পুনর্নির্মিত করা সম্ভব করে তোলে।

বিকাশের ক্ষেত্রে বস্তুটির বিভিন্ন দিক ও উপাদানের ভূমিকা বিশদ করাও গুরুত্বপূর্ণ। তা অন্তঃসার ও প্রতিভাস বা বাহ্যিক রূপের মূল প্রত্যয়গুলি বুঝতে আমাদের সক্ষম করে তোলে।

৩। অন্তঃসার ও প্রতিভাস

অন্তঃসার ও প্রতিভাসের ধারণাগুলি বস্তু ও প্রক্রিয়াসমূহের আন্তঃসংযুক্ত দিকগুলিকে দ্বান্দ্বিকভাবে প্রতিফলিত করে।

সবচেয়ে বুনিয়াদি যে সমস্ত সংযোগ ও আভ্যন্তরিক নিয়ম একটি বস্তু বা ব্যাপারের অস্তিত্বের স্থির ধরন ও বিকাশের প্রবণতাগুলিকে নির্ধারণ করে, অন্তঃসার হল তার অখন্ড সমগ্রতা। তা প্রকাশ করে, প্রথমত, বস্তুনিচয় বা সেগুলির গুণ-ধর্মের বৈচিত্র্যের মধ্যে সামান্যকে, এবং দ্বিতীয়ত, একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা প্রক্রিয়ার গভীরতম ভিত্তিকে, পরিবর্তমান ব্যাপারের সবচেয়ে সুস্থিত ও স্থায়ী উপাদানগুলিকে। বস্তুনিচয়, প্রক্রিয়াসমূহ বা সেগুলির সম্পর্কের উপরিপৃষ্ঠে অন্তঃসার কখনও আত্মপ্রকাশ করে না, তা লুকনো থাকে প্রতিভাসের বা বাহ্যিক রূপের পিছনে এবং তাই ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধির পক্ষে তা অনধিগম্য। সেই জন্যই, বিমূর্ত চিন্তনের মধ্য দিয়ে অন্তঃসারকে অনুধাবন করা হয়।

প্রতিভাস হল বস্তুসমূহের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য, গুণ-ধর্ম বা বস্তুসমূহের অভ্যন্তরস্থ বা সেগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের সামগ্রিকতা, অন্তঃসার যার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ ও উদ্ঘাটন করে সেই আধার। অন্তঃসারের প্রতিতুলনায় প্রতিভাস প্রকাশ করে বস্তুসমূহের মধ্যে অনন্য, এককে, সেগুলির আপেক্ষিকভাবে বাহ্যিক ও ভাসা-ভাসা দিকটিকে, যেটি সেগুলির মধ্যে চলিষ্ণু ও

পরিবর্তনীয়, সেটিকে। মানুষের ইন্দ্রিয়ের উপরে প্রতিভাসের একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে, এবং প্রতিভাস সেই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীতে সব কিছুই হল অন্তঃসার ও প্রতিভাসের এক ঐক্য। এটা প্রকাশ পায় এইখানে যে, প্রথমত, সেগুলি হল একই বস্তুর দুটি দিক, এবং কেবল মানসিকভাবে সে দুটি পৃথক করা যায়। লেনিন সেই ঐক্যের বৈশিষ্ট্যনির্ণয় করেছেন এইভাবে: 'এখানেও আমরা দেখি একটা উত্তরণ, একটি থেকে অপরটিতে প্রবহণ: অন্তঃসার প্রতিভাত হয়। প্রতিভাসটি অন্তঃসারগত।'* দ্বিতীয়ত, সেগুলির ঐক্য প্রকাশ পায় এই ঘটনায় যে বিকাশের বাস্তব প্রক্রিয়ায় সেগুলি একটি অপরটিতে রূপান্তরিত হয়। এটা মনে রাখা দরকার কারণ বস্তুসমূহের বিভিন্ন দিককে অন্তঃসার ও প্রতিভাসে শ্রেণীবদ্ধ করাটা অনাপেক্ষিক, পরম নয়, বরং শুধু নির্দিষ্ট একটা দিক দিয়েই তার একটা অর্থ ও বিষয়গত ভিত্তি আছে। যেমন, উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা এবং সেই মালিকানার ভিত্তিতে বন্ধুভাবাপন্ন শ্রেণীগুলির সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার সামাজিক সম্পর্ক হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের অন্তঃসার। তা প্রকাশ পায় নানাভাবে: শোষণ ও সংকটের অনুপস্থিতি, সুষম অর্থনৈতিক বিকাশ, জনগণের সামাজিক-রাজনৈতিক ঐক্য, জাতিগুলির মধ্যে মৈত্রী, ইত্যাদির মধ্যে।

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 38, p. 251.

তৃতীয়ত, অন্তঃসার ও প্রতিভাসের ঐক্য প্রকাশ পায় তাদের পরিবর্তনের বিষয়গত পরস্পরনির্ভরশীলতার মধ্যে: বিকাশ চলাকালে অন্তঃসারে কোনোরূপ পরিবর্তনের ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপেই প্রতিভাসের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে এবং এর বিপরীত। যেমন, প্রাক্-একচেটিয়া থেকে একচেটিয়া পুঁজিবাদে উত্তরণ সেই সমাজের অন্তঃসারকে আংশিকভাবে পরিবর্তিত করেছিল: পুঁজিবাদ হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদী। পুঁজিবাদের পরিবর্তিত অন্তঃসার প্রতিফলিত হয়েছিল তার নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে: পুঁজিবাদী দেশগুলির জীবনে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের স্বার্থে ফিনান্স পুঁজি গঠন ও আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থাগুলি গঠন, এবং পৃথিবীর অঞ্চলগত বিভাজন সম্পূর্ণ করার মধ্যে। এখানে অন্তঃসারে পরিবর্তনগুলির ফলে প্রতিভাসে পরিবর্তন ঘটেছিল। পুঁজিবাদ সর্বত্র হয়ে উঠেছিল আরও আক্রমণমুখী ও আরও প্রতিক্রিয়াশীল, বেড়ে গিয়েছিল বেকারি, সামাজিক অসাম্য, প্রতিযোগিতা, শ্রেণীসংগ্রাম, ইত্যাদি। কিন্তু অন্তঃসার ও প্রতিভাসের ঐক্য আপেক্ষিক, এবং তার মধ্যে একটা প্রভেদ এমন কি তাদের বিরোধাভাসও নিহিত থাকে। অন্তঃসার ও প্রতিভাসের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় এইখানে যে সেগুলির সমাপতন ঘটে না: অন্তঃসার প্রতিভাসকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করে না, আর প্রতিভাস হল অন্তঃসারের এক উপান্তিক অভিব্যক্তি মাত্র।

অন্তঃসার ও প্রতিভাসের সমাপতন ঘটে না, কেননা

সেগুলি হল একটি বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন দিক, অন্তঃসার সর্বদাই গভীরে লুকনো থাকে, যার ফলে সাক্ষাৎ অনুধ্যানের মধ্য দিয়ে তা ধরা যায় না। বস্তুসমূহের অন্তঃসারের যদি তার বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে পুরোপুরি সমাপতন ঘটত, তা হলে অবধারণা এত দীর্ঘ ও জটিল একটা প্রক্রিয়া হত না এবং বিজ্ঞান অনাবশ্যক হত।

কিন্তু যেহেতু অন্তঃসার ও প্রতিভাস অন্তর্মুখভাবে সংযুক্ত এবং অন্তঃসার প্রতিভাসে অভিব্যক্ত হয়, সেই জন্য তা অনুধাবন করা যায়। অবধারণা সর্বদাই অগ্রসর হয় প্রতিভাস থেকে অন্তঃসারের দিকে, বস্তুসমূহের বাহ্যিক দিক থেকে বুনিয়াদি নিয়ম-শাসিত সংযোগগুলির দিকে।

সামাজিক ব্যাপারসমূহের অন্তঃসার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা এই বিশ্লেষণের তুলনাহীন সব দৃষ্টান্ত যুগিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে ছিল মার্কস-কর্তৃক পুঁজিবাদী শোষণের অন্তঃসার আবিষ্কার।

প্রতিভাসগুলি অধ্যয়নের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদরা সর্বদাই এই মত পোষণ করেছেন যে পুঁজিবাদী সমাজে কোনো শোষণ নেই, পুঁজিপতি তার শ্রমিকদের দেয় সেটাই যা তারা রোজগার করে। পুঁজিবাদী মুনাফার উৎস বলে মনে করা হয় উৎপাদনে পুঁজিপতির বিনিয়োজিত খোদ পুঁজিকেই, শ্রমিকদের উপরে তার শোষণকে নয়।

বাস্তবে, সব কিছু একেবারে আলাদা। বেঁচে থাকার জন্য ও নিজের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য শ্রমিকের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবনধারণের উপায় দরকার হয়। পুঁজিবাদে জীবনধারণের এই উপায় যোগাড় করার জন্য সে পুঁজিপতির কাছে তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। প্রথম নজরে, শ্রমিক ও পুঁজিপতি ক্রয় ও বিক্রয় সমন্বিত এক প্রথাগত ব্যবসায়িক কারবার সম্পন্ন করে। শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করে আর পুঁজিপতি তা ক্রয় করে; শ্রমিক মেহনত করে আর পুঁজিপতি তাকে মজুরি দেয়।

পুঁজিবাদী সম্পর্কের উপরিপৃষ্ঠে, পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে এক ন্যায়বিচারপূর্ণ লেনদেনের বাহ্যিক রূপ বা প্রতিভাসটি এই রকম। মার্কস কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের উপর-উপর প্রতিভাসগুলি বিশ্লেষণের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে এক ন্যায়বিচারপূর্ণ লেনদেনের প্রতিভাসের পিছনে, আপাতদৃশ্য চেহারার পিছনে তিনি উদ্ঘাটন করেছিলেন পুঁজিবাদী উৎপাদনের শোষণমূলক অন্তঃসার। তিনি দেখিয়েছিলেন যে শ্রমশক্তি এক বিশেষ পণ্য, যা বৈষয়িক মূল্য উৎপাদন করতে সক্ষম, এবং যে মূল্য তা উৎপাদন করে সেটা পুঁজিপতি মজুরির রূপে তার জন্য যা দেয় তার চেয়ে অনেক বেশি।

মার্কস-কর্তৃক পুঁজিবাদী শোষণের অন্তঃসার আবিষ্কার প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ছিল, তা বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার বৈরভাবের মূলে গিয়ে পৌঁছনো, এবং তাদের মধ্যে সেই

সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবিতা দেখানো সম্ভব করে তুলেছিল, যে সংগ্রামের ফলে শেষ পর্যন্ত এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও পুঁজিবাদের পতন ঘটতে বাধ্য।

ব্যাপারসমূহের অন্তঃসার অনুধাবন করা বিজ্ঞান ও বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়োগের পক্ষে যে কত গুরুত্বপূর্ণ, সামাজিক ব্যাপারসমূহের গবেষণার সেই ক্লাসিকাল দৃষ্টান্ত তার অত্যন্ত প্রত্যয়জনক প্রমাণ যোগায়।

বাস্তবের বিষয় ও ব্যাপারসমূহ বিচ্ছিন্ন নয়, সেগুলির অস্তিত্ব থাকে আন্তঃসংযোগের মধ্যে, যার প্রেক্ষিতের বাইরে সেগুলির কোনোটিকেই বোঝা অসম্ভব। অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সংযোগে একটি বস্তুকে অধ্যয়ন করার নিহিতার্থ মুখ্যত তার উদ্ভবের কারণ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা, তাই কার্য ও কারণ, এই মূল প্রত্যয়গুলি এখন বিবেচনা করা যাক।

৪। কার্য ও কারণ

পৃথিবীতে কারণহীন কোনো ঘটনা নেই: সমস্ত ঘটনাই নির্দিষ্ট কতকগুলি কারণের কার্যফল। একটি ব্যাপারের কারণ নির্ণয় করা তার অবধারণার একটি প্রধান উপাদান। কার্য-কারণ সংযোগ আবিষ্কার দিয়েই বিজ্ঞান শুরু হয়।

কার্য-কারণ সংযোগ হল সার্বিক সংযোগের একটি রূপ, যথা, সংযোগের এমন একটি রূপ যেখানে একটি ব্যাপার বা পরিস্থিতি আরেকটি ব্যাপার বা

পরিস্থিতিকে নির্ধারণ করে বা সৃষ্টি করে। কোনো ব্যাপারের যা জন্ম দেয় তাকে বলা হয় তার কারণ। কারণ একটি ব্যাপারের আবির্ভাব, তার অবস্থার পরিবর্তন ও তার বিলোপকে নির্ধারণ করে। কারণের ক্রিয়ার ফলকে বলা হয় কার্য।

কার্য-কারণ সংযোগের কতকগুলি সারগত বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, ব্যাপারসমূহের কারণগত নির্ভরতা সার্বিক। এমন কোনো ব্যাপার বা ঘটনা থাকতে পারে না, যার একটা কারণ নেই। বস্তু ও ব্যাপারসমূহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার অসীম শৃঙ্খলমালাটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি হল কারণগত সংযোগ।

কারণগত সংযোগ বিষয়গত, অর্থাৎ, খোদ বস্তুজগতের ব্যাপারগুলিতেই তা সহজাত। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে বিশেষ কোনো কোনো অবস্থায়, একটি নির্দিষ্ট কারণের ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে ও অভ্রান্তভাবে একটি নির্দিষ্ট কার্য ঘটবে। যেমন, এক খণ্ড লোহা উত্তপ্ত করার ফলে সেটি সম্প্রসারিত হতে বাধ্য, কিন্তু সেই উত্তাপ তাকে, ধরুন, সোনায় পরিণত করতে পারে না। শস্যের একটা দানা যদি উপযুক্ত জমিতে পড়ে, তা হলে যথোপযুক্ত অবস্থায় সেটি থেকে জন্মায় একটি শস্যের চারা, অন্য কোনো উদ্ভিদ কখনোই নয়।

কারণগত সংযোগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কালে তার কঠোর অনুক্রম: যে ব্যাপারটি একটি কারণ হয়ে ওঠে সেটি সর্বদাই কার্যের পূর্বগামী হয়, কার্য কখনোই সেই ব্যাপারটির আগে অথবা তার সঙ্গে যুগপৎভাবে ঘটতে পারে না, সব সময়েই ঘটে কিছুটা

পরে। কিন্তু কালে পূর্বগামিতা একটি ব্যাপারকে কারণ হিসেবে গণ্য করার একটা আবশ্যিক কিন্তু অ-পর্যাপ্ত শর্ত। একটি ব্যাপারের পূর্বগামী সব কিছুই তার কারণ হিসেবে কাজ করে না।

বিজ্ঞান যখন যথেষ্ট বিকশিত ছিল না, এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যখন অধিকাংশ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল, তখন লোকে কালে অনুক্রম থেকে কারণগত সংযোগগুলিকে আলাদা করে বুঝতে প্রায়শই অপারগ হত। সেটাই ছিল কুসংস্কার আর পূর্বাহ্নে কৃত ধারণাগুলির অন্যতম উৎস, যার জেরগুলি এখনও টিকে আছে কোনো না কোনো রূপে।

একমাত্র মানবিক কর্মপ্রয়োগই কার্য-কারণ সংযোগ সম্বন্ধে এক সঠিক জ্ঞানের নিয়ামক মানদণ্ড, তা সাহায্য করে, বিশেষত, কালে একটি সরল অনুক্রম থেকে একটি কারণগত সংযোগের পার্থক্যনির্ণয় করতে। কারণগত সংযোগ সম্বন্ধে জ্ঞানও মানবিক কর্মপ্রয়োগের পক্ষে, বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাসদানের পক্ষে, বাস্তবের প্রক্রিয়াসমূহকে প্রভাবিত করা ও সেগুলিকে মানুষের প্রয়োজন মতো দিকে চালিত করার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একটি কারণগত সম্পর্ক বিবেচনা করার সময়ে মনে রাখা দরকার যে কারণগুলি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয়বিধ হতে পারে। একটি বস্তুর পরিবর্তনের আভ্যন্তরিক কারণগুলির মূল নিহিত থাকে খোদ বস্তুটিরই প্রকৃতির মধ্যে, সেটি তার দিকগুলির এক মিথষ্ক্রিয়া। বাহ্যিক কারণগুলির চেয়ে আভ্যন্তরিক

কারণগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন, যে কোনো সমাজবিপ্লবের আভ্যন্তরিক কারণ হল দেশের এক নির্দিষ্ট উৎপাদন-প্রণালীর উৎপাদিকা শক্তিসমূহ ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ, কোনো বাহ্যিক অভিঘাত নয়।

একটি কারণ যখন বাহ্যিক হয়, তখন কার্যটি হয় সেই কারণ ও সেটি যার উপরে ক্রিয়া করে সেই ব্যাপারটার মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার ফল, যার ফলে একই কারণ বিভিন্ন কার্যের উদ্ভব ঘটাতে পারে। যেমন, সূর্যকিরণের প্রভাবে বরফ গলবে, একটি উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্মস্থ করে বেড়ে উঠবে, একজন মানুষের চামড়া রোদে-পোড়া হবে, এবং তার দেহে ঘটবে জটিল সব শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। বিভিন্ন কারণের ফলে একই কার্য ঘটে, এমনও হতে পারে। যেমন, মন্দ ফসল হতে পারে খরার দরুন, অথবা চাষ-আবাদের ত্রুটির দরুন: ফসলের বেঠিক আবর্তন, খারাপ বীজ ব্যবহার, ফসল চাষের সময় ঠিকমতো না বাছা, ইত্যাদি। তাই, বিভিন্ন বস্তুর অথবা একই বস্তুর বিভিন্ন দিকের, অথবা উভয়েরই মিথষ্ক্রিয়ার দ্বারা অর্থাৎ, আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক কারণগুলির সম্মিলনের দ্বারা একটি ব্যাপার সংঘটিত হতে পারে।

কার্য-কারণ সংযোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ এই যে কার্য ও কারণ স্থান পরিবর্তন করতে পারে। যে ঘটনাটি এক ক্ষেত্রে একটি কার্য, সেটি আরেক ক্ষেত্রে অন্য কোনো সময়ে একটি কারণ হতে পারে। যেমন, নির্দিষ্ট জলবায়ুর অবস্থার একটি কার্য হয়েও বৃষ্টি

ভালো ফসলের কারণও হতে পারে, এবং ভালো ফলন নিজে অর্থনীতিতে উন্নতির কারণ হতে পারে, ইত্যাদি।

সমস্ত ব্যাপারের, বিশেষত জটিল ব্যাপারগুলির, বহু কারণ থাকে। কিন্তু গুরুত্বে কারণগুলির পার্থক্য থাকে। কারণগুলি বুনিয়াদি (নিয়ামক) ও 'অ-বুনিয়াদি, সাধারণ ও আশু হতে পারে। এই সমস্তের ভিতর থেকে বুনিয়াদি, নিয়ামক কারণগুলি আলাদা করে বেছে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই কথাটা মনে রেখে যে বুনিয়াদি কারণগুলি সাধারণত আভ্যন্তরিক। বৈজ্ঞানিক অবধারণা ও বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়োগের পক্ষে সেগুলির প্রতিপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কার্য-কারণ সম্বন্ধের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী মতবাদ বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দেশ্যের ভাববাদী ও ধর্মীয় মতবাদের তা বিপরীত। ধর্ম দাবি করে যে পৃথিবীতে সব কিছুরই একটা উদ্দেশ্য আছে, পৃথিবী একজন 'স্রষ্টার' দ্বারা তৈরি বলে। এঙ্গেলসের কথায়, পরমকারণবাদ অনুযায়ী, 'বিড়ালগুলি সৃষ্ট হয়েছিল ইঁদুরকে খাওয়ার জন্য, ইঁদুররা সৃষ্ট হয়েছিল বিড়াল-কর্তৃক ভুক্ত হওয়ার জন্য, এবং সমগ্র প্রকৃতি সৃষ্ট হয়েছিল স্রষ্টার বিজ্ঞতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য'।*

নিজেদের অভিমত সমর্থন করার জন্য, ধর্মের ভাবাদর্শবাদীরা বিশেষভাবে সচেতন প্রকৃতির

---

* Frederick Engels, *Dialectics of Nature*, p. 25.

প্রসঙ্গোল্লেখ করেন, যেখানে জীবন্ত জীবসত্তাগুলি আর তাদের অস্তিত্বের অবস্থার মধ্যেকার সুসংগতি সত্যিই বিস্ময়কর, এবং যেখানে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গঠনকাঠামো প্রায় ত্রুটিহীন। কিন্তু জীববিদ্যা দেখিয়েছে যে জীবাঙ্গগুলির আপেক্ষিক উৎকর্ষ গড়ে উঠেছে দীর্ঘকালীন ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে, পরিবেশের সঙ্গে তাদের মিথষ্ক্রিয়া, প্রাকৃতিক নির্বাচন ও অন্যান্য জীববিদ্যাগত নিয়মের ফলে।

প্রকৃতিতে সব কিছুই চলে প্রাকৃতিক, বিষয়গত নিয়ম অনুযায়ী, বিশেষত ব্যাপারসমূহের কারণগত নির্ভরশীলতা অনুযায়ী। লক্ষ্য দেখা দেয় একমাত্র সেখানেই, যেখানে মানুষ, বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ জীব, ক্রিয়া করতে শুরু করে, অর্থাৎ, সমাজবিকাশের ধারায়। কিন্তু লোকে নিজেদের সামনে বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করলেও, সমাজবিকাশের বিষয়গত, কারণগত ও নিয়ম-শাসিত চরিত্র তাতে বাতিল হয়ে যায় না।

কার্য-কারণ সংযোগ সার্বিক। কিন্তু বাস্তবের সমস্ত বহুবিধ সংযোগ তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কেননা লেনিন যেমন দেখিয়েছেন, তা হল সার্বিক সংযোগের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। পৃথিবীতে কারণগত সংযোগগুলির জটিল জালের মধ্যে আবশ্যিক ও আকস্মিক (আপতিক) সংযোগগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির দিকে ভালোভাবে দৃষ্টিপাত করা যাক।

৫। আবশ্যিকতা ও আকস্মিকতা

আবশ্যিকতার ধারণাটি গঠিত কার্য-কারণ সম্বন্ধের অধিকতর অধ্যয়নের ভিত্তিতে, বিশেষত, কার্য-কারণ সম্বন্ধের আবশ্যিক চরিত্রের স্পষ্টীকরণের মধ্য দিয়ে। সেই জন্য আবশ্যিকতাকে কখনও কখনও কার্য-কারণ সম্বন্ধের সঙ্গে একাত্ম করা হয়। কিন্তু আবশ্যিকতা ও কার্য-কারণ সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন ধারণা, কার্য-কারণ সম্বন্ধের ধারণায় প্রতিফলিত হয় সত্তার কোনো কোনো রূপের অন্যান্য রূপের দ্বারা নির্ধারণ, পক্ষান্তরে আবশ্যিকতার ধারণায় প্রতিফলিত হয় উপযুক্ত অবস্থায় নির্দিষ্ট কতকগুলি সংযোগ ও গুণ-ধর্মের অবশ্যম্ভাবী আত্মপ্রকাশ।

গুণ-ধর্ম ও সংযোগগুলিকে আবশ্যিক বলা হয় তখন, যখন সেগুলির অস্তিত্বের কারণ সেগুলিরই মধ্যে নিহিত থাকে, এবং যখন সেগুলি নির্ধারিত হয় একটি ব্যাপার গঠনকারী উপাদানগুলির আন্তর চরিত্রের দ্বারা; আর যে সমস্ত গুণ-ধর্ম ও সংযোগের কারণগুলি তাদের বহিঃস্থ থাকে, অর্থাৎ যেগুলি বাহ্যিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেগুলি আপতিক বা আকস্মিক বলে পরিচিত। আবশ্যিক গুণ-ধর্ম ও সংযোগগুলি নির্দিষ্ট কতকগুলি অবস্থায় অবশ্যম্ভাবীরূপেই ঘটে, পক্ষান্তরে আকস্মিক গুণ-ধর্ম ও সংযোগগুলি অবশ্যম্ভাবী নয়, সেগুলি ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে।

যেমন, অনুন্নত অবস্থা দূর করাটা একটা আবশ্যিকতা, তা উদ্ভূত হয় সদ্য-স্বাধীন সমাজগুলির,

বিশেষত যারা সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীনতা বেছে নিয়েছে তাদের নিয়ম-শাসিত বিকাশ থেকে। জনগণের ক্রমবর্ধমান সামাজিক-রাজনৈতিক ঐক্য, এক বিপ্লবী অগ্রবাহিনী কর্তৃক সমাজ পরিচালনা, এবং জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান সামাজিক সক্রিয়তা দিয়ে তা নির্ধারিত হয়। কিন্তু সেই আবশ্যিকতা বাস্তবায়নের সময়ে নানান দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন, জলবায়ুর প্রতিকূল অবস্থা কোনো কোনো অঞ্চলে কৃষির উপরে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করতে পারে, পক্ষান্তরে খনিজ পদার্থের সমৃদ্ধ সঞ্চয়ভান্ডার আবিষ্কার একটি অঞ্চলের, এমন কি গোটা দেশের বিকাশের জোরালো প্রেরণা দিতে পারে।

যে দেশ বিকাশের সমাজতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছে, সেখানে ব্যাপক জনসাধারণের বর্ধিত গঠনমূলক ক্রিয়া-কলাপ ও উদ্যোগ এক নিয়ম-শাসিত আবশ্যিকতা। শ্রম-জীবী জনগণ উৎপাদন বাড়ানো ও শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য, তাদের সমাজের ও জনগণের কল্যাণে উৎপাদনের নতুন ও আরও কার্যকর সব রূপ প্রবর্তন করার জন্য নিজেদের প্রচেষ্টা তীব্র করতে বাধ্য। কিন্তু যে উদ্যোগটিতে একটি বিশেষ আন্দোলন আরব্ধ হয় এবং যে ব্যক্তি তার সূত্রপাত করে, তারা আপতিক ব্যাপার, কেননা আন্দোলনটা অন্য কেউও চালু করতে পারত।

বিষয়গত পৃথিবীতে ব্যাপারসমূহের বিকাশের অবশ্যম্ভাবী শক্তি হিসেবে আবশ্যিকতারই সর্বময় কর্তৃত্ব, তা উদ্ভূত হয় ব্যাপারসমূহের অন্তঃসার থেকে

এবং নির্ধারিত হয় সেগুলির সমগ্র পূর্ববর্তী বিকাশ ও মিথষ্ক্রিয়ার দ্বারা। আবশ্যিকতা, এই মূল প্রত্যয়টি প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিকাশের নিয়ম-শাসিত চরিত্রকে প্রকাশ করে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে আকস্মিক ঘটনাগুলির, ঠিক আবশ্যিক ঘটনাগুলির মতোই, নিজস্ব কারণ থাকে। এমন মনে করা ভুল হবে যে আকস্মিকতা আর কারণহীনতা একই জিনিস। কারণহীন কোনো ঘটনা আদৌ নেই। আবশ্যিকতার মতোই, আকস্মিকতাও বিষয়গত, এবং তার কারণগুলি আমরা জানি কি না তার উপরে তার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। আকস্মিকতার বিষয়গত চরিত্র অস্বীকার করলে সামাজিক ইতিহাস ও একক মানবিক অস্বিত্বকে একটা নিয়তিমূলক, অতীন্দ্রিয় চরিত্র দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

সেই সঙ্গে, আকস্মিকতা হল আপেক্ষিক। এমন কোনো ব্যাপার নেই যা সব দিক দিয়েই আপতিক এবং আবশ্যিকতার সঙ্গে সংযুক্ত নয়। একটি ব্যাপার আকস্মিক একমাত্র একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-শাসিত সংযোগের সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে, পক্ষান্তরে আরেকটি সংযোগে সেই একই ব্যাপারটি আবশ্যিক হতে পারে। যেমন, বৈজ্ঞানিক বিকাশের সামগ্রিক ধারার অবস্থান থেকে এটা শুধু একটা আপতিক ব্যাপার যে একজন বিশেষ বিজ্ঞানী কোনো আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু খোদ আবিষ্কারটা হল উৎপাদিকা শক্তিগুলি বিকাশের যে বিশেষ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, খোদ বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি হয়েছে তারই আবশ্যিক ফল।

আকস্মিকতা প্রায়শই ঘটে থাকে দুই বা ততোধিক সংযোগের সন্ধিস্থলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঝড়ের তাণ্ডবে পড়ে-যাওয়া একটি গাছের কথা ধরুন। গাছটির জীবনে প্রবল বায়ু একটা আকস্মিক ঘটনা, কেননা গাছটির জীবন ও বৃদ্ধির অন্তঃসার থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে তা উদ্ভূত হয় না। কিন্তু আবহাওয়াগত বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে, বায়ু একটা আবশ্যিক ব্যাপার, কেননা তা হল সুনির্দিষ্ট আবহাওয়াগত নিয়মগুলির ক্রিয়ার ফল। আকস্মিক ঘটনাটা ঘটেছিল সেই বিন্দুতে যেখানে দুটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া — একটি গাছের জীবন ও বায়ুর উদ্ভব — মিলিত হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে শুধু বায়ুই গাছটির পক্ষে আপাতিক নয়, বরং যে গাছটি ঘটনাক্রমে বায়ুর পথে রয়েছে সেটিও বায়ুর পক্ষে সমানভাবেই আপাতিক।

তাই, আকস্মিকতা হল একটি নির্দিষ্ট ব্যাপার বা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে বাহ্যিক একটা কিছু, এবং ফলত, সেই ব্যাপার বা প্রক্রিয়াটির পক্ষে তা সম্ভব কিন্তু অবশ্যম্ভাবী নয়, এবং তা ঘটতে পারে, নাও ঘটতে পারে।

আবশ্যিকতা ও আকস্মিকতা ঘনিষ্ঠভাবে আন্তঃসংযুক্ত। এই সংযোগ মুখ্যত বোঝায় যে একই ব্যাপার এক দিক দিয়ে একটা আকস্মিকতা হিসেবে এবং আরেক দিক দিয়ে একটা আবশ্যিকতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এই সংযোগের প্রসঙ্গে আরও কিছু বলার আছে। এঙ্গেলস লিখেছেন, আকস্মিকতা হল পরস্পরসম্পর্কের শুধু একটি মেরুপ্রান্ত, তার অপর মেরুপ্রান্তটিকে বলা হয় আবশ্যিকতা।

বস্তুতপক্ষে, আবশ্যিকতা সর্বদাই প্রকাশ পায় ও পথ করে নেয় স্থিতিশীল ও পুনঃসংঘটনশীল একটা কিছু হিসেবে আপতনের একটা পুঞ্জের মধ্য দিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সমাজবিকাশ হল বহুবিধ আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য ও মেজাজ-বিশিষ্ট অসংখ্য ব্যক্তিমানুষের ক্রিয়াকলাপের যোগফল। এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা-প্রয়াস পরস্পরবিজড়িত ও সংঘৃষ্ট হয়, শেষ পর্যন্ত তার ফলে ঘটে বিকাশের একটা নির্দিষ্ট ধারা, যা কঠোরভাবে আবশ্যিক।

আপতনগুলি সর্বদাই আবশ্যিকতার সহগামী হয় ও তাকে পরিপূরণ করে এবং তাই ইতিহাসে নির্দিষ্ট একটা ভূমিকা পালন করে। সেই জন্যই, সমাজবিকাশের একই নিয়ম বিভিন্ন দেশে ও কালপর্বে বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে এবং অদ্ভুতভাবে কাজ করে। মার্কস বলেছেন, আবশ্যিকতা ছাড়া আর কিছু যদি না থাকত, এবং আকস্মিকতা কোনো ভূমিকা না পালন করত, তাহলে ইতিহাসের একটা অতীন্দ্রিয় চরিত্র থাকত।

এ থেকে এই দাঁড়ায় যে আবশ্যিকতা আকস্মিকতার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হতে পারে, আকস্মিকতা আবশ্যিকতাকে শুধু যে পরিপূরণ করে তাই নয়, তার বহিঃপ্রকাশের একটি রূপও বটে, এবং আবশ্যিকতা ও আকস্মিকতার দ্বান্দ্বিকতা বোঝার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, সমাজবিপ্লবগুলি ও নিয়ম-শাসিত অন্য সামাজিক ব্যাপারগুলি বহু আপাতিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত, যেমন বিভিন্ন ঘটনার স্থান ও কাল, সেগুলির অংশগ্রাহীরা,

ইত্যাদি। এই অবস্থাগুলি ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে আপতিক, কিন্তু ঠিক এগুলির মধ্য দিয়েই আবশ্যিক প্রক্রিয়াগুলি ঘটে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে, সমাজবিকাশ যেখানে একটা সুষম প্রক্রিয়া, সেখানে অনুকূল অবস্থা গড়ে ওঠে, যার ফলে অবাঞ্ছিত আপতনগুলির অবাধ ঘটনশীলতা লক্ষণীয়ভাবে সীমিত করা সম্ভব হয়। যেমন, চাষ-আবাদের বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রণালী প্রবর্তন, জমির উন্নয়ন ও অন্যান্য ব্যবস্থা বিভিন্ন অঞ্চলে ও গোটা দেশে কৃষি উৎপাদনের উপরে জলবায়ুর খামখেয়ালের প্রতিকূল ফল-প্রভাব অনেকখানি সীমিত করে।

একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির দ্বারা পরিচালিত সচেতন ও উদ্দেশ্যপূর্ণ মানবিক ক্রিয়াকলাপ আকস্মিক ঘটনাগুলির ভূমিকাকে প্রচন্ডভাবে সীমিত করে। কিন্তু এমন কি সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের অবস্থাতেও সেগুলি ঘটতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অর্থনীতিতে, উৎপাদনের কোনো কোনো শাখা বিভিন্ন বাহ্যিক কারণে পিছিয়ে পড়তে পারে, কোনো কোনো উদ্যোগ তাদের পরিকল্পনা পূরণ করতে অপারগ হতে পারে, ইত্যাদি।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মানুষকে শিক্ষা দেয় আপতনগুলিকে উপেক্ষা না করে অধ্যয়ন করতে, এক দিকে, প্রতিকূল আপতনগুলি দূরদৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া, রোধ করা বা সীমিত করার উদ্দেশ্যে, এবং অন্য দিকে, ইতিবাচক আপতনগুলির সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে।

পৃথিবীতে চলমান প্রক্রিয়াসমূহ সম্বন্ধে এক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা, সেগুলির সমানুবর্তিতাগুলি বোঝা এবং, বিষয়গত নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানের ভিত্তিতে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

আবশ্যিকতা সর্বদাই নিজেকে প্রকাশ করে নির্দিষ্ট বিষয়গত অবস্থায়। কিন্তু এই অবস্থাগুলি বদলায়, এবং আবশ্যিকতাও তদনুযায়ী পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়। আবশ্যিকতা কখনও পুরো-তৈরি রূপে আত্মপ্রকাশ করে না, বরং প্রথমে থাকে একটা সম্ভাবনা হিসেবে, যা একমাত্র অনুকূল অবস্থাতেই বাস্তবে পরিণত হয়।

৬। সম্ভাবনা ও বাস্তব

পৃথিবীতে বিদ্যমান বিভিন্ন বস্তু ও প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে প্রাকৃতিক আবশ্যিকতার দরুন, যখন সেগুলির আত্মপ্রকাশের নির্দিষ্ট পূর্বশর্ত, কারণ ও অবস্থা রূপ পরিগ্রহ করে। যথাকালে, বিকাশ এমন একটা জায়গায় গিয়ে পেঁছয়, যখন নতুন বস্তু বা প্রক্রিয়া তখন পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে নি, অথচ তার আত্মপ্রকাশের অবস্থাগুলি ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে, সেটাকে প্রস্তুত করেছে পূর্ববর্তী বিকাশ।

নতুন কোনো কিছুর আত্মপ্রকাশের জন্য মূল পূর্বশর্তগুলি, কারণ ও অবস্থাগুলির অস্তিত্বকে বলা হয় সম্ভাবনা। সম্ভাবনার মূল প্রত্যয়টিতে প্রতিফলিত হয় বাস্তবের বিকাশে এক বিষয়গত প্রবণতা।

বাস্তবের ধারণাটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে তা বোঝায় বিষয়গত পৃথিবীতে বিদ্যমান সব কিছুকে, এবং সংকীর্ণ অর্থে তা বোঝায় এক সাধিত, রূপায়িত সম্ভাবনাকে।

সম্ভাবনা ও বাস্তব পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সম্ভাবনার জন্ম হয় বাস্তবের বিকাশের দ্বারা, এবং বাস্তবকে প্রস্তুত করে সম্ভাবনা। তাই, তাদের একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা উচিত নয়।

কর্মপ্রয়োগে, বাস্তব থেকে সম্ভাবনাকে বিচ্ছিন্ন করার ফলে অবাস্তব সম্ভাবনাগুলি সম্বন্ধে বিমূর্ত আলোচনা দেখা দেয়, কেননা সত্যিকার সম্ভাবনা বাস্তবের সঙ্গে সর্বদাই সংযুক্ত ও তা বাস্তব-সঞ্জাত। অন্য দিকে, সম্ভাবনা থেকে বাস্তবকে বিচ্ছিন্ন করলে যা নতুন তার জন্য অনুভূতিটাকে ভোঁতা করে ফেলা হয় এবং প্রেক্ষিত নষ্ট হয়ে যায়।

সম্ভাবনা ও বাস্তবকে পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম করে দেখাও উচিত নয়, কেননা এক সর্পিল, প্রায়শই দুরূহ ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার দ্বারা সেগুলি পৃথক, সেই প্রক্রিয়া চলাকালে প্রথমোক্তটি শেষোক্তটিতে পরিণত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সামাজিক জীবনে, সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য নিবিড় প্রচেষ্টা দরকার হয় এবং বহুবিধ সামাজিক শক্তির সংগ্রামের সঙ্গে তা যুক্ত। কর্মপ্রয়োগে, সম্ভাবনা ও বাস্তবের ঐকাত্মতার ফলে আত্মসন্তুষ্টি দেখা দেয় এবং প্রথমোক্তটিকে শেষোক্তটিতে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে ব্যাপক জনসাধারণ যে কাজ করে, তাতে উৎসাহহীনতা ঘটতে পারে।

বিমূর্ত ও প্রকৃত সম্ভাবনার মধ্যে প্রভেদনির্ণয় করা উচিত। একটি সম্ভাবনা তখনই বাস্তব যখন সেটির রূপায়ণের সমস্ত অবস্থা গড়ে উঠেছে। একটি সম্ভাবনা যখন প্রকৃতি ও সমাজের নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, এই নিয়মগুলিকে খণ্ডন না করে, অথচ সেটিকে বাস্তবে পরিণত করার আবশ্যিক অবস্থার যখন পর্যন্ত অভাব আছে, তখন সেটি একটি বিমূর্ত সম্ভাবনা।

একটি বিমূর্ত সম্ভাবনা প্রকৃত হয়ে ওঠে তখন, যখন এই অবস্থাগুলি গড়ে ওঠে। যেমন, ১৮শ শতাব্দীর শেষ দিক ও ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যে সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বিমূর্ত ছিল, কেননা তখনও পর্যন্ত অবস্থা তার জন্য পরিপক্ক হয় নি। আমাদের যুগে সেই সম্ভাবনা একটা প্রকৃত সম্ভাবনা হয়ে উঠেছে, এবং পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য একটা অংশে তা ইতিমধ্যেই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

বিমূর্ত সম্ভাবনাগুলির বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা বিভিন্ন প্রকার। কিছু কিছু বিমূর্ত সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হওয়া এত সুদূর যে সেগুলি অসম্ভাব্যতার পর্যায়ে পড়ে। তা হলেও বিমূর্ত সম্ভাবনাকে অসম্ভাব্যতার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একাত্ম করা উচিত নয়, কেননা অসম্ভাব্যতা প্রকৃতি ও সমাজের নিয়মগুলির বিরোধী এবং কখনোই বাস্তবে পরিণত হতে পারে না।

বিমূর্ত ও প্রকৃত সম্ভাবনার মধ্যে প্রভেদ সারগত, কিন্তু আপেক্ষিক। বহু বিমূর্ত সম্ভাবনা প্রকৃত সম্ভাবনায় পরিবর্তিত হওয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের কথা বলতে গেলে, প্রকৃত সম্ভাবনাগুলির দিকেই মুখ্যত দিকস্থিতি নির্ণয় করা উচিত। এখানে এই কথাটা মনে রাখা দরকার যে প্রকৃত সম্ভাবনাগুলির সাধনযোগ্যতার পার্থক্য থাকতে পারে: এগুলির কোনো কোনোটি অন্যগুলির তুলনায় বাস্তবায়নের কাছাকাছি হতে পারে।

প্রকৃতিতে, শুধু বিষয়গত অবস্থাই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট। যেমন, একটি বুনো উদ্ভিদের বীজ প্রয়োজনীয় উত্তাপ ও আর্দ্রতা-বিশিষ্ট জমিতে পড়লেই অংকুরিত হবে। সমাজজীবনে, যেখানে চৈতন্য ও ইচ্ছাশক্তি-বিশিষ্ট মানুষ ক্রিয়া করে, সেখানে সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হয় ভিন্নভাবে। প্রক্রিয়াটি এখানে স্বতঃক্রিয় নয়, সচেতন মানবিক ক্রিয়াকলাপের ফল। সেই জন্য সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য শুধু বিষয়গত অবস্থাই যথেষ্ট নয়, বিষয়ীগত অবস্থারও দরকার হয়: রূপান্তরগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনতা, সেগুলির জন্য কাজ করার দৃঢ়সংকল্প, জনগণের সংগঠন, সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলির সংগঠন, পার্টি, ইত্যাদি।

বিপরীত প্রবণতা ও শক্তিগুলির অস্তিত্বজনিত বহুবিধ সম্ভাবনার যুগপৎ আত্মপ্রকাশ-হেতু, সচেতন মানবিক ক্রিয়াকলাপের উপরে সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করার নির্ভরশীলতা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্ভাবনাগুলির কোন কোনটি বাস্তবায়িত হবে, তা অনেকাংশে নির্ভর করে এই শক্তিগুলির ক্রিয়াকলাপের উপরে, তাদের মধ্যে সংগ্রামের পরিণতির উপরে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের কালে তাপ-পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধ রোধ করার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আরও একটি সম্ভাবনাও আছে, সেই যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা, কেননা সামরিক-শিল্প সমাহার আর আগ্রাসী অভিসন্ধি-বিশিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব এখনও রয়েছে। তাই, বিশ্বযুদ্ধ ঠেকানো অনেকখানি নির্ভর করে শান্তিকামী শক্তিগুলির সংগঠন, সংসক্তি ও সংকল্পের উপরে, অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে, নতুন নতুন অতিবিধ্বংসী অস্ত্রের উৎপাদনের বিরুদ্ধে, সহজ-সম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য তাদের সংগ্রামের পরিসর ও সাফল্যের উপরে।

পুঁজিবাদের তুলনায় সমাজতন্ত্রের অন্যতম একটা সুবিধা এই যে, সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রগতির জন্য শুধু গুণগতভাবে নতুন সম্ভাবনাই নয়, অতুলনীয়ভাবে অধিকতর সম্ভাবনা তার রয়েছে। এটা সমাজতন্ত্রের চরিত্রেরই দরুন, যেখানে উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত হয়েছে এবং বৈষয়িক মূল্যগুলির উৎপাদকরা হল মুক্ত শ্রমজীবী জনগণ। সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্যের দরুন, সমাজতন্ত্রে প্রগতি সেখানকার সকল সদস্যের সমর্থনপুষ্ট। অবশ্য-প্রয়োজনীয় রূপান্তরগুলিকে প্রতিরোধ করার মতো কোনো শ্রেণী বা অন্যান্য সংগঠিত শক্তি নেই। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজেও, নতুন সম্ভাবনাগুলি স্বতই বাস্তবায়িত হয় না, তার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম দরকার হয়। অবশ্য তা শ্রেণী সংগ্রাম নয়, বরং যা কিছু পশ্চাৎপদ, রক্ষণশীল

ও স্থাণু তার বিরুদ্ধে জনগণের ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠের সংগ্রাম। সেই জন্যই, সমাজতন্ত্রে নতুনের রূপায়ণ বৈরমূলক সমাজগুলির তুলনায় পূর্ণতর ও বেশি সফল।

প্রসঙ্গ ৯।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্ব

১। অবধারণা: মানবচৈতন্যে বাস্তবের প্রতিফলনের একটি প্রক্রিয়া

জগৎ জ্ঞেয় কিনা সেই প্রশ্নটি, মানুষের চিন্তার সত্যকে অনুধাবন করার সামর্থ্যের প্রশ্নটি বিজ্ঞান ও কর্মপ্রয়োগের পক্ষে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। জগৎ ও তার বিকাশের নিয়মগুলি যদি জ্ঞেয় হয় এবং আমাদের জ্ঞান যদি বাস্তবের সঠিক প্রতিফলন হয়, তা হলে প্রকৃতি ও সমাজের জ্ঞাত শক্তিগুলিকে মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত করা যায়।

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন এটা ধরে নেয় যে মানুষ পৃথিবীকে ও তার বিকাশের নিয়মগুলি বুঝতে পারে, এবং এই জ্ঞানকে সে ব্যবহার করতে পারে পৃথিবীর বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য। অবধারণার দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী তত্ত্ব পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের অবধারণার উপায়

ও রূপগুলি এবং লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগগত ব্যবহার দেখিয়ে দেয়। এই তত্ত্বের মূল কথা হল এই প্রতিজ্ঞা যে বাহ্যিক জগৎ বিষয়গতভাবে বিদ্যমান এবং মানবমনে তা প্রতিফলিত। তার মানে এই যে বাস্তবের বস্তু ও ব্যাপারসমূহ মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির উপরে একটা অভিঘাত সৃষ্টি করে, জন্ম দেয় সংবেদন ও কল্পমূর্তির, যেগুলির ভিত্তিতে মানুষ প্রত্যয়গুলিকে বিশদ করে। বাহ্যিক জগৎ হল আমাদের সকল জ্ঞানের উৎস।

কিন্তু অবধারণার প্রক্রিয়া পারিপার্শ্বিক জগতের একটা অক্রিয় প্রতিফলন নয়। প্রকৃতি ও সমাজকে জনগণ সক্রিয়ভাবে রূপান্তরিত করে, আর এই সক্রিয়তা তাদের সামনে উপস্থিত করে বিভিন্ন সমস্যা, যেগুলি সমাধানের জন্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মগুলি সম্বন্ধে একটা জ্ঞান দরকার হয়। ফলত, অবধারণা হল বাস্তবের এক সক্রিয় ও উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রতিফলন, তার অক্রিয় অনুধ্যান নয়।

মানুষের অবধারণাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ দেখে সমাজবিকাশের একটা ফল হিসেবে, মানুষ-কর্তৃক পারিপার্শ্বিক জগতের সক্রিয় রূপান্তরের ফল হিসেবে। প্রকৃতি ও সমাজকে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে চালিত মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপই অবধারণার ভিত্তি ও লক্ষ্য। সর্বপ্রকার অবধারণা রূপ পরিগ্রহ করে কর্মপ্রয়োগের মধ্যে, সম্মিলিত মানবশ্রমের মধ্যে। ব্যক্তিমানুষ সমাজের মধ্যে থাকতে-থাকতে পৃথিবীকে জানতে পারে এবং উৎপাদনের হাতিয়ারে বিধৃত, ভাষা,

বিজ্ঞান, সংস্কৃতি প্রভৃতিতে নথিবদ্ধ আগেকার প্রজন্মগুলির সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা অবধারণার দ্বান্দ্বিকতা উদ্ঘাটন করেছিলেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অবস্থান থেকে, অবধারণা হল এক অন্তহীন প্রক্রিয়া, তার মধ্য দিয়ে মানবচিন্তা অধীতব্য বস্তুটির অন্তঃসারের কাছাকাছি এসে পেঁছিয়। এটা হল অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান থেকে পূর্ণতর ও আরও ত্রুটিহীন জ্ঞানের দিকে একটা গতি। অচল-সেকেলে তত্ত্বগুলিকে নতুন নতুন তত্ত্ব দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে এবং পুরনো সব তত্ত্ব ও প্রতিজ্ঞার বিশিষ্টতা নির্ণয় করে অবধারণা এগিয়ে চলে, বাস্তবের নতুন নতুন দিককে ব্যাখ্যা করে।

২। অবধারণার দ্বান্দ্বিকতা

অবধারণা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া, জীবন্ত প্রত্যক্ষণ থেকে বিমূর্ত চিন্তনের দিকে ও তার পরে কর্মপ্রয়োগের দিকে এক গতি। লেনিন লিখেছেন: ‘জীবন্ত প্রত্যক্ষণ থেকে বিমূর্ত চিন্তন, **এবং তা থেকে কর্মপ্রয়োগ** — এই হল **সত্য** অবধারণার, বিষয়গত বাস্তব অবধারণার দ্বান্দ্বিক পথ।’*

ফলত, অবধারণার দুটি স্তর আছে: প্রথম, ইন্দ্রিয়জ

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 38, p. 171.

অবধারণা, বা জীবন্ত প্রত্যক্ষণ, এবং দ্বিতীয়, যুক্তিসহ অবধারণা, বা বিমূর্ত চিন্তন, যেখানে কর্মপ্রয়োগ হল অবধারণার ভিত্তি। এই দুটি স্তরের প্রত্যেকটিতে, অবধারণা পরিগ্রহ করে নিজস্ব সব মূর্ত রূপ। ইন্দ্রিয়জ অবধারণার তিনটি রূপ আছে: সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ও কল্পমূর্তি।

সংবেদনগুলি হল মানুষের দ্বারা পৃথিবীর অনুচিন্তনের প্রারম্ভিক রূপ। ইন্দ্রিয়গুলির উপরে বস্তুসমূহের সাক্ষাৎ অভিঘাতের ফলে এটা দেখা দেয়, বস্তুসমূহের বিচিত্রতম গুণ-ধর্মের দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়গুলি প্রভাবিত হতে পারে। আমরা একটি বস্তুর কঠিনতা অনুভব করতে পারি, ধ্বনি, রঙ, ইত্যাদি অনুভব করতে পারি। বিভিন্ন বস্তু ও ব্যাপার ইন্দ্রিয়গুলির উপরে বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, ইন্দ্রিয়গুলি বস্তুসমূহের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে, জন্ম দেয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিষ্টি, তেতো, টক, স্থিতিস্থাপক, কর্কশ, মসৃণ, প্রভৃতি সংবেদনের। অন্যান্য ক্ষেত্রে, আমরা একটি বস্তু অনুভব করি দূর থেকে, যেমন ঘটে একটি বস্তুর দৃশ্যগত প্রতিরূপ গঠনের বেলায়, যখন তার প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত আলোক চোখের অক্ষিপটের উপরে ক্রিয়া করে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলির উপরে একটি বস্তুর অভিঘাত যাই হোক না কেন, সংবেদন হল সেগুলির উপরে ক্রিয়াশীল এক বাহ্যিক উত্তেজক পদার্থের ফল।

সংবেদন হল আমাদের সকল জ্ঞানের উৎস। 'একমাত্র সংবেদনের মধ্য দিয়ে ছাড়া, আমরা বস্তুর

রূপগুলি সম্পর্কে অথবা গতির রূপগুলি সম্পর্কে কিছু জানতে পারি না; সংবেদনগুলি জাগ্রত হয় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির উপরে গতিস্থিত বস্তুর ক্রিয়ার দ্বারা।'*

সংবেদনগুলি আমাদের জ্ঞানের উৎস কারণ সেগুলি হল বিষয়গত বাস্তবের বিষয়ীগত প্রতিরূপ। সংবেদনগুলি আধারে বিষয়ীগত, কেননা সেগুলির আত্মপ্রকাশ ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। একই সঙ্গে, সেগুলি আধেয়তে বিষয়গত, কেননা বস্তুসমূহের বিষয়গত গুণ-ধর্মগুলিকে তা প্রতিফলিত করে। যেমন, বস্তুসমূহের গন্ধ ও অন্যান্য গুণ-ধর্ম প্রতিটি ব্যক্তি এককভাবে ও বিষয়ীগতভাবে অনুভব করে। কিন্তু বিষয়ীগত প্রতিরূপটি বস্তুসমূহের বিষয়গত প্রকৃতির অনুসঙ্গী হয়। যেমন, একটি খাদ্যসামগ্রীর গন্ধ তার একটি বিষয়গত গুণ-ধর্মকে প্রতিফলিত করে।

সংবেদন হল বিষয়গতভাবে বিদ্যমান বাস্তবের সঠিক প্রতিফলন, বাহ্যিক পৃথিবীর বস্তু ও ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে সেগুলি আমাদের সঠিকভাবে জানায়।

প্রত্যক্ষণ হল ইন্দ্রিয়জ অবধারণার আরও জটিল একটি রূপ। এগুলি ইন্দ্রিয়সমূহের উপরে প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল বস্তুটিকে প্রতিফলিত করে তার সমগ্রতায়। সাধারণত, আমাদের সংবেদনগুলি একটি অপরটি থেকে

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 14, p. 302.

বিচ্ছিন্ন নয়, সেগুলি একটা বিশেষ মিলিতরূপ গঠন করে। যে কোনো বস্তু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়া করে তার বিভিন্ন গুণ-ধর্মের দ্বারা, যেগুলি খোদ সেই বস্তুটিরই অভ্যন্তরে ঘনিষ্ঠ ঐক্যের মধ্যে থাকে। একটি বস্তুর প্রত্যক্ষণ ঘটে পৃথক পৃথক সংবেদন একত্রে মিলে তার অখণ্ড প্রতিরূপে পরিণত হওয়ার ফলে।

মানুষ আগে যা প্রত্যক্ষ করেছে সেটা তার স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে, এবং সেই বস্তুগুলি যখন অনুপস্থিত থাকে তখন সেগুলির প্রতিরূপ পুনরুপস্থাপন করতে পারে। যে বস্তুটি সেই বিশেষ মুহূর্তে ইন্দ্রিয়গুলির উপরে ক্রিয়া করে না, সেটির এই ধরনের পুনরুপস্থাপিত প্রতিরূপকে বলা হয় কল্পমূর্তি।

কল্পমূর্তিগুলি সামান্যীকরণ সম্ভব করে তোলে, কেননা স্মৃতিধৃত বস্তুসমূহের প্রতিরূপ মানুষকে সক্ষম করে তোলে তুলনা করতে, সমান্তরাল টানতে ও বিমূর্তন গঠন করতে, যেগুলি বস্তুসমূহের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণগুলি প্রকাশ করে। তাই, প্রত্যক্ষণগুলি যেখানে বস্তুসমূহকে তাদের সমস্ত মূর্ত গুণ-ধর্ম ও বিশদে প্রতিফলিত করে, সেখানে কল্পমূর্তিগুলি উদ্ঘাটন করে তাদের অভিন্ন, সামান্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে, এবং সেটা এই সমস্ত বস্তুর অন্তঃসার বুঝতে সাহায্য করে। আমাদের কাছে কোনো বস্তুর একটি কল্পমূর্তি থাকলে আমরা তার অন্তঃসার ও বৈশিষ্ট্যগুলি তাড়াতাড়ি হৃদয়ঙ্গম করি।

সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ও কল্পমূর্তি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ অবধারণার রূপগুলি হল বাস্তবের প্রতিরূপ।

বিষয়গতভাবে বিদ্যমান বস্তুসমূহের সঙ্গে সেগুলির সামঞ্জস্য কর্মপ্রয়োগে পরীক্ষিত হয়।

কিন্তু ইন্দ্রিয়জ অবধারণার পর্যায়েই মানুষ থেমে যায় না। সেটা পেরিয়ে গিয়ে সে বস্তুসমূহের সার্বিক, আবশ্যিক ও সারগত গুণ-ধর্ম ও সম্পর্ক, ইন্দ্রিয়জ অবধারণার অনধিগম্য সেগুলির নিয়ম-শাসিত সংযোগগুলি জানতে পারে। অবধারণার যুক্তিসহ, বা যৌক্তিক পর্যায়ে তা অর্জিত হয় চিন্তনের সাহায্যে। যা সেই মুহূর্তে দেখা যায় না, কিংবা যা সরাসরি আদৌ পর্যবেক্ষণ করা যায় না, মানবচিন্তা তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম। যেমন, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব কিংবা আলোকের দ্যুতি প্রত্যক্ষ করতে পারে না, কিন্তু এই সমস্ত প্রক্রিয়া ও ব্যাপারের মানসিক অনুধাবন সম্ভব।

আভ্যন্তরিক ও সার্বিক সংযোগগুলিকে প্রকাশ করতে, প্রকৃতিতে, সমাজে ও অবধারণাতেও পরিবর্তন ও বিকাশের নিয়মগুলি আবিষ্কার করতে, পারিপার্শ্বিক জগতের গভীরতম রহস্যগুলি উদ্ঘাটন করতে চিন্তন সাহায্য করে।

চিন্তা হল ঐতিহাসিক বিকাশের, সামাজিক কর্মপ্রয়োগের একটি উৎপাদ। তা হল বাস্তবের এক সামান্যীকৃত ও সান্তর প্রতিফলন। চিন্তন ইন্দ্রিয়জ অবধারণার মধ্য দিয়ে বাহ্যিক পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত; এবং তার অন্তঃসার হল ইন্দ্রিয়গুলি মারফৎ প্রাপ্ত তথ্যাদির প্রক্রিয়ণ।

বাস্তবের এক সামান্যীকৃত অবধারণা হিসেবে চিন্তা

চালিত হয় বস্তু, ব্যাপার ও প্রক্রিয়াসমূহের সামান্য, সারগত গুণ-ধর্মগুলি উদ্ঘাটন করার দিকে। ভাষা ছাড়া সামান্যীকরণ অসম্ভব হত: চিন্তা ও ভাষা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমরা যখন বস্তু ও ব্যাপারসমূহের মধ্যেকার সামান্যকে উদ্ঘাটন করি, তখন আমরা তা প্রকাশ করি ভাষায়, শব্দের রূপে। ভাষার সামান্যীকরণমূলক ভূমিকার দরুনই একজন ব্যক্তিমানুষ অন্য লোকেদের কাছে নিজের চিন্তা বিবৃত করতে পারে এবং তাদের নিজেদের চিন্তা সম্বন্ধে জানাতে পারে, তার জ্ঞানের সারসংক্ষেপ করে তা সঞ্চারিত করতে পারে।

ইন্দ্রিয়জ অবধারণার মতো, চিন্তাও নির্দিষ্ট সব রূপ ধারণ করে। এগুলি হল: প্রত্যয় বা ধারণা, বিচারগত মীমাংসা ও অনুমিতি।

প্রত্যয় হল চিন্তার একটি রূপ, যা বস্তু ও ব্যাপারসমূহের সামান্য ও সারগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিফলিত করে। এই সামান্য বৈশিষ্ট্যগুলির সামগ্রিকতা দিয়েই তৈরি হয় একটি প্রত্যয়ের অন্তর্বস্তু। ভাষায় প্রত্যয়গুলি ব্যক্ত হয় একটি শব্দ বা অনেকগুলি শব্দের সমষ্টি দিয়ে, যেমন — বস্তু, জীবসত্তা, সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ, ইত্যাদি।

প্রত্যেক বিজ্ঞানের আছে নিজস্ব প্রত্যয়-তন্ত্র, যা তার আবিষ্কৃত নিয়মগুলিকে প্রকাশ করে এবং তার প্রারম্ভিক নীতিসমূহ সূত্রবদ্ধ করে। যেমন, দর্শনের মূল প্রত্যয়গুলির মধ্যে আছে বস্তু, চৈতন্য, গতি, কার্য-কারণ সম্বন্ধ, ইত্যাদি, এবং অর্থশাস্ত্রের মূল

প্রত্যয়গ্নলির মধ্যে আছে ম্ল্য, পণ্য, প্রভৃতির প্রত্যয়।

বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়গ্নলি হল বাস্তবের এক সামান্যীকৃত প্রতিফলন, গোটা একটা ঐতিহাসিক কালপর্ব ধরে বিজ্ঞান ও কর্মপ্রয়োগ দ্বারা অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে তা সঞ্চিত করে। স্নতরাং, প্রত্যেক প্রত্যয়ই জ্ঞানের বিকাশে এক ধরনের সারসংক্ষেপ, বিষয়গত প্ৃথিবীর অবধারণায় একটি পর্যায়, যে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের শৃঙ্খলে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থি। প্রত্যয়সম্নহের সাহায্যে, একটি বিজ্ঞান চলমান পরিবর্তনগ্নলির কারণ, সেগ্নলির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য, সেগ্নলির পিছনকার নিয়মগ্নলি ব্যাখ্যা করে। সেই জন্যই প্রত্যয়সম্নহের অবধারণাম্নলক ম্ল্য এত বিরাট।

চিন্তনের প্রক্রিয়ায়, প্রত্যয়গ্নলি সাধারণত বিচারগত মীমাংসার উপাদান। বিচারগত মীমাংসা হল চিন্তার একটি র্নপ, যা প্রতিষ্ঠা করে অথবা অস্বীকার করে যে কোনো বৈশিষ্ট্য একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা বস্তুসমষ্টির অন্তর্গত, কিংবা যা বস্তুসম্নহের মধ্যে একটি সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করে অথবা অস্বীকার করে।

'মান্নষ সামাজিক জীব', 'এশীয়, আফ্রিকান ও লাতিন আমেরিকান দেশগ্নলির অন্নন্নত অবস্থার জন্য উপনিবেশবাদই দোষী', এবং 'সমাজতন্ত্র হল সামাজিক ন্যায়বিচারের এক সমাজ' — এই ধরনের চিন্তাগ্নলি হল বিচারগত মীমাংসা। এই মীমাংসাগ্নলির প্রথমটি দেখায় মান্নষ ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ; দ্বিতীয়টি,

উপনিবেশবাদ ও অসংখ্য দেশের অনুন্নত অবস্থার মধ্যে সম্বন্ধ; তৃতীয়টি, সমাজতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যে সম্বন্ধ।

একটি বিচারগত মীমাংসা সূত্রবদ্ধ হতে পারে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে, এবং পরোক্ষভাবে, অন্যান্য বিচারগত মীমাংসার ভিত্তিতেও।

চিন্তার যে রূপটির সাহায্যে এক বা একাধিক অন্যান্য বিচারগত মীমাংসা থেকে একটি নতুন বিচারগত মীমাংসা অনুমান করা হয়, তাকে বলা হয় একটি অনুমিতি, বা সিদ্ধান্ত। যে সমস্ত বিচারগত মীমাংসা থেকে অনুমিতি টানা হয়, সেগুলিকে বলা হয় প্রস্থানসূত্র, এবং নতুন বিচারগত মীমাংসাকে বলা হয় সিদ্ধান্ত, বা পরিণতি। অনুমিতির একটি দৃষ্টান্ত হল এই: 'কাজ একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে সকল নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য'। 'সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেক নাগরিক একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদস্য'। 'ফলত, প্রত্যেক সোভিয়েত নাগরিকের কাজ করার অধিকার ও কর্তব্য আছে'। প্রথম দুটি বিচারগত মীমাংসা এমনভাবে যুক্ত যে এক নতুন ভাব সংবলিত একটা নতুন বিচারগত মীমাংসায় আসা সম্ভব হয়ে ওঠে। যে সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না কিন্তু যেগুলি জ্ঞাত নিয়মগুলির দ্বারা শাসিত, সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার জন্য অনুমিতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রতিজ্ঞার সত্যতা বা হেত্বাভাস প্রতিপাদন করতে, প্রতিষ্ঠিত তথ্য-ঘটনাদি ও নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করতে, এবং

আবিষ্কৃত সমানুবর্তিতার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাস করতে অনুমিতিগুলি সাহায্য করে।

অবধারণার ইন্দ্রিয়জ ও যুক্তিসহ পর্যায়গুলি ঘনিষ্ঠভাবে আন্তঃসংযুক্ত। বৈজ্ঞানিক অবধারণা শুরু হয় বস্তু বা ব্যাপারটির পৃথক পৃথক দিক ও সংযোগের এক সরাসরি প্রত্যক্ষণ দিয়ে। তার পর চালানো হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যা সামান্যকে উদ্ঘাটন করার উপকরণ যোগায়। তার পরে ঘটে বিমূর্তন, অর্থাৎ, বস্তু ও ব্যাপারসমূহের কোনো কোনো গুণ-ধর্ম বা সম্পর্ক থেকে মনোযোগ অপসারণ; এবং ঘটে সামান্যীকরণ, অর্থাৎ জরুরি, নিয়ামক গুণ-ধর্ম ও সম্পর্কগুলি সনাক্তকরণ। তার পর বৈজ্ঞানিক অবধারণা উদ্ঘাটন করে বস্তু ও প্রক্রিয়াসমূহের আভ্যন্তরিক সংযোগ, সেগুলির মিথষ্ক্রিয়া ও পরিব্যাপ্তি, এবং সেগুলির বিকাশের নিয়ামক সমানুবর্তিতাগুলিকে। আমাদের জ্ঞান যত গভীর হয়, এই সমস্ত সংযোগ, সম্পর্ক, এমন কি খোদ বস্তুটিই তার ইন্দ্রিয়জ প্রতিরূপ হারাতে থাকে, কিন্তু অবধারণার প্রক্রিয়াটি চলে, কেননা বৈজ্ঞানিক বিমূর্তন সম্ভব করে তোলে সেটাকে হৃদয়ঙ্গম করতে যেটা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যায় না। এখানে মনে রাখা দরকার যে চিন্তন, ইন্দ্রিয়জ অবধারণার মতোই, কর্মপ্রয়োগের দ্বারা নির্ধারিত ও তার সঙ্গে সংযুক্ত, মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে সংযুক্ত, এবং নির্ভর করে কর্মপ্রয়োগ থেকে আহৃত উপাত্তের উপরে।

মানবিক অবধারণার নিয়মটি হল প্রতিভাস থেকে অন্তঃসারের দিকে, বাহ্যিক থেকে আভ্যন্তরিকের দিকে

একটা গতি। বিজ্ঞানের সমগ্র ইতিহাস থেকে তা স্বপ্রকাশ। যেমন, মার্কসের আগে বহু অর্থনীতিবিদ পণ্যসামগ্রীর বাহ্যিক গুণ-ধর্মগুলি দেখেছিলেন: সেগুলির উপযোগিতা (ব্যবহার-মূল্য) ও বিনিময় হওয়ার ক্ষমতা (বিনিময়-মূল্য)। কিন্তু পণ্যসামগ্রীর গুণ-ধর্মগুলির এই সমস্ত বাহ্যিক অভিব্যক্তির আড়ালে লুকিয়ে থাকে গভীর আভ্যন্তরিক সংযোগগুলি, এবং মার্কসই এই সমস্ত সংযোগ সনাক্ত করে সমস্ত পণ্যসামগ্রীর অভিন্ন উপাদানটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন: সেগুলি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক শ্রম।

পণ্য হল একটি দ্বৈততা, অর্থাৎ, ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের ঐক্য। সেই জন্যই পণ্যে অনুস্যূত শ্রমও দ্বৈত হওয়া উচিত। সেটা আবিষ্কার করে মার্কস দেখিয়েছিলেন যে একটি পণ্যের মূল্য শ্রমের সামাজিক চরিত্রকে, লোকেদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ককে প্রকাশ করে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগত চিন্তনের বিরাট গুরুত্ব এই যে পৃথিবীর অবধারণায় তা এক শক্তিশালী হাতিয়ার, সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে মানুষকে তা সক্ষম করে তোলে।

৩। সত্য সম্বন্ধে মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদ

বৈজ্ঞানিক অবধারণার প্রধান কাজ হল সত্য হৃদয়ঙ্গম করা।

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন সত্যকে দেখে বিষয়গত

বাস্তবের এক সঠিক, সিদ্ধ প্রতিফলন হিসেবে, বাস্তবিকই তা যেমন, তেমনভাবেই মানবমনে তার পুনরূপস্থাপন হিসেবে। সত্য হল বিষয়গত পৃথিবী সম্বন্ধে সেই জ্ঞান, যা বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জ্ঞান যেখানে বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না, সেখানে তা একটা ভ্রান্তি।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ধরে নেয় যে আমাদের জ্ঞানের একটা বিষয়গত অন্তর্বস্তু আছে, সত্য সর্বদাই বিষয়গত।

এই বিচারগত মীমাংসাটি ধরুন: 'মানুষের আগে পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল'। এই বিচারগত মীমাংসাটি সত্য। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দেখায় যে প্রাণের উদ্ভব ঘটার আগে শত শত কোটি বছর ধরে পৃথিবী ছিল এক প্রাণহীন গ্রহ, এবং মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল মাত্র প্রায় ২৫-৩০ লক্ষ বছর আগে।

আমাদের যে জ্ঞানের অন্তর্বস্তু মানুষের উপরে বা মানবজাতির উপরে নির্ভর করে না, তাকে বলা হয় বিষয়গত সত্য।

বিষয়গত সত্যের স্বীকৃতি দেখা দেয় প্রতিফলনের বস্তুবাদী তত্ত্ব থেকে। বিষয়গত বাস্তবকে, প্রকৃতই বিদ্যমান জগৎকে আমাদের চৈতন্য প্রতিফলিত করে, তার প্রতিলিপি গ্রহণ করে। লেনিন লিখেছেন: 'আমাদের সংবেদনগুলিকে বাহ্যিক জগতের প্রতিরূপ বলে গণ্য করা, বিষয়গত সত্যকে স্বীকার করা, জ্ঞানের বস্তুবাদী তত্ত্ব পোষণ করা — এ সবই এক জিনিস।'*

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 14, p. 130.

বিষয়গত সত্যের মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। তা বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিকে যথাযথভাবে গণ্য করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। মানুষের আচরণে সত্যের প্রতি আনুগত্য প্রত্যয়, সততা ও নাগরিক বীরত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

মানুষ কীভাবে বিষয়গত সত্যে এসে পৌঁছয়? তা কি সম্পূর্ণ ও অনাপেক্ষিক একটা কিছু হিসেবে তার ধারণা, বিচারগত মীমাংসা ও তত্ত্বগুলিতে তার সমগ্রতায় প্রকাশিত হয়, না কি শুধু উপান্তিকভাবে ও আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়? অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক সত্যের মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্কের বিশ্লেষণ থেকে সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক সত্যের মধ্যেকার প্রভেদ হল অবধারণার গভীরতায়, বাস্তব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের গভীরতায় প্রভেদ। আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক সত্যের প্রত্যয়গুলি যা ইতিমধ্যেই জ্ঞাত ও যা এখনও অবধারণা করা বাকি তার মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্ক, এবং যা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণীত হবে এবং যা অকাট্য থাকবে তার মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্ককেও দেখায়।

অনাপেক্ষিক সত্যের প্রত্যয়টির দুটি দিক আছে। প্রথম, তা হল বাস্তবের এক যথাযথ, সম্পূর্ণ ও বিশদ প্রতিফলন, এবং দ্বিতীয়, তা হল বিষয়গত সত্যের অকাট্য উপাদান, যে উপাদানটিকে ভবিষ্যতে খণ্ডন করা যাবে না।

আপেক্ষিক সত্য হল উপান্তিকভাবে সত্য জ্ঞান,

যা অসম্পূর্ণ এবং অবধারণার মধ্য দিয়ে যা ক্রমেই বেশি করে পূর্ণ, সুনির্দিষ্ট ও সঠিক হয়। আপেক্ষিক সত্য প্রকাশ করে আমাদের ঐতিহাসিকভাবে শর্তাবদ্ধ জ্ঞানকে, অবধারণার এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে তার সীমাবদ্ধতাকে।

প্রত্যেক ঐতিহাসিক পর্যায়ে মানবজ্ঞান নির্ধারিত হয় কর্মপ্রয়োগের অর্জিত স্তর, বিজ্ঞান ও উৎপাদনের বিকাশ দিয়ে। বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও প্রতিজ্ঞাগুলি সেই সমস্ত সংযোগ ও সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে, যেগুলির অস্তিত্ব থাকে বিশেষ অবস্থায়, এবং বৈজ্ঞানিক প্রগতি বলতে শুধু নতুন নতুন তথ্য ও নিয়ম আবিষ্কারই বোঝায় না, এই নিয়মগুলি কোন কোন অবস্থায় সিদ্ধ তা নির্ণয়করণও বোঝায়। তাই, বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি আপেক্ষিক এই অর্থে যে সেগুলি বাস্তব সম্পর্কে এক সর্বাত্মক জ্ঞান দেয় না, পরিবর্তিত ও সুনির্দিষ্ট হয়।

যেমন, বস্তুর পারমাণবিক তত্ত্বটি প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। পদার্থ পরমাণুসমূহ দিয়ে গঠিত, এই যে সত্য প্রতিজ্ঞাটি অনাপেক্ষিক সত্যের একটি উপাদান ছিল, সেই তত্ত্বটিতে ছিল ভ্রান্তির একটি উপাদানও: এই প্রতিজ্ঞা যে পরমাণুসমূহ অবিভাজ্য। ১৯শ শতাব্দীর শেষ দিকে বিদ্যুতিন, তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের ফলে এই ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান সুনির্দিষ্ট করা, অবিভাজ্য পরমাণু সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা কাটিয়ে ওঠা, এবং সঠিক ধারণাগুলি প্রসারিত ও গভীর করা সম্ভব হয়েছিল।

অনাপেক্ষিক সত্যকে আপেক্ষিক সত্যের বিপরীতে স্থাপন করা উচিত নয়, কেননা সত্য হল একটা প্রক্রিয়া, অসম্পূর্ণ ও উপান্তিকভাবে সত্য জ্ঞান থেকে পূর্ণতর ও আরও ত্রুটিহীন জ্ঞানের দিকে চিন্তার গতি, এবং আপেক্ষিক সত্য হল অনাপেক্ষিক সত্যের পথে একটি পর্যায় মাত্র।

এই মূল প্রতিজ্ঞাগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন: 'আধুনিক বস্তুবাদের, অর্থাৎ মার্কসবাদের অবস্থান থেকে, বিষয়গত, অনাপেক্ষিক সত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের উপান্তিকতার **সীমা** ঐতিহাসিকভাবে শর্তসাপেক্ষ, কিন্তু এই সত্যের অস্তিত্ব **অ-শর্তসাপেক্ষ,** এবং আমরা যে তার আরও কাছাকাছি যাচ্ছি সেই ঘটনাটাও অ-শর্তসাপেক্ষ।'* ফলত আমাদের জ্ঞান আপেক্ষিক এই অর্থে নয় যে তাতে অনাপেক্ষিক সত্য নেই, বরং শুধু এই অর্থে যে আমাদের জ্ঞান এই সত্যের নিকটবর্তী হয় এক ক্রমান্বিত, ঐতিহাসিকভাবে শর্তাবদ্ধ প্রক্রিয়ায়।

সত্য জ্ঞান হল সেই জ্ঞান যা বাস্তবের সঙ্গে মেলে। বাস্তবে কোনো পরিবর্তন হলে, সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও তদনুযায়ী পরিবর্তিত হওয়া উচিত। তার মানে এই যে বিমূর্ত সত্য বলে কিছু নেই, সত্য সর্বদাই মূর্ত। অবস্থা, কাল, স্থান ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলির সর্বাত্মক অধ্যয়ন ও মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সত্যে উপনীত হতে হয়, কারণ কোনো কোনো অবস্থায় যা

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 14, p. 136.

সত্য অন্যান্য অবস্থায় তা মিথ্যা হতে পারে, এবং এর বিপরীতও হতে পারে।

মূর্ত-নির্দিষ্ট অবস্থাগুলির মূল্যায়ন সমাজজীবনে বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটা হল নিয়ত পরিবর্তনের একটা এলাকা, সেখানে কোনো কোনো বিষয় অন্তর্হিত হয় এবং অন্যান্য অবস্থা দেখা দেয়, ইত্যাদি।

অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক সত্যের দ্বান্দ্বিকতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত উপলব্ধি, সত্যের মূর্ত-নির্দিষ্ট চরিত্র সম্বন্ধে উপেক্ষার ফলে দেখা দেয় দুটি চরম রূপ: মতান্ধতা ও আপেক্ষিকতাবাদ। মতান্ধতা অবধারণার অনাপেক্ষিক উপাদানটিকে অতিরঞ্জিত করে এবং তার আপেক্ষিক চরিত্রকে অস্বীকার করে। এটা ঘটে এমন কোনো কোনো প্রতিজ্ঞা, সিদ্ধান্ত, বা সূত্রের অনাপেক্ষিকীকরণ থেকে, যেগুলিকে মূর্ত-নির্দিষ্ট অবস্থা, স্থান ও কালের প্রেক্ষিতের বাইরে বিবেচনা করা হয়।

জীবন ও কর্মপ্রয়োগের সঙ্গে সংস্পর্শহীন হওয়ায়, মতান্ধতাবাদীরা কাজ করে শিলীভূত সব ধারণা আর সূত্র নিয়ে, সেগুলিকে প্রয়োগ করে এমন সব ব্যাপার বা ঘটনার ক্ষেত্রে যেখানে সেগুলি প্রয়োগ করা চলে না। মতান্ধতা প্রকাশ পায় যান্ত্রিকভাবে স্মৃতিজাত করা প্রতিজ্ঞা, আকারনিষ্ঠ মনোভাব, আমলাতান্ত্রিক কর্মপ্রয়োগ, প্রভৃতির পুনরাবৃত্তির মধ্যে।

আপেক্ষিকতাবাদ জ্ঞানের আপেক্ষিক, শর্তসাপেক্ষ উপাদানটিকে পরম করে তোলে এবং তাই অনাপেক্ষিক

সত্যকে অস্বীকার করে। লেনিন লিখেছেন, জ্ঞানের তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে আপেক্ষিকতাবাদের নিহিতার্থ শুধু আমাদের জ্ঞানের আপেক্ষিকতার স্বীকৃতিই নয়, বরং এমন যে কোনো বিষয়গত পরিমাপ বা মডেলেরও অস্বীকৃতি, মানবজাতি-নিরপেক্ষভাবে যার অস্তিত্ব আছে এবং আমাদের আপেক্ষিক জ্ঞান যার দিকে এগিয়ে চলে। আপেক্ষিকতাবাদের ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপেই দেখা দেয় অবধারণার ও প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্ভাবনা অস্বীকৃতি, বিষয়ীমুখিতা। যারা প্রায়শই 'সৃষ্টিশীল' মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একমাত্র প্রতিনিধি বলে দাবি করে, সেই সমস্ত দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদী আপেক্ষিকতাবাদ ও মতান্ধতাকে প্রায়শই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে।

৪। অবধারণায় কর্মপ্রয়োগের ভূমিকা

কর্মপ্রয়োগ হল প্রকৃতি ও সমাজের রূপান্তর ঘটানোর ক্ষেত্রে মানুষের উদ্দেশ্যপূর্ণ সামাজিক ক্রিয়াকলাপ। এর অন্তর্ভুক্ত হল, প্রথম, বৈষয়িক উৎপাদনের প্রক্রিয়া; দ্বিতীয়, শ্রেণীসমূহের, জনসাধারণের সামাজিক-রাজনৈতিক, বৈপ্লবিক-রূপান্তরসাধক ক্রিয়াকলাপ; ও তৃতীয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

লেনিন লিখেছেন, 'জীবনের, কর্মপ্রয়োগের

অবস্থানই জ্ঞানের তত্ত্বে প্রথম ও বুনিয়াদি হওয়া উচিত। এবং তা অবশ্যম্ভাবীরূপে নিয়ে যায় বস্তুবাদের দিকে...'*

অবধারণায়, কর্মপ্রয়োগের ক্রিয়া নিম্নরূপ। প্রথম, মানুষের ব্যবহারিক সামাজিক ক্রিয়াকলাপ হল অবধারণার প্রস্থানবিন্দু এবং প্রধান, সারগত ভিত্তি। খোদ অবধারণাই আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং বিকশিত হয়ে চলেছে কর্মপ্রয়োগের ভিত্তিতে, মানুষের উৎপাদনমূলক ক্রিয়াকলাপের দরুন। সত্যকার বিজ্ঞানসম্মত অবধারণা একমাত্র সম্ভব বাহ্যিক জগতের সঙ্গে ব্যবহারিক মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, এবং কর্মপ্রয়োগ ছাড়া ও কর্মপ্রয়োগ-নিরপেক্ষভাবে তা অকল্পনীয়।

দ্বিতীয়, কর্মপ্রয়োগ হল অবধারণার চালিকা শক্তি। ব্যবহারিক প্রয়োজন, সর্বোপরি উৎপাদনের প্রয়োজন তত্ত্বগত বিজ্ঞানকে সামনের দিকে চালিত করে, তার সামনে কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ করে এবং তার বিকাশের প্রধান ধারা তুলে ধরে। এই অর্থে, কর্মপ্রয়োগ অবধারণার লক্ষ্যও বটে। খোদ অবধারণা প্রক্রিয়া, যে কোনো বিজ্ঞানই আত্মপ্রকাশ করে ও বিকশিত হয় কর্মপ্রয়োগের চাহিদার দরুন, জীবনের প্রয়োজনে। যখনই কোনো জরুরি সমস্যার সমাধান দরকার হয়, বিজ্ঞানের উচিত তার একটা উত্তর যোগানো, এবং বিজ্ঞান সেটাই করে।

তৃতীয়, কর্মপ্রয়োগ হল আমাদের জ্ঞানের মানদণ্ড।

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 14, p. 142.

বিভিন্ন ধারণা ও তত্ত্বকে যাচাই করতে, সেগুলির সত্যতা বা ভ্রান্তি প্রতিষ্ঠা করতে, জ্ঞানকে সুনির্দিষ্ট ও প্রণালীবদ্ধ করতে কর্মপ্রয়োগ সাহায্য করে।

কর্মপ্রয়োগের মধ্য দিয়েই লোকে তাদের জ্ঞানের বিষয়গত সত্য প্রতিপাদন বা খণ্ডন করতে পারে, এবং তাই কর্মপ্রয়োগ হয়ে ওঠে এক পরম মানদণ্ড।

সেই সঙ্গে, এক মানদণ্ড হিসেবে কর্মপ্রয়োগ আপেক্ষিক, কেননা প্রত্যেক বিশেষ যুগে তা আমাদের জ্ঞানকে প্রতিপাদন বা খণ্ডন করতে পারে শুধু সেই সীমারই মধ্যে, সামাজিক উৎপাদন ও সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা বিকাশের ক্ষেত্রে যে সীমা অর্জিত হয়েছে।

কর্মপ্রয়োগ ও তত্ত্ব উভয়েই বিকশিত হয়ে চলে, এবং তাদের বিকাশে নিয়ামক ভূমিকাটি হল কর্মপ্রয়োগের। তত্ত্ব ও কর্মপ্রয়োগ হল অবধারণার দুটি অবিচ্ছেদ্য দিক। সে দুটি পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে, যেমন হয় বিজ্ঞান ও উৎপাদনের ঐক্যের ক্ষেত্রে।

বিজ্ঞান তার বিকাশের যুক্তি অনুযায়ী আপেক্ষিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে এবং উৎপাদনের বিকাশকে ছাপিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। তা বৈষয়িক উৎপাদন ও আত্মিক সংস্কৃতির বিকাশের, উৎপাদিকা শক্তিগুলির বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার, কাঁচামাল ও জনশক্তিসম্পদের যুক্তিসহ ব্যবহার, ইত্যাদির একটা ভিত্তি যোগায়।

তত্ত্ব ও কর্মপ্রয়োগকে দেখা উচিত ঐক্যের মধ্যে, কেননা তত্ত্ব সামাজিক-ঐতিহাসিক কর্মপ্রয়োগের দ্বারা

শুধু সমৃদ্ধই হয় না, তা নিজেই একটা বলিষ্ঠ রূপান্তরসাধক শক্তি, তা পৃথিবীর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য, সুপ্রাচীন পশ্চাৎপদতা দূর করা ও নতুন জীবন গড়ার জন্য ব্যবহারিক পথের নির্দেশ দেয়।

প্রসঙ্গ ১০।

বৈজ্ঞানিক অবধারণার পদ্ধতি

১। বৈজ্ঞানিক অবধারণার পদ্ধতি-তন্ত্র

পৃথিবীর বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হয় পৃথিবী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অবধারণার ভিত্তিতে, যার সঙ্গে আবশ্যিকভাবেই জড়িত থাকে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের নীতি, নিয়ম ও মূল প্রত্যয়গুলির ব্যবহার, কিন্তু যা শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসই অধীত বস্তু, প্রক্রিয়া ও ব্যাপারসমূহের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, সেগুলির আভ্যন্তরিক সংযোগ ও সম্পর্ককে যথাযথভাবে গণ্য করার দাবি করে। তত্ত্বের সঙ্গে, বিবেচ্য বস্তু, প্রক্রিয়া বা ব্যাপারটির ক্রিয়া ও বিকাশের নিয়মগুলির সঙ্গে অবধারণার পদ্ধতিসমূহ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

তত্ত্ব ও পদ্ধতি হল আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন রূপ, যে রূপে মানুষ পারিপার্শ্বিক

বিষয়গত বাস্তবকে আয়ত্ত করে। তত্ত্ব হল সেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে সংগঠিত করার একটি রূপ, যা বাস্তবের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সমানুবর্তিতাসমূহ এবং সারগত সংযোগ ও সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে একটা অখণ্ড ধারণা দেয়। তা হল ভাবগত প্রতিরূপগুলির এক প্রণালী-তন্ত্র, যা অধীত বস্তুটির অন্তঃসার, তার আভ্যন্তরিক আবশ্যিক সংযোগ, এবং তার ক্রিয়া ও বিকাশের নিয়মগুলিকে প্রতিফলিত করে। পদ্ধতি হল বাস্তবের উপরে এক তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দখল লাভের উপায় ও ক্রিয়াগুলির সামগ্রিকতা। যে সমস্ত আন্তঃসংযুক্ত নীতি ও দাবি মানুষকে তাদের অবধারণামূলক ও লক্ষ্যাভিমুখী রূপান্তরমূলক ক্রিয়াকলাপে চালিত করে, পদ্ধতি হল সেগুলির সামগ্রিকতা। সুতরাং, তত্ত্ব এক ব্যাখ্যামূলক ক্রিয়া সম্পন্ন করে, বস্তুটির মধ্যে কোন কোন আবশ্যিক গুণ-ধর্ম ও সংযোগ অন্তর্নিহিত, এবং তার ক্রিয়ায় ও বিকাশে তা কোন কোন নিয়ম-শাসিত সেটা দেখায়। আর পদ্ধতি এক নিয়মনমূলক ক্রিয়া সম্পন্ন করে, প্রয়োজক যে বস্তুটি বুঝতে বা রূপান্তরিত করতে চায় সেই বস্তুটি তার কীভাবে দেখা উচিত, এবং তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন কোন অবধারণাগত বা ব্যবহারিক ক্রিয়া তার সম্পন্ন করা উচিত, সেটা দেখায়। একটি বস্তুর বর্ণনা দেওয়ার সময়ে তত্ত্ব দেখায় সেই বস্তুটি বর্তমানে কী, পক্ষান্তরে পদ্ধতি সেই বস্তুটির ব্যাপারে গৃহীতব্য ব্যবস্থার বিধান দেয়। কিন্তু তত্ত্ব ও পদ্ধতি অনেকখানি স্বাধীন হলেও এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া

সম্পন্ন করলেও, সে দুটি সর্বদাই আন্তঃসংযুক্ত ও পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল। যে কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই বিশদীকৃত হয় কোনো তত্ত্বের ভিত্তিতে। একটি অবধারণাগত বা ব্যবহারিক লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর হতে হলে, তার নীতিসমূহে অবধারণা বা ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্যবস্তুস্বরূপ বস্তুটির গুণ-ধর্ম ও সম্পর্কগুলি প্রতিফলিত হওয়া উচিত। আর এই সমস্ত গুণ-ধর্ম ও সম্পর্ককে তত্ত্বই উদ্ঘাটিত ও ব্যাখ্যা করে। সেই সঙ্গে, তত্ত্বে বস্তুটির গুণ-ধর্ম ও সংযোগগুলির ব্যাখ্যার গভীরতা ও প্রামাণিকতা, এবং কর্মপ্রয়োগে তার রূপান্তরের প্রগাঢ়তা ও কার্যকরতা নির্ভর করে অবধারণাগত ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের যথোপযুক্ত পদ্ধতিগুলি ব্যবহারের উপরে।

পৃথিবীর তত্ত্বগত প্রতিফলনের সার্বিকতা ও গভীরতার মাত্রা অনুযায়ী, এবং অধীত বস্তুগুলির সুনির্দিষ্ট-বৈশিষ্ট্যসমূহ, সেগুলির আভ্যন্তরিক সংযোগ, সম্পর্ক ও সম্পর্কগুলির উপায় অনুযায়ী, অবধারণার বস্তুটির প্রতি গবেষকের মনোভাব, এবং তার মানসিক ক্রিয়াগুলির পরম্পরা ও সংগঠন অনুযায়ী, অবধারণার পদ্ধতিগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

সর্বপ্রথমে, সার্বিক পদ্ধতি: বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস, বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। আগেই যেমন দেখানো হয়েছিল, সার্বিক পদ্ধতি অবধারণার সবচেয়ে সামান্য নিয়মগুলিকে সূত্রবদ্ধ করে এবং তাই তা হল বিজ্ঞানের বিকাশের এক সামান্যীকৃত দার্শনিক তত্ত্ব, তার সামান্য পদ্ধতিতত্ত্ব।

সার্বিক পদ্ধতি তার আধেয়তে বস্তু ও ব্যাপারসমূহের সবচেয়ে সামান্য গুণ-ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং তাই যে কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সবচেয়ে সামান্য লক্ষণগুলিকে তা প্রকাশ করে।

সমস্ত বা অধিকাংশ বিজ্ঞানে ব্যবহৃত সামান্য-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি সব মিলিয়ে একটা বড় সমষ্টি। এগুলির ভিত্তি হল ব্যাপক বৈজ্ঞানিক নীতি, নিয়ম ও তত্ত্বগুলি এবং এগুলি প্রকাশ করে বৈজ্ঞানিক অবধারণার সামান্য ও সারগত বৈশিষ্ট্যগুলি, খোদ অধীত বস্তুসমূহের মধ্যে সামান্য ও সারগতকে। অবধারণার সামান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে আছে পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আকারীকরণ, বিমূর্ত থেকে মূর্ততে আরোহণ, বস্তুটির ইতিহাসগত ও যুক্তিসংগত পুনরুপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ, গাণিতিক, পরিসংখ্যানগত ও অন্যান্য পদ্ধতি। মানুষের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের যুক্তির এক প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে, প্রাথমিক যুক্তিসংগত ক্রিয়া ও পদ্ধতির ভিত্তিতে গঠিত এই পদ্ধতিগুলির সাধারণ বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব এইখানে যে সেগুলি বিষয়গত সত্যকে, বস্তুজগতের নিয়ম ও সমানুবর্তিতাগুলিকে অবধারণা করার এক অপরিহার্য শর্তস্বরূপ।

অবধারণার সার্বিক ও সামান্য পদ্ধতিগুলি বস্তুসমূহের এক গভীর ও সর্বাত্মক প্রতিফলনের পক্ষে অপ্রতুল, কেননা যে কোনো বস্তুরই থাকে নিজস্ব সুনির্দিষ্টতা, গুণ-ধর্ম, ইত্যাদি। যে কোনো সুনির্দিষ্ট

অবধারণাগত সমস্যার সমাধানে উপযুক্ত উপায় ও পদ্ধতির বাছাইটা পূর্বানুমিত। সেই জন্যই, যে কোনো বিজ্ঞান তার ঐতিহাসিক বিকাশধারায় বিশেষ (বা মূর্ত-নির্দিষ্ট) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলির এক প্রণালীতন্ত্র বিশদ করে। এগুলির মধ্যে আছে এক বা একাধিক সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে ব্যবহৃত গবেষণার পদ্ধতি, যেমন পদার্থবিদ্যায় বর্ণালী-সংক্রান্ত বিশ্লেষণের পদ্ধতি, প্রত্নতত্ত্বে খননকার্যের পদ্ধতি, জ্যোতির্বিদ্যায় রাডার পদ্ধতি, ইত্যাদি।

সামান্য ও বিশেষ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে কোনো অনাপেক্ষিক প্রভেদ নেই। কোনো বিজ্ঞান যখন এগিয়ে চলে এবং আরও বেশি সামান্য সমানুবর্তিতাগুলি প্রকাশ করে, তার বিশেষ পদ্ধতিগুলিও বিকশিত হয়ে সামান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিণত হয়। বিকাশধারায় বিজ্ঞানগুলির সংবদ্ধতার দ্বারাও প্রক্রিয়াটি এগিয়ে চলে। যেমন, কৃৎকৌশলগত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির বিকাশ ঘটায়, গাণিতিক পদ্ধতিগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে, এবং এই পদ্ধতিগুলি এখন হয়ে উঠেছে সামান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

বৈজ্ঞানিক অবধারণার সমস্ত পদ্ধতিই ঘনিষ্ঠভাবে আন্তঃসংযুক্ত এবং একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না। স্বভাবতই, পৃথিবী অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও সেগুলি প্রযুক্ত হয় ঐক্যবদ্ধতায়। সেই সঙ্গে, সেই ঐক্যের কাঠামোর মধ্যে এই পদ্ধতিগুলির প্রত্যেকটির কিছুটা স্বাতন্ত্র্য থাকে এবং সেটি নিজস্ব পদ্ধতিতত্ত্বগত ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

এই ঐক্য ও আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যই অবধারণার সার্বিক পদ্ধতি ও অন্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যেকার সংযোগের বৈশিষ্ট্য। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যেকার ঐক্য ও প্রভেদের বিষয়গত ভিত্তি হল সার্বিক, সামান্য ও একক গুণ-ধর্মগুলির এবং যে কোনো বস্তু ও ব্যাপারের বৈশিষ্ট্যগুলির ঐক্য, মিথষ্ক্রিয়াশীল সার্বিক, সামান্য ও সুনির্দিষ্ট নিয়মগুলির ভিত্তিতে সেগুলির পরিবর্তন।

যে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তি হল সেই সমস্ত সার্বিক, সামান্য সুনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা, যেগুলিতে প্রতিফলিত হয় বস্তুজগতের অনুষঙ্গী গুণ-ধর্ম ও নিয়মগুলি, যার ফলে সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণাই সার্বিক দার্শনিক ও বিশেষ নীতি, নিয়ম ও মূল প্রত্যয়গুলির দ্বারা যুগপৎ চালিত হতে বাধ্য, সেখানে সার্বিক, দার্শনিক পদ্ধতিই বৈজ্ঞানিক অবধারণার অন্য সমস্ত পদ্ধতিকে পরিব্যাপ্ত করে, সেগুলির চরিত্রকে নির্ধারণ করে এবং অবধারণামূলক প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করে।

সার্বিক পদ্ধতি হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস অবধারণার অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত, সেটাই হল সেগুলির আভ্যন্তরিক আধেয়। তা প্রকাশ পায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ, সেগুলির উপাদান ও দিকগুলির মধ্যেকার সংযোগে, অবধারণাকালে সেগুলির রূপান্তর ও মিথষ্ক্রিয়ায়। সেই সঙ্গে, দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী পদ্ধতি নির্ভর করে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপরে

এবং আহরণ করে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানগুলির কৃতিত্ব ও পদ্ধতিসমূহ থেকে। ভাষান্তরে, সার্বিক, সামান্য ও বিশেষ পদ্ধতিগুলি আন্তঃসংযুক্ত এবং একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে। বৈজ্ঞানিক অবধারণার সার্বিক পদ্ধতি ও বৈপ্লবিক-রূপান্তরসাধক ক্রিয়াকলাপের সার্বিক পদ্ধতি হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসকে ব্যবহার করার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও প্রধান প্রধান দাবি উপরে পরীক্ষা করা হয়েছে। এখন বৈজ্ঞানিক অবধারণার অভিন্নতম সামান্য পদ্ধতিগুলির দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক।

বৈজ্ঞানিক অবধারণা হল অভিজ্ঞতামূলক ও তত্ত্বগত জ্ঞানের এক ঐক্য। সেই ঐক্যের ভিতরকার প্রত্যেকটি স্তর আপেক্ষিকভাবে স্বতন্ত্র, এবং প্রত্যেকটির আছে, সামান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সমেত, এক প্রস্ত পদ্ধতি।

২। অবধারণার অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি

অবধারণার অভিজ্ঞতামূলক স্তরটির বৈশিষ্ট্যসূচক পদ্ধতিগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ অবধারণামূলক ভূমিকা পালন করে। অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতিগুলি হল বৈজ্ঞানিক অবধারণার যাত্রাবিন্দু। অবধারণার অভিজ্ঞতামূলক স্তরটির একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে মানুষের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে, অথবা বৈজ্ঞানিক অবধারণার ফলে যে সমস্ত জিনিস জানা যায়, সেগুলির মধ্যেকার বিষয়গত গুণ-ধর্ম, সংযোগ ও সম্পর্কগুলিকে তা বিবেচনা করে।

অধীত বস্তুটির আচরণ সম্বন্ধে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ হল সত্যকার বৈজ্ঞানিক অবধারণার প্রারম্ভিক পর্যায়। যে কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরই ভিত্তি হল বাস্তবের তথ্য ও ঘটনাগুলির এক প্রণালীবদ্ধ সামান্যীকরণ ও অধ্যয়ন। এই তথ্য ও ঘটনাগুলিই জ্ঞানের জরুরি আধেয়। মূল প্রকল্পটিকে অথবা কোনো তত্ত্বগত প্রতিজ্ঞাকে তা প্রতিপাদন, মূর্ত ও সুনির্দিষ্ট করে অথবা অপ্রমাণ করে, এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক সমস্যা ও ব্যবহারিক কর্তব্যকর্ম সূত্রবদ্ধ করার বুনিয়াদ যোগায়।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লাভ করা হয় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

অবধারণার এক পদ্ধতি হিসেবে **পর্যবেক্ষণ** হল বস্তু ও ব্যাপারসমূহের এক উদ্দেশ্যপূর্ণ ও সংগঠিত প্রত্যক্ষণ। তা হল প্রাকৃতিক অবস্থায় অথবা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, অধীত বস্তুটির বিষয়গত গুণ-ধর্ম ও সংযোগগুলি প্রতিষ্ঠা ও নথিবদ্ধ করার এক নির্দিষ্ট প্রণালী।

সামান্য ও সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধে জ্ঞান দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উভয়েই বাস্তবায়িত হয় ইন্দ্রিয়জ-বস্তু রূপে। এখানে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষণ আধারে বিষয়ীগত, কিন্তু আধেয়তে বিষয়গত। দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ উভয়েই বাস্তবের বিষয়গত গুণ-ধর্ম ও সংযোগগুলি সম্বন্ধে তথ্য যোগায়, এবং তাদের মধ্যেকার পার্থক্য হল লক্ষ্যে:

দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ চালানো হয় বৈজ্ঞানিক অবধারণার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সূত্রায়িত কোনো লক্ষ্য ছাড়াই, এবং তা নিতান্তই স্থূল প্রায়োগিক লক্ষ্য অনুসরণ করে, পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের একটা সুস্পষ্ট কর্তব্যকর্ম থাকে, তার পদ্ধতি আগে থেকে পরিকল্পিত হয়, এবং তার ফলাফল পরীক্ষিত হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহের দ্বারা। দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের দক্ষতা অর্জন করার একটা ভিত্তি, এবং অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান, দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু নতুন ও অপরিহার্য সেগুলি সম্বন্ধে ব্যক্তিমানুষের সচেতনতাকে তা প্রখর করে। দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ এই কারণেও গুরুত্বপূর্ণ যে তা ঘটে ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে, এবং তাই বাস্তবের প্রক্রিয়া ও ব্যাপারসমূহের মধ্যে নিজের স্থান খুঁজে পেতে সক্ষম করে তোলে।

পদ্ধতি হিসেবে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ কোনো তত্ত্ব বা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। হঠাৎ দেখা দিতে পারে এমন সব ঘটনা নথিবদ্ধ করা তার কাজ নয়, বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আবশ্যিক ঘটনাসমূহ অথবা প্রকল্প বা তত্ত্বটির আদি প্রতিজ্ঞাগুলির সঙ্গে মেলে না এমন সব আমূল নতুন ঘটনার শ্রেণীবদ্ধকরণ ও সচেতন নির্বাচন তাতে পূর্বানুমিত। প্রথমোক্ত ধরনের ঘটনাগুলি যেখানে একটি বিশেষ অনুমিতিকে প্রতিপাদন বা খণ্ডন করে, সেখানে দ্বিতীয়োক্ত ধরনের ঘটনাগুলির মধ্যে থাকতে পারে নতুনের, ভবিষ্যতের উপাদানগুলির বীজ।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি আয়ত্ত করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অধীতব্য বস্তু, প্রক্রিয়া বা ব্যাপারটির গুণ-ধর্ম ও সংযোগগুলি সম্বন্ধে রীতিমত ব্যাপক পরিসরের উপাত্ত সংগ্রহ করতে তা সাহায্য করে। এই তথ্য পরবর্তীকালে ব্যবহারিক সামাজিক সমস্যাগুলির তত্ত্বগত বিশ্লেষণ, সূত্রায়ণ ও সমাধানের সারবান ভিত্তি যোগায়। কোন কোন ধরনের তথ্য ও কত তথ্য গবেষক নথিবদ্ধ করতে, শ্রেণীবদ্ধ করতে ও অবধারণামূলক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, অনেকাংশে তারই উপরে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির কার্যকরতা নির্ভর করে।

পরবর্তী তত্ত্বগত বিশ্লেষণের জন্য, লব্ধ তথ্যগুলিকে সেগুলির বিষয়গত জ্ঞাতব্য তথ্যের পরিমাণ ও অভিনবত্ব দিয়ে, সেগুলিতে ব্যক্ত গুণ-ধর্ম ও সংযোগগুলির বৈশিষ্ট্য, গবেষণার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সেগুলির মিল, ও তত্ত্বগত অবধারণার সঙ্গে সেগুলির সংযোগ দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হলেও, গভীর জ্ঞান লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তা বস্তু ও ব্যাপারসমূহের কিছু কিছু বাহ্যিক সংযোগ ও গুণ-ধর্ম সনাক্ত ও নথিবদ্ধ করতে সাহায্য করে শুধু, কিন্তু সেগুলির চরিত্র, অন্তঃসার ও বিকাশের প্রবণতা উদ্ঘাটন করতে পারে না। তা সীমিতও বটে, কারণ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াসমূহে সক্রিয় হস্তক্ষেপ তার সঙ্গে জড়িত নয়। সেটা করা হয় অন্যান্য অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতির সাহায্যে: পরিমাপ, এবং আরও বেশি মাত্রায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে।

পরিমাপ এক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতামূলক ক্রিয়া, যা গবেষককে সক্ষম করে মান হিসেবে নেওয়া আরেকটি বস্তুর তুলনায় বস্তুটির পরস্পরসম্পর্ক বা পরিবর্তন নির্ণয় করতে। পরিমাপ পদ্ধতির একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল অধীতব্য বস্তু, ব্যাপার বা প্রক্রিয়াসমূহের পরিমাণগত দিকের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সংযোগ। কিন্তু পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যগুলি নথিবদ্ধ করার ফলে বিবেচ্য বস্তুটির বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সেটির গুণের সঙ্গে সেগুলির সংযোগ উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়।

পরিমাপের সাহায্যে বস্তু ও ব্যাপারসমূহের বিষয়গত পরিমাণগত চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য, গুণ-ধর্ম ও সম্পর্ক অনুসন্ধান গবেষককে সেগুলির গুণ সম্বন্ধে উন্নততর জ্ঞান অর্জন করতে এবং পরিবর্তনের সামান্য প্রবণতা নির্ধারণ করতে সক্ষম করে তোলে। তত্ত্বগত জ্ঞানের স্তরে সেই তথ্যের ব্যবহার সেগুলির চরিত্র ও অন্তঃসার হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে।

বৈজ্ঞানিক অবধারণা একটি ব্যাপারকে 'প্রক্রিয়াটির স্বাভাবিকতায় ব্যাপারটির ঘটমানতা নিশ্চিত করার মতো অবস্থায়'* পর্যবেক্ষণ করা প্রায়শই প্রয়োজনীয় করে তোলে। এটা করা হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল অবধারণার এক পদ্ধতি, যখন আপেক্ষিকভাবে 'বিশুদ্ধ' রূপে একটি প্রক্রিয়াকে সনাক্ত ও পরীক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি হয় তার

---

* Karl Marx, *Capital,* Vol. I, p. 19.

অবস্থা, গতিমুখ বা চরিত্রের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, গবেষককে কতকগুলি শর্ত অবশ্যই মেনে চলতে হয়। প্রথমত, অধীতব্য বস্তু, প্রক্রিয়া বা ব্যাপারটি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান তার থাকা দরকার। সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর লক্ষ্য, পদ্ধতি ও উপায় নির্ধারণ করে। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সে লব্ধ তথ্যগুলি পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ ও নথিবদ্ধ করে, সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে, পরিসংখ্যানগত হিসাব-নিকাশ করে, এবং পরবর্তী তত্ত্বগত বিশ্লেষণের জন্য সারণি তৈরি করে, নকশা ও অনুচিত্র রচনা করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি বড় সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল কোনো প্রকল্প বা তত্ত্বের সঙ্গে তার সংযোগ, তার বক্তব্যগুলির তত্ত্বগত প্রতিপাদন, এবং পরবর্তী অবধারণা প্রক্রিয়ায় তার ফলগুলির অন্তর্ভুক্তি।

পদ্ধতির মতো, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সামাজিক ব্যাপারসমূহ অধ্যয়নে সর্বদা ব্যবহৃত হতে পারে না। নৈতিক, নীতিবিদ্যাগত নীতিসমূহের দরুন সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্ভাবনা প্রায়শই বাতিল হয়। অধিকাংশ সামাজিক ব্যাপার ও প্রক্রিয়া একটি ল্যাবরেটরিতে পুনরুপস্থিত করা যায় না অথবা একাধিকবার সেগুলির পুনরাবৃত্তি করা যায় না। 'বিশুদ্ধ' রূপে, সেগুলির রাজনৈতিক-শ্রেণীগত ও ভাবাদর্শগত বনিয়াদ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সেগুলিকে পরীক্ষা করা যায় না। তা সত্ত্বেও, আমাদের কালে সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভূমিকা বেড়ে চলেছে।

যেমন, উন্নয়নশীল সমাজতন্ত্রে বৈষয়িক উৎপাদন ক্রমেই বেশি করে শিল্পগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারায় বিকশিত হয়, এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শিল্পোৎপাদনের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়। গোটা এক-একটা উদ্যোগ, বড় বড় বিশেষীকৃত খামার ও গবাদি পশু-পালন সমাহারে প্রবর্তন করা হয় উৎপাদন সংগঠনের নতুন নতুন রূপ, নতুন প্রযুক্তি, কাজ করার বৈষয়িক ও নৈতিক প্রণোদনা, ইত্যাদি।

নতুন দেখা-দেওয়া ব্যবহারিক সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিরীক্ষামূলক গবেষণার একটি উপাদান সর্বদাই থাকে। সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি এই জন্যও গুরুত্বপূর্ণ যে সেগুলির ফলে ব্যবহারিক সামাজিক সমস্যাবলীর জন্য বিভিন্ন সমাধানের কার্যকরতা কর্মপ্রয়োগে যাচাই করা সম্ভব হয়, এবং তাই সারা দেশ, তার বিভিন্ন অঞ্চল, বা অর্থনীতির পৃথক পৃথক শাখার পরিসরে তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত এড়ানো যায়।

৩। অবধারণার তত্ত্বগত পদ্ধতি

অবধারণার ক্ষেত্রে বিমূর্ত থেকে মূর্ততে আরোহণের পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতির ফলে বাস্তবের বস্তু ও ব্যাপারসমূহের অন্তঃসার সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞানলাভ ঘটে, বিষয়গত সত্যকে জানা যায়।

অবধারণার প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল বাস্তবের এক পূর্ণতর, সর্বাঙ্গীণ ও মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রতিফলন। ইন্দ্রিয়জ অবধারণার পর্যায়ে, যে পারিপার্শ্বিক বাস্তব তার বহুবিধ গুণ-ধর্ম ও গুণে মূর্ত হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে, তা বহু সংযোগ ও সম্পর্কের মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রতিফলিত। কিন্তু বাস্তবের সেই প্রতিফলন ও অবধারণা হল স্বতঃস্ফূর্ত ও অভিজ্ঞতামূলক, তা বেষ্টন করতে পারে শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যিক দিকগুলিকে, সংযোগ ও সম্পর্কগুলিকে, পক্ষান্তরে বাস্তবের নিয়ম-শাসিত সংযোগগুলির অন্তঃসার উদ্‌ঘাটন করা যায় একমাত্র বিমূর্ত চিন্তনের মধ্য দিয়ে।

অবধারণার দ্বান্দ্বিকতা বিমূর্ত ও মূর্তের দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বস্তুজগতের অবধারণা শুরু হয় তার ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষণ দিয়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগত অবধারণার প্রস্থান-বিন্দুটি রয়েছে ইন্দ্রিয়জ-মূর্তের এক দ্বান্দ্বিক নিরাকরণের মধ্যে, বিমূর্তনে এক উত্তরণের মধ্যে।

বিমূর্তন বস্তুটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সারগত গুণ-ধর্ম, দিক ও সমানুবর্তিতাগুলি আলাদা করে বেছে নিতে, এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অনধিগম্য আভ্যন্তরিক সংযোগ ও সম্পর্কগুলির গোপন ক্ষেত্রটি ভেদ করতে সাহায্য করে। লেনিন লিখেছেন: 'মূর্ত থেকে বিমূর্তে অগ্রসরমান চিন্তা — যদি তা সঠিক হয় — ... সত্য থেকে দূরে সরে যায় না বরং তার কাছাকাছি আসে। বস্তুর, প্রকৃতির একটি নিয়মের বিমূর্তন, মূল্য, প্রভৃতির বিমূর্তন, সমস্ত বৈজ্ঞানিক (সঠিক, গুরুতর, উদ্ভট

নয়) বিমূর্তনই প্রকৃতিকে আরও গভীরভাবে, সত্যভাবে ও **সম্পূর্ণভাবে** প্রতিফলিত করে।'*

বৈজ্ঞানিক অবধারণার প্রারম্ভিক বিন্দুতে বিমূর্তন একটি বস্তুর মানসিক পুনরুপস্থাপন সম্ভব করে তোলে সেটির সমস্ত বুনিয়াদি সংযোগ ও সম্পর্ক সহ। বিমূর্ত ধারণাগুলির সাহায্যে বস্তুটির এক অখন্ড মানসিক ভাবরূপের এই পুনরুপস্থাপনাকে বলা হয় বিমূর্ত থেকে মূর্ততে আরোহণ (বা অগ্রগমন)।

তাই, অবধারণার প্রক্রিয়ার দুটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ে আছে ইন্দ্রিয়জ-মূর্ত থেকে বিমূর্তে আরোহণ: বস্তু ও ব্যাপারসমূহের এক তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষণ, ব্যবচ্ছেদ, বিশ্লেষণ ও বিমূর্তনসমূহ গঠন। দ্বিতীয় পর্যায়ে, বস্তুটি তার অখন্ডতায় মানসিকভাবে পুনরুপস্থাপিত হয় মূল প্রত্যয়গুলির শাসনাধীনকরণের ভিত্তিতে, এবং তার অন্তঃসার ও সমানুবর্তিতাগুলি সম্বন্ধে এক মূর্ত-নির্দিষ্ট জ্ঞান গড়ে ওঠে। মার্কস লিখেছেন: 'মূর্ত ধারণাটি মূর্ত, কারণ তা বহু সংজ্ঞার্থের সমন্বয়, তাই তা বিভিন্ন দিকের ঐক্যের পরিচায়ক। সুতরাং, বিচারবুদ্ধিতে তা প্রতিভাত হয় সারনির্যাস হিসেবে, ফল হিসেবে, যাত্রাস্থল হিসেবে নয়, যদিও তা হল আসল উৎসস্থল, এবং তাই, উপলব্ধি ও কল্পনার উৎসস্থলও। প্রথম পন্থা ভাবরূপগুলিকে পর্যবসিত করে বিমূর্ত সংজ্ঞার্থে, দ্বিতীয়টি বিচারের

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 38, p. 171.

মধ্য দিয়ে বিমূর্ত সংজ্ঞার্থগুলি থেকে মূর্ত অবস্থিতি পুনর্গঠন করে।'*

অবধারণায়, বিমূর্ত হল বাস্তবে ও চিন্তনে মূর্তের মাঝখানে এক মধ্যবর্তী পর্যায়। একমাত্র তারই মধ্য দিয়ে ও তারই সাহায্যে অবধারণা অগ্রসর হয় ইন্দ্রিয়জ-মূর্ত থেকে চিন্তনে মূর্তের দিকে। ইন্দ্রিয়জ-মূর্তের বিমূর্ত সংজ্ঞার্থগুলির এক সংশ্লেষণই হল চিন্তনে মূর্তকে পুনরুপস্থাপিত করার, মূর্ত জ্ঞান লাভ করার একমাত্র উপায়।

ইন্দ্রিয়জ-মূর্ততে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সারগত দিক, সংযোগ ও সম্পর্কগুলিকে বিমূর্তনসমূহই আলাদা করে বেছে নেয়। একটি বস্তু বা বাস্তবের একটি ব্যাপারের আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ অনুসরণ করাকে সেগুলি সম্ভব করে তোলে। বিমূর্তন হল পরবর্তী মূর্তকরণের, চিন্তনে বাস্তবের এক উপযুক্ত প্রতিফলনের শর্ত। একটি বস্তু বা ব্যাপারের মানসিক পুনরুপস্থাপন মূর্ত বিষয়টির অন্তঃসার ও সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়।

শিক্ষার মধ্য দিয়ে জ্ঞানাহরণ আর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে জ্ঞানাহরণের সমাপতন ঘটে না। মার্কস লিখেছেন, 'পুনরুপস্থাপনের পদ্ধতিটি অনুসন্ধানের পদ্ধতি থেকে রূপের দিক দিয়ে অবশ্যই আলাদা হতে হবে। শেষোক্তটিকে বিশদে বস্তু-উপকরণটি উপযোজন করতে হয়, তার বিকাশের বিভিন্ন

---

* কার্ল মার্কস, অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৩, পৃঃ ২২৭-২৮।

রূপ বিশ্লেষণ করতে হয়, সেগুলির আন্তর সংযোগ বার করতে হয়। একমাত্র এই কাজটি করার পরেই, প্রকৃত গতিটি যথোপযুক্তভাবে বর্ণনা করা যায়।'*

শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানুষ জ্ঞান আত্মস্থ করে, সেখানে বস্তু-উপকরণটি গবেষিত ও কোনো বিশেষ প্রণালীতন্ত্রে উপস্থাপিত হয়। ধরে নেওয়া হয় যে অভিজ্ঞতামূলক অবধারণা ও মূল বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি আয়ত্ত করার পর্যায়টি এর আগেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। মূর্ত অভিজ্ঞতামূলক উপকরণের বিশদ বিশ্লেষণ এবং বিমূর্তনগুলির, মূল ধারণাগুলির সূত্রায়ণ শিক্ষণ-বস্তুতে প্রতিফলিত হতে পারে শুধু আংশিকভাবে, অথবা আদৌ হতে পারে না। মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে বেশির ভাগই বিমূর্ত থেকে মূর্ততে আরোহণের আশ্রয় নেন, যদিও মূর্ত থেকে বিমূর্তে একটা গতিও একেবারে বাদ পড়ে না। দেখা যায়, মূর্তের (পণ্য, বিনিময়, দাম, ইত্যাদি) এক বিশ্লেষণ থেকে মার্কস কীভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন বিমূর্তের (মূল্য, উদ্বৃত্ত-মূল্য, ইত্যাদি) দিকে এবং তার পরে সমাজে দৈনন্দিন জীবনের প্রকৃত সম্পর্কগুলি (বাণিজ্যিক মুনাফা, সুদের হার, ইত্যাদি) প্রকাশ করার দিকে।

নতুন সামাজিক ব্যাপারসমূহের অবধারণায় প্রথম তথা দ্বিতীয় পর্যায়টি ব্যবহার করার সম্ভাবনা বাতিল হয় না। মূর্ত ও বিমূর্তের দ্বান্দ্বিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান

---

* Karl Marx, *Capital,* Vol. I, p. 28.

বৈজ্ঞানিক অবধারণার, সৃষ্টিশীল চিন্তনের একটা বড় শর্ত। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অধ্যয়ন করে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির মূল প্রত্যয়, ধারণা ও বিমূর্তনগুলি আয়ত্ত করা যায়, সরলতম ও প্রাথমিকতম থেকে শুরু করে জটিলতম পর্যন্ত এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক ধারণার গঠন ও সেগুলি শাসনাধীনকরণের দ্বান্দ্বিকতা বোঝা নিশ্চিত করা যায়। সেগুলির যুক্তিগত আধেয় ও আয়তন, অন্যান্যের সঙ্গে সেগুলির সংযোগ ও পরস্পরসম্পর্ক জানা ও নির্ধারণ করতে পারা গুরুত্বপূর্ণ। ইন্দ্রিয়জ-মূর্ত থেকে বিমূর্ততে এবং তার পরে মানসিকভাবে মূর্তের দিকে অগ্রগমনকে সনাক্ত করার সামর্থ্য দ্বান্দ্বিক চিন্তনের বিকাশের জন্য আরেকটি শর্ত।

বৈজ্ঞানিক অবধারণার প্রক্রিয়ায় আবশ্যিকভাবেই অন্তর্ভুক্ত থাকে **যুক্তিগত ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির** ব্যবহার, যার ফলে বিমূর্ত থেকে মূর্ততে অগ্রসর হওয়া এবং মূর্ত-নির্দিষ্ট জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়।

বস্তুটির ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে বিমূর্ত থেকে মূর্ততে অগ্রগমনের কীভাবে সমাপতন ঘটে, সেই প্রশ্নটি হল অবধারণায় যুক্তিগত ও ঐতিহাসিকের মধ্যে পরস্পরসম্পর্কের দিকগুলির একটি প্রশ্ন। মার্কস সেই প্রশ্নের উত্তরের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন: 'যে বিমূর্ত বিচার-পদ্ধতি সরলতম থেকে জটিলতর ধারণাগুলির দিকে অগ্রসর হয় তা সেই পরিমাণেই প্রকৃত ঐতিহাসিক বিকাশানুগ।'*

---

* কার্ল মার্কস, অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৩, পৃঃ ২২৯।

বিষয়গত সত্য অর্জনের জন্য এবং বাস্তবের বস্তু, ব্যাপার ও প্রক্রিয়াসমূহ সম্বন্ধে মূর্ত-নির্দিষ্ট জ্ঞান লাভের জন্য, সেগুলির অন্তঃসার উদ্ঘাটন করা ও সেগুলির আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ সনাক্ত করা, উভয়টিই প্রয়োজন। সেই দ্বিবিধ কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের নিহিতার্থ হল যুক্তিগত ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির ঐক্য।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির কাজ হল বিকাশের বিষয়গত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, তার শর্ত ও পূর্বশর্তগুলি, তার কালপরম্পরা ও বহিঃপ্রকাশের মূর্ত রূপগুলিকে চৈতন্যের মধ্যে পুনরুপস্থাপিত করা।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির বিপরীতে, যুক্তিগত পদ্ধতির কাজ হল বাস্তবের বস্তু ও ব্যাপারসমূহকে বিমূর্তনের এক প্রণালীতন্ত্রের সাহায্যে তত্ত্বগত রূপে পুনরুপস্থাপিত করা। এখানে যেটা পুনরুপস্থাপিত হয়, তা হল বস্তুটির অন্তঃসার, প্রধান আধেয়, সাধারণ সমানুবর্তিতা, তার বিকাশের গতিমুখ ও পারম্পর্য।

বৈজ্ঞানিক অবধারণা অনুমান করে নেয়, এক দিকে, ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় যে কোনো বস্তুর অধ্যয়ন, এবং অন্য দিকে, তার বিকাশের যুক্তির ভিত্তিতে সেটির অধ্যয়ন। এখানে যা ঐতিহাসিক তা হল যেটা যুক্তিগত তার আধেয়, এবং যা যুক্তিগত তা উদ্ঘাটন করে ঐতিহাসিকের গঠনকাঠামো ও সমানুবর্তিতাগুলিকে।

যুক্তিগত ও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অন্তঃসার সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সেগুলি ব্যবহারের উপরে প্রধান গুরুত্ব আরোপই দ্বান্দ্বিক চিন্তনের বিকাশের পক্ষে, এবং সামগ্রিকভাবে বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক

প্রশিক্ষণের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অধ্যয়নের নিহিতার্থ হল উভয় পদ্ধতিরই ব্যবহার।

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন হল পৃথিবী সম্বন্ধে ও সেখানে মানুষের স্থান সম্বন্ধে কঠোরভাবে বিজ্ঞানসম্মত এক মততন্ত্র, এবং বিধিগ্রন্থগুলিতে তার উপস্থাপন হল তত্ত্বগত অর্থাৎ, যুক্তিগত। স্বভাবতই, এতে এটা বোঝায় না যে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল নীতিগুলি বিবৃত করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না কার্যত প্রায় প্রতিটি প্রসঙ্গেই, মূল প্রতিজ্ঞাসমূহ, মূল প্রত্যয় ও নিয়মগুলির যুক্তিগত উপস্থাপনাকে অবধারণার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সেগুলির বিকাশের এক উপস্থাপনার সাহায্যেই মূর্ত করা হয়। যেমন, 'বস্তু ও তার অস্তিত্বের রূপসমূহ' প্রসঙ্গটি অধ্যয়ন করার সময়ে শিক্ষার্থী শুধু যে জ্ঞানের বর্তমান স্তরের সঙ্গে, বস্তু, গতি, স্থান, কাল, ইত্যাদি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির সঙ্গেই পরিচিত হয় তাই নয়, বস্তুবাদী ও ভাববাদী দর্শনের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সেই দর্শনে এবং বিভিন্ন দার্শনিক ধারা-কর্তৃক সেই সমস্ত মূল প্রত্যয় সম্বন্ধে ব্যাখ্যানের সঙ্গেও পরিচিত হয়।

বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্বন্ধে জ্ঞানের নিহিতার্থ হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এক যুক্তিগত সুসমঞ্জস মততন্ত্র হিসেবে তার আত্তীকরণ। মূল তত্ত্বগত প্রতিজ্ঞাগুলির যুক্তিগত অন্তর্বস্তু কত ভালোভাবে আত্তীকৃত হয়েছে, সেটা অনেকাংশে নির্ভর

করে বাস্তবের সঙ্গে, সামাজিক-ঐতিহাসিক কর্মপ্রয়োগের সঙ্গে সেগুলির সংযোগের উপরে। তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান ও বাস্তব প্রক্রিয়া ও ব্যাপারসমূহ বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে তা ব্যবহার করার সামর্থ্য অবশ্যই নির্ভর করবে অবধারণার যুক্তিগত ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির এক ঐক্যের উপরে। এই পদ্ধতিগুলির ব্যবহার যত সচেতন হবে, জ্ঞানাহরণ ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ তত কার্যকর হবে।

মূর্তের দিকে অগ্রগমন, বস্তুটিকে তার সংযোগ ও সম্পর্কের বৈচিত্র্যে ও পূর্ণতায় পুনরুপস্থাপিত করাটা এক জটিল বিশ্লেষণী-সংশ্লেষণী প্রক্রিয়া।

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ হল অবধারণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। বিশ্লেষণী-সংশ্লেষণী ক্রিয়া সমগ্র অবধারণামূলক প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করে এবং তা হল চিন্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এঙ্গেলস লিখেছেন: 'চিন্তা হল ঠিক ততখানিই চৈতন্যের লক্ষ্যবস্তুগুলিকে সেগুলির উপাদানসমূহে বিশ্লিষ্ট করা, যতখানি সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলিকে একত্র করে এক ঐক্যে পরিণত করা।'*

বিশ্লেষণ হল মানসিকভাবে সমগ্রকে সরলতর অঙ্গীয় অংশ, দিক ও গুণ-ধর্মে পৃথকীকরণ, সেগুলির উদ্দেশ্যপূর্ণ ও প্রণালীবদ্ধ অধ্যয়ন। সংশ্লেষণ হল বিশ্লেষিত পৃথক পৃথক অংশ, দিক ও উপাদানগুলির এক মানসিক সম্মিলন ও পুনরুপস্থাপন, এবং সমগ্রকে তার ঐক্যে হৃদয়ঙ্গম করা।

---

* Frederick Engels, *Anti-Dühring,* p. 56.

অবধারণা কালে, বস্তু বা ব্যাপারটিকে তার বিভিন্ন দিক, গুণ-ধর্ম, সংযোগ ও সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, সেগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে বিমূর্তনের সাহায্যে মানসিকভাবে ব্যবচ্ছেদ করা হয়। বিভিন্ন অঙ্গীয় অংশে বস্তুটির মানসিক ব্যবচ্ছেদ ও সেগুলির পরীক্ষা গবেষককে সক্ষম করে তোলে সবচেয়ে আবশ্যকীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও আভ্যন্তরিক জিনিসগুলিকে গৌণ, আপতিক ও বাহ্যিক জিনিসগুলি থেকে পৃথক করে সেগুলিকে তাদের সমস্ত বৈচিত্র্যে বেছে নিতে। এই ধরনের মানসিক ক্রিয়া সারগতভাবে সামান্য যে জিনিসটি সমস্ত বহুবিধ উপাদানকে বস্তুটির গুণগত নির্ধারকতায় ঐক্যবদ্ধ করে সেই সামান্য জিনিসটি উদ্ঘাটন করা সম্ভব করে তোলে।

অবধারণামূলক প্রক্রিয়া অবশ্য বিশ্লেষণের সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় না, তা এগিয়ে চলে বস্তুটির এক মানসিক পুনঃস্থাপনের দিকে, বিচিত্রের ঐক্য হিসেবে মূর্তটির এক পুনরুপস্থাপনার দিকে।

সংশ্লেষণ হল বিশ্লেষণের যুক্তিগত অনুবৃত্তি, তার অন্য দিক। উপাদানগুলিকে শাসনাধীন করার ভিত্তিতে বিমূর্ত মূল প্রত্যয়সমূহে প্রকাশিত বিশ্লেষিত উপাদানগুলিকে মানসিকভাবে একত্র বিন্যস্ত করতে তা সাহায্য করে।

অবধারণার সামান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণকে পৃথক করা যায় না। সমগ্রকে বোঝার জন্য, বিশ্লেষণের সাহায্যে তার অংশগুলি অধ্যয়ন করা দরকার, পক্ষান্তরে, অংশগুলির ভূমিকা ও

ক্রিয়াসমূহ বোঝা যেতে পারে একমাত্র সংশ্লেষণের সাহায্যে সমগ্রের অবধারণার মধ্য দিয়েই। বিশ্লেষণ ইন্দ্রিয়জ-মূর্ত থেকে বিমূর্ততে অগ্রসর হতে গবেষককে সাহায্য করে, এবং সংশ্লেষণ সাহায্য করে বিমূর্ত থেকে মানসিকভাবে মূর্তের দিকে অগ্রসর হতে। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের ঐক্যের উপরে জোর দিয়ে লেনিন লিখেছেন: '... বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের মিলন — পৃথক অংশগুলির বিখন্ডন এবং সার্মাগ্রিকতা, এই অংশগুলির সমাহার।'*

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের ব্যবহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যে কোনো তত্ত্বগত বা ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানেও তা ব্যবহৃত হয়। শিক্ষায়, লব্ধ তথ্যাদির বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণও ব্যবহৃত হয় গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে।

দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অধ্যয়নে, বিশ্লেষণ ব্যবহৃত হয় নতুন তথ্য লাভ করার জন্য, তা বিখণ্ডিত করে বিশদ দিয়ে পূর্ণ করার জন্য এবং মূল ধারণা ও প্রত্যয়গুলির যুক্তিগত আয়তন ও আধেয় নির্ধারণ করার জন্য। সংশ্লেষণ ব্যবহৃত হয় সামান্যীকৃত ধারণাগুলি সূত্রবদ্ধ করার জন্য, ভাবধারণাগুলির মধ্যেকার যুক্তিগত সংযোগ প্রকাশ করার জন্য, এবং অধীত বস্তু বা ব্যাপারটির যথাসম্ভব পূর্ণতম চিত্র পুনরুপস্থাপিত করার জন্য। বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণী-সংশ্লেষণী প্রক্রিয়ণ চালানো হয় সার্মাগ্রিকভাবে বিষয়টির কাঠামোর মধ্যে তথা প্রতিটি একক বিষয়ের

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 38, p. 221.

মধ্যে। প্রতিটি বিষয় অধ্যয়নের ফলাফল, তার প্রধান প্রধান ভাবধারণা ও প্রতিজ্ঞার সংশ্লেষণ অবধারণার চূড়ান্ত সীমা নয়, কেননা এই সংশ্লেষিত ফলগুলি উচ্চতর স্তরে অন্যান্য বিষয় অধ্যয়নে বিশ্লেষণাধীন হতে পারে।

অধ্যয়নের উপকরণের বিশ্লেষণী-সংশ্লেষণী প্রক্রিয়ণ তার সৃষ্টিশীল আত্তীকরণের একটি শর্ত। এই উপকরণের বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও প্রণালীবদ্ধকরণ দ্বান্দ্বিক চিন্তনের বিকাশ ঘটায়, পক্ষান্তরে যান্ত্রিক মুখস্থবিদ্যা অকার্যকর হয়: একটা সীমা পর্যন্ত তা একজন লোকের স্মৃতিশক্তিকে সমৃদ্ধ করতে পারে, কিন্তু তার পরে সেটা হয়ে উঠবে তার বোঝাস্বরূপ। মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন আয়ত্ত করার ব্যাপারে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ব্যবহার করার অক্ষমতার অন্যান্য বিরূপ পরিণতিও হতে পারে, সেগুলির মধ্যে আছে তার ছকবাঁধা ও মতান্ধ আত্তীকরণ।

এই পদ্ধতিগুলির একটিকে পরম করে তোলা ও অন্যটির উনমূল্যায়ন করাও সমান বিপজ্জনক। সত্যকার বৈজ্ঞানিক অবধারণার জন্য বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণকে সেগুলির ঐক্যে ব্যবহার করা দরকার। বিশ্লেষণের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলে অখন্ড, মূর্ত জ্ঞান লাভ করা যায় না, কিংবা পরীক্ষাধীন বস্তু, প্রক্রিয়া বা ব্যাপারটির অন্তঃসার বোঝা যায় না। এবং বিশ্লেষণ ছাড়া সংশ্লেষণের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলে অবধারণা একটা অনির্দিষ্ট ও প্রায়শই অর্থহীন কাজে পরিণত হয়।

মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্ব অধ্যয়নে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সঠিক ব্যবহার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-প্রণালী হিসেবে তার সুনির্দিষ্টতাগুলি দিয়ে নির্ধারিত হয়। বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণমূলক চিন্তন বস্তুবাদী ডায়া-লেকটিকসের আধেয় ও ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী উপলব্ধিকে সবচেয়ে ভালোভাবে পূরণ করে। দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অধ্যয়নে সচেতন বিশ্লেষণী-সংশ্লেষণী ক্রিয়া শিক্ষাগত সমস্যাবলীর সফলতম সমাধান নিশ্চিত করে। বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণমূলক চিন্তনের সামর্থ্য ও দক্ষতা বিকশিত ও শক্তিশালী করা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা মানুষকে তা সৃষ্টিশীলভাবে সমাজবিকাশের ব্যবহারিক কর্তব্যকর্ম-গুলির মোকাবিলা করতে সক্ষম করে তোলে।

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের পাশাপাশি, অবধারণায় একটি বড় ভূমিকা অধিকার করে **আরোহ ও অবরোহ**।

আরোহ ও অবরোহ হল নতুন জ্ঞান লাভের বিপরীত দুটি রূপ। আরোহ হল পৃথক পৃথক তথ্য থেকে এক সামান্য প্রতিজ্ঞায়, অপেক্ষাকৃত কম সামান্য থেকে অধিকতর সামান্য জ্ঞানের দিকে চিন্তার একটা গতি, আর অবরোহ হল সামান্য থেকে বিশেষের দিকে চিন্তার একটা গতি। আরোহ প্রারম্ভিক প্রস্থানসূত্রগুলি থেকে এক ব্যাপকতর, সামান্যীকরণমূলক সিদ্ধান্ত টানা সম্ভব করে তোলে, আর অবরোহী অনুমানগুলি প্রারম্ভিক প্রস্থানসূত্রগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সামান্য।

আরোহী পদ্ধতি অবধারণা প্রক্রিয়ার

প্রারম্ভিক পর্যায়গুলিতে, যখন মানুষ প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা অনুধাবন করে, তথ্য ও উপাত্ত সঞ্চয় ও সামান্যীকৃত করে, একটি প্রকল্প সূত্রবদ্ধ করে ও সেটি যাচাই করে তখন কার্যকর হয়। এই পদ্ধতির অন্যতম গুণ এই যে এমন কি একটিমাত্র, বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতেই বিশ্লেষণ ও সামান্যীকরণের জন্য তা ব্যবহার করা যায়। তার বৈশিষ্ট্য হল স্বতঃপ্রমাণ। আরোহী পদ্ধতির প্রণালীবদ্ধ ব্যবহার মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা, তথ্যগত উপাত্তের সামান্যীকরণ করা, প্রকল্পগুলি উপস্থিত ও যাচাই করার সামর্থ্যকে বিকশিত করে। সেই সঙ্গে, আরোহী পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাগুলি, ফলস্বরূপ লব্ধ জ্ঞানের সমস্যামূলক চরিত্র মনে রাখা দরকার। আরোহের ত্রুটি এই যে অধীত বস্তুটির বিকাশকে তা গণ্য করতে পারে না। এঙ্গেলস লিখেছেন: 'আরোহ যে ধারণাগুলি নিয়ে কাজ করে: প্রজাতি, বর্গ, শ্রেণী, সেগুলি ক্রমবিকাশ তত্ত্বের দ্বারা অ-স্থিরীভূত হয়েছে এবং তাই হয়ে উঠেছে **আপেক্ষিক**; কিন্তু আরোহের জন্য আপেক্ষিক ধারণাগুলি ব্যবহার করা যায় না।'*

অবরোহী পদ্ধতির অন্যতম গুণ এই যে তার সাহায্যে টানা সিদ্ধান্তগুলি কড়াকড়িভাবে প্রদর্শনসাধ্য, এবং ফলস্বরূপ লব্ধ জ্ঞান সত্য ও প্রামাণিক। সত্য প্রস্থানসূত্র থেকে আমরা অবরোহী প্রণালীতে যুক্তিগতভাবে প্রয়োজনীয় অনুসিদ্ধান্ত টানতে পারি।

* Frederick Engels, *Dialectics of Nature*, pp. 227-28.

'আমাদের প্রস্থানসূত্রগুলি যদি ঠিক হয় এবং আমরা যদি চিন্তার নিয়মসমূহকে সেগুলির ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করি, তা হলে ফলটা বাস্তবের সঙ্গে অবশ্যই মিলবে,'* এ কথা লিখেছেন এঙ্গেলস। অবরোহী পদ্ধতি তত্ত্বগত উপকরণটিকে যুক্তিগত শৃঙ্খলাবিন্যাস ও অখণ্ডতা দেয়, তাকে প্রতিপাদন ও প্রণালীবদ্ধ করতে সাহায্য করে। সংশ্লেষণ দিয়ে সম্পূরিত হয়ে অবরোহ গঠিত হয় তত্ত্বের ক্রমবিকাশ অনুযায়ী, বস্তুটির রূপান্তরের ঐতিহাসিক পর্যায়সমূহ অনুযায়ী। এঙ্গেলস লিখেছেন, আমাদের প্রজাতি '[বংশপর্যায়ে] অবরোহণের দ্বারা আরেকটি প্রজাতি থেকে আক্ষরিকভাবেই অবতরণ করেছে'।** কিন্তু অবরোহী পদ্ধতিরও নিজস্ব ত্রুটি আছে। তার মূল সামান্য প্রস্থানসূত্রসমূহের সামগ্রিকতার দ্বারা এবং এই সমস্ত প্রস্থানসূত্র সিদ্ধ করতে তার অক্ষমতার দ্বারা অবরোহের সম্ভাবনাগুলি সীমিত।

অবধারণার প্রকৃত প্রক্রিয়ায়, আরোহ ও অবরোহ থাকে ঐক্যের মধ্যে। এই ঐক্য উভয় পদ্ধতিরই সুফলগুলিকে ব্যবহার করা সম্ভব করে তোলে, একটির সীমাবদ্ধতা পূরণ হয় অপরটির গুণগুলি দিয়ে। আরোহ আবশ্যিকভাবেই অবরোহ দিয়ে সম্পূরিত হয়, এবং শেষোক্তটির উপাদানসমূহ তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। বস্তুসমূহে সদৃশ বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করার মধ্যেই

---

* Frederick Engels, *Anti-Dühring,* p. 399.

** Frederick Engels, *Dialectics of Nature,* p. 227.

তা সীমাবদ্ধ থাকে না, এগুলির মধ্যে যা সারগত সেটাকেও আলাদা করে দেখায় এবং সেগুলির পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্ক প্রকাশ করে, অবরোহের কিছু কিছু উপাদান ছাড়া যা অসম্ভব। আবার তার দিক থেকে অবরোহকে প্রারম্ভিক সিদ্ধান্তসূত্রগুলির সত্য ও সিদ্ধতা গণ্য না করে যুক্তিবিচারের একটি প্রণালী-তে পর্যবসিত করা যায় না; প্রারম্ভিক সিদ্ধান্তসূত্রগুলির সত্য ও সিদ্ধতা আরোহের উপাদানগুলির অন্তর্ভুক্তির দ্বারা নিশ্চিত হয়। সেগুলির আন্তঃসংযোগ ও পরস্পর-নির্ভরশীলতা, এবং অবধারণার প্রক্রিয়ায় সেগুলির ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে, এঙ্গেলস লিখেছেন: 'আরোহ ও অবরোহ সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মতোই আবশ্যিকভাবে একত্র থাকে। অপরটির হানি ঘটিয়ে একটির প্রশংসা করে আকাশে তোলার পরিবর্তে, তাদের প্রত্যেকটিকে তার যথাস্থানে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করা উচিত আমাদের, এবং সেটা একমাত্র করা যেতে পারে এই কথাটি মনে রেখে যে তারা একত্র থাকে, তারা পরস্পরকে সম্পূরিত করে।'*

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন অধ্যয়নের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবরোহের ব্যবহার জড়িত, যখন জ্ঞান অনুমান বলে আহরণ করা হয় লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে। এই পদ্ধতিগুলির উপরে দখল এক দিকে বাস্তবের, দৈনন্দিন ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের তথ্য ও ব্যাপারসমূহকে সামান্যীকৃত করতে সাহায্য করে,

---

* Frederick Engels, *Dialectics of Nature*, p. 288.

অন্য দিকে সামান্য কর্তব্যকর্ম ও প্রতিজ্ঞাসমূহের ভিত্তিতে ব্যবহারিক সমস্যাবলীর মূর্ত-নির্দিষ্ট সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

শিক্ষাবিজ্ঞানগত আরোহ ও অবরোহের পদ্ধতির বিচক্ষণ ব্যবহার শিক্ষায় ও কাজে বিরাট ব্যবহারিক সাহায্য করে। আরোহ ও অবরোহের শিক্ষাবিজ্ঞানগত ব্যবহার অনুমানলব্ধ জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি থেকে পৃথক এইখানে যে তার লক্ষ্য প্রস্থানসূত্রসমূহ থেকে সিদ্ধান্ত টানা নয়, বরং জ্ঞানের একটি একক থেকে আরেকটি এককে যাওয়া, বহুবিধ প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা ব্যাখ্যা করা। অধীত উপকরণ প্রণালীবদ্ধ করে তাকে আরোহী ও অবরোহী উভয়ভাবেই উপস্থিত করা যায়। উপকরণটি যদি পৃথক পৃথক তথ্য থেকে সামান্য প্রতিজ্ঞাসমূহে উত্তরণের মধ্য দিয়ে প্রণালীবদ্ধ ও উপস্থিত করা হয়, তা হলে ব্যবহৃত পদ্ধতিটি হল আরোহী, আর সমস্যাটি যদি সামান্য প্রতিজ্ঞাসমূহ দিয়ে শুরু করে উপস্থিত করা হয় এবং তার সঙ্গে জড়িত থাকে পৃথক পৃথক তথ্যে পরবর্তীকালে উত্তরণ, তা হলে সেই ব্যবহৃত পদ্ধতিটি হল অবরোহী।

বলতে গেলে যে কোনো সমস্যাই আরোহী ও অবরোহী উভয়ভাবেই উপস্থিত করা যায়। পদ্ধতিটি সাধারণত বেছে নেওয়া হয় উপস্থাপনার উদ্দেশ্য অনুযায়ী, খোদ সমস্যাটির সুনির্দিষ্টতা ও যে শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য তা উদ্দিষ্ট তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। সমস্যাটির জনবোধ্য, সহজবোধ্য উপস্থাপনের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে সাধিত হয় আরোহের সাহায্যে,

আর বিবৃত প্রতিজ্ঞাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রদর্শনের জন্য দরকার হয় অবরোহ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অধ্যয়নে এই উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা উচিত, প্রত্যেক বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত সেটিকে, যেটি তার সমস্যাবলীর আধেয় আরও ভালোভাবে বুঝতে, এবং অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তোলে।

আগেই বলা হয়েছে, বৈজ্ঞানিক বিমূর্তনগুলি অবধারণায় এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বিমূর্তনসমূহ গঠনেই অবধারণা-প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না, কেননা অধীতব্য বস্তুটির সমগ্র অন্তঃসার সেগুলি উদ্ঘাটন করতে পারে না। বিমূর্ত চিন্তন হল অসম্পূর্ণ, সামান্য ও অ-দ্বান্দ্বিক, পক্ষান্তরে দ্বান্দ্বিক চিন্তন হল প্রগাঢ়ভাবে বৈজ্ঞানিক, নির্দিষ্ট, সুসংগত ও উপসংহারমূলক, অর্থাৎ, মূর্ত।

আরোহ ও অবরোহের পাশাপাশি, চিন্তাকে মূর্ত করার আরেকটি বড় হাতিয়ার হল **উপমা**। এর সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল একটি বিশেষ থেকে আরেকটি বিশেষে চিন্তার একটা গতি। উপমা আরোহ ও অবরোহের মাঝখানে এক ধরনের মধ্যবর্তী, উত্তরণমূলক স্থান অধিকার করে থাকে।

উপমা হল অনুমানলব্ধ জ্ঞানের একটি রূপ, যেখানে কোনো কোনো দিক দিয়ে বস্তুসমূহের মধ্যে একটা সাদৃশ্যকে অন্যান্য দিক দিয়ে সেগুলির সাদৃশ্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত টানার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ এই যে অধীতব্য বস্তুটির ব্যাপারে এক প্রস্থ প্রাথমিক ক্রিয়া

উপমার পূর্বগামী হওয়া দরকার। এই ক্রিয়াগুলির মধ্যে আছে, প্রথম, বস্তুটির পৃথক পৃথক দিক, গুণ-ধর্ম, সংযোগ ও সম্পর্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান আত্তীকরণ ও সেগুলিকে প্রণালীবদ্ধকরণ; দ্বিতীয়, একটি উপযুক্ত সদৃশ উদাহরণ (মডেল) বাছাই, যার গুণ-ধর্মগুলি সম্পূর্ণতমরূপে অধীত এবং যার সঙ্গে উপমা টানা হবে; এবং তৃতীয়, তুলনীয় বস্তুগুলির অভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি, আর মডেলটি যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও অধীতব্য বস্তুটিতে যে বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরিত হবে, এই দুয়ের মধ্যে আবশ্যিক ও সারগত সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা।

প্রারম্ভিক ও সরলতম পদ্ধতিটি হল বিভিন্ন বস্তু বা ব্যাপারের অভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, প্রথমে, যথাসম্ভব বেশি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করা, এবং দ্বিতীয়, সমস্ত গৌণ ও আপাতিক বৈশিষ্ট্য পৃথক করে এই সমস্ত বস্তু বা ব্যাপারের সারগত, অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্যগুলিতে সাদৃশ্যসমূহ বেছে নেওয়া। অধীতব্য বস্তু, ব্যাপার বা প্রক্রিয়াসমূহের সাদৃশ্য ও প্রভেদগুলি যত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত হয়, উপমা থেকে সিদ্ধান্তটা তত বেশি সারগর্ভ ও সম্ভাব্য হয়।

অন্যান্য গুণ-ধর্ম বা দিকগুলির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বস্তু বা ব্যাপারসমূহের কোনো কোনো গুণ-ধর্ম বা দিকের সাদৃশ্য সম্বন্ধে যে কোনো সিদ্ধান্ত সর্বদাই একটা সম্ভাব্যতা। সদৃশ বস্তু বা ব্যাপারসমূহের ব্যাপক, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও গভীর অধ্যয়ন উপমা থেকে

সিদ্ধান্তসমূহের সম্ভাব্যতা বাড়ানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। অধীতব্য বস্তুগুলি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বেশি পূর্ণ হয়, সেগুলির সংখ্যা তত কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বস্তুগুলি সম্বন্ধে যেখানে ভালোভাবে অনুসন্ধান করা হয় না, সেখানে সেগুলির অন্তঃসার প্রকাশিত হয় না, এবং সেগুলির প্রভেদগুলিকে গণ্য করা হয় না, উপমা থেকে অত্যন্ত সম্ভাব্য সিদ্ধান্তসমূহের কোনো ভিত্তি থাকে না। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে তুলনীয় বস্তুগুলির সম্পূর্ণরূপে সমাপতন নাও ঘটতে পারে। উপমা সেগুলির মিলকে প্রতিষ্ঠা করে শুধু নির্দিষ্ট কোনো কোনো দিক দিয়ে, নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি অনুযায়ী। লেনিন লিখেছেন: 'প্রত্যেক তুলনায় তুলনাকৃত বস্তুসমূহ বা ধারণাগুলির মাত্র একটি দিক বা একাধিক দিকের ব্যাপারে একটা সাদৃশ্য টানা হয়, আর অন্য দিকগুলি সাময়িক পরীক্ষামূলকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে বিমূর্ত করা হয়।'*

উপমার সিদ্ধান্তসমূহ শুধু সম্ভাব্য বলে, উপমা যুক্তিগত প্রমাণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে না। তা সত্ত্বেও, এটি হল অবধারণার সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত অন্যতম পদ্ধতি।

উপমাকে প্রয়োগ করার উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান ও তার বিচক্ষণ ব্যবহার ব্যবহারিক কাজে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সদৃশ প্রক্রিয়াসমূহ ও জীবনের পরিস্থিতিগুলির এক বিশ্লেষণ বিভিন্ন সমস্যার

---

* V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 8, p. 454.

অনুকূলতম সমাধান খুঁজে পাওয়া এবং মূর্ত-নির্দিষ্ট অবস্থায় কীভাবে আচরণ করতে হবে তা স্থির করা সম্ভব করে তোলে। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সামনেকার জরুরি সমস্যাগুলি সমাধানে লেনিন কীভাবে উপমা ব্যবহার করতেন তা দেখাতে গিয়ে নাদেজদা ক্রুপস্কায়া বলেছেন: 'লেনিনের পদ্ধতিটা ছিল **অনুরূপ সব পরিস্থিতি** পরীক্ষা করে মার্কসের রচনাগুলি নেওয়া, সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা ও বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করা, এবং সাদৃশ্য ও প্রভেদগুলি বার করা।'* এক প্রস্থ সাদৃশ্যযুক্ত সূচকের ভিত্তিতে,. একটি প্রক্রিয়া বা ব্যাপারের বিকাশের গতিমুখ আগে থেকে দেখা যায়, এবং অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানো ও তার ইতিবাচক উপাদানগুলিকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তাকে প্রভাবিত করার উপায় ও পন্থা নির্ধারণ করা যায়।

উপমা ব্যবহৃত হয় বাচনিক ও দৃশ্যগত মডেল বা আদল গড়ে তোলার জন্য, যেখানে বিশ্লেষণাধীন এলাকাটিকে উপস্থাপিত করা হয় আরও ভালোভাবে অধীত, জ্ঞাত ও সহজবোধ্য আরেকটি এলাকার সাহায্যে। আরও সিদ্ধ সিদ্ধান্তসমূহ লাভ করার জন্য **মডেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা** ব্যবহৃত হয়। এই ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট বস্তু, প্রক্রিয়া বা ব্যাপারটিকে প্রকৃতই বিদ্যমান বা কাল্পনিক ব্যবস্থাতন্ত্রে, যা অবধারণা-প্রক্রিয়ায় মূলের

---

* নাদেজদা ক্রুপস্কায়া, লেনিন প্রসঙ্গে (সংকলিত বক্তৃতা ও প্রবন্ধ), মস্কো, ১৯৭৯, পৃঃ ৩০৭ (রুশ ভাষায়)।

প্রতিকল্পস্বরূপ ও যা তার অনুরূপ, সদৃশ, সেই ব্যবস্থাতন্ত্রে পরীক্ষামূলক অধ্যয়নের অধীনস্থ করা হয়। 'মডেল তৈরি করাটা হল এমন একটি আদল নির্মাণ, যা মূলের গঠনকাঠামো, আচরণ ও অন্যান্য গুণ-ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহকে, এবং সেটি দিয়ে পরবর্তী নিরীক্ষা, বা তার মানসিক পর্যবেক্ষণকে পুনরূপস্থাপিত করে।'* মডেল বা আদল-নির্মাণ গবেষককে একটি বর্ধিতায়তন বা হ্রস্বীকৃতায়তন আদলের সাহায্যে এমন সমস্ত প্রক্রিয়াকে 'বিশুদ্ধ' রূপে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করতে সক্ষম করে তোলে, যে প্রক্রিয়াগুলি প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। নিরীক্ষার ফলগুলি সামান্যীকৃত হয় এবং মূল বস্তুটিতে অথবা যেটি অধীত হয়েছে সেটির অনুরূপ বস্তুসমূহের গোটা একটা সমষ্টিতে স্থানান্তরিত হয়। মডেল নিরীক্ষাগুলি থেকে টানা সিদ্ধান্তগুলি অত্যন্ত প্রামাণিক। চলমান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব ও বিপুল সামাজিক রূপান্তরগুলির অবস্থায়, মডেল নিরীক্ষাগুলি আরও ব্যাপকতর পরিসরে ব্যবহৃত হচ্ছে শুধু প্রাকৃতিক ও কৃৎকৌশলগত বিজ্ঞানগুলিতেই নয়, বরং সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, ইত্যাদিতেও। সামাজিক কর্ম-প্রয়োগ আদল-নির্মাণকে ক্রমেই আরও বেশি করে সামনে তুলে ধরছে সামাজিক অবধারণার একটি পদ্ধতি হিসেবে এবং সামাজিক বিজ্ঞানের একটা বড় কর্তব্যকর্ম হিসেবে।

---

* দ্রষ্টব্য, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, মস্কো, ১৯৭৪, পৃঃ ১৭৮ (রুশ ভাষায়)।

উপসংহার

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটা বড় তত্ত্বগত অর্জন। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং মানবজাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতে তার স্থায়ী মূল্য বাড়িয়ে দেখানো দরকার হয় না। ব্যতিক্রমহীনভাবে মানবিক ক্রিয়াকলাপের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা পরিব্যাপ্ত: দর্শন ও বিশেষ বিজ্ঞানসমূহ, বৈষয়িক ও আত্মিক উৎপাদনের সকল ধারায়।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের মূল নীতিগুলির একটা সংক্ষিপ্ত ও জনবোধ্য পরিচয়-দান থেকেও, বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তার অপরিসীম গুরুত্ব, তার নীতি, নিয়ম ও মূল প্রত্যয়গুলির পদ্ধতিতত্ত্বগত ভূমিকা, সেগুলির বৈধতা ও কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক চরিত্র, বৈজ্ঞানিক

অবধারণা ও তার ভিত্তিতে কর্মপ্রয়োগের জন্য সেগুলির বিষয়গত প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করে। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে ও বৈজ্ঞানিক অবধারণা আর তার ফলস্বরূপ কর্মপ্রয়োগের পদ্ধতি-তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে জীবনের ক্ষেত্রে কত প্রাসঙ্গিক, তার সবচেয়ে জাজ্বল্যমান কয়েকটি বহিঃপ্রকাশ এখানে তুলে ধরা হল।

প্রথম, বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস হল প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তনের সবচেয়ে সামান্য নিয়মগুলির এক বিজ্ঞান, এই সমস্ত ক্ষেত্রেই বিকাশের বিষয়গত সমানু-বর্তিতাগুলি তাতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিফলিত। বিজ্ঞান ও কর্মপ্রয়োগকে তা যোগায় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতত্ত্ব; সেগুলিকে অভিমুখী করে তোলে যা কিছু নতুন, প্রগতিশীল ও বিকাশমান, তার দিকে।

দ্বিতীয়, ইতিহাসবাদের নীতি সুসংগতভাবে ব্যবহার করে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস মানবজাতির প্রগতির সীমাহীন পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে, এবং প্রগতিশীল শ্রেণীর অবস্থানসমূহ থেকে, সমস্ত জনগণের চৈতন্যকে অভিমুখী করে ভবিষ্যতের দিকে, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের দিকে, যখন সামাজিক সত্তার বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুলি সম্পূর্ণরূপে সমাধান হবে।

তৃতীয়, অন্য সমস্ত দার্শনিক মতবাদ থেকে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের পার্থক্য এইখানে যে তা হল বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক প্রগতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নিয়ম ও মূল প্রত্যয়গুলির এক বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিপাদিত ও যুক্তিগতভাবে আন্তঃসংযুক্ত, অঙ্গাঙ্গী

মততন্ত্র, যে মততন্ত্র ইতিহাসের ধারায় বিকশিত হয়ে চলে। প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তনের ক্ষেত্রে বিকাশকে সবচেয়ে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে, এমন বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস নিজেকে পরিবর্তিত, বিকশিত ও সমৃদ্ধ করে চলে, তার মূল প্রত্যয়গত যন্ত্রটিকে পূর্ণ করে, নতুন নতুন ধারণা প্রবর্তন করে, এবং পুরনো ধারণাগুলিকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে।

মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের ক্ষেত্রে, বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস হল বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতত্ত্বগত মর্মমূল, যা পৃথিবীর বিকাশের সার্বিক নিয়মগুলি ও মানুষ-কর্তৃক তার অবধারণাকে প্রকাশ করে। এখানে তা উন্মোচিত হয় ক্রমবিকাশের এক তত্ত্ব হিসেবে, এবং যুগপৎভাবে, অবধারণার তত্ত্ব ও তত্ত্বগত চিন্তনের যুক্তিবিদ্যা হিসেবে।

বিশেষ বিজ্ঞানগুলিতে, তা জ্ঞানের এই শাখাগুলিতে সামান্য তত্ত্বগত ও দার্শনিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্য এক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই বিজ্ঞানগুলিকে তা যোগায় অধীত ব্যাপারসমূহকে দেখার এক বিষয়গত পদ্ধতি, তাদের সমস্যাগুলির তত্ত্বগত সমাধানে পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষা ও আদল-নির্মাণের বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের উপরে সচেতন দখল ও তার পদ্ধতি ব্যবহার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয়বিধ বিশেষ বিজ্ঞানসমূহেই প্রগতিকে ত্বরিত করে।

মানুষের বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়োগ ও রূপান্তরসাধক

ক্রিয়াকলাপে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবহারিক সমস্যাগুলি সমাধানের উপায় ও পদ্ধতি নির্ণয়ে এর সচেতন ও বিচক্ষণ ব্যবহার সাফল্যের একটা নিশ্চিতি, পক্ষান্তরে ডায়ালেকটিকস বর্জন ও তার দাবিগুলি গণ্য না-করার ফলে অবধারণা ও কর্মপ্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই গুরুতর ভুল ও হিসাবের গরমিল দেখা দিতে বাধ্য।

বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রাম — এই দ্বান্দ্বিকতা আজকের পৃথিবীর পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর ক্রমবর্ধমান পরস্পরনির্ভরশীলতা প্রকাশ পায় শুধু উদ্বর্তনের সমস্যাতেই নয়, বরং বিশ্ব অর্থনীতির অস্তিত্ব ও বিকাশেও, পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়নশীল দেশগুলির পশ্চাৎপদতা, রোগ ও অনাহার কাটিয়ে ওঠা, মানবপ্রগতির জন্য শক্তির নতুন নতুন উৎস, মহাকাশ ও বিশ্ব মহাসাগরকে কাজে লাগানো, প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত সমগ্র মানবজাতির অভিন্ন স্বার্থের অস্তিত্ব ও তীব্রতাবৃদ্ধিতেও।

আজ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক ও আত্মিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের গোটা ব্যবস্থা-প্রণালীর আমূল নবায়নের সময় এসেছে। নবায়নের কেন্দ্রবিন্দু হল সমাজজীবনের অধিকতর গণতন্ত্রীকরণ, কথা আর কাজের মধ্যে, বাস্তব আর ঘোষিত কর্মনীতির মধ্যে বিরোধ কাটিয়ে ওঠা। এই অসুস্থ বৈসাদৃশ্য মানবচৈতন্যে প্রতিফলিত হয়েছিল, সৃষ্টি করেছিল অবিশ্বাস, অক্রিয়তা ও উদাসীনতা। গণতন্ত্রের বিকাশ এই কৃত্রিম বিরোধকে দূর করে এবং নিজের ক্ষমতা

ও প্রবণতা প্রকাশ করার, চরিত্রের নতুন সৃষ্টিশীল দিকগুলি উদ্ঘাটিত করার অবকাশ দেয়।

সমাজে সুস্থ নৈতিক পরিবেশ ছাড়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভালোভাবে চলতে পারে না, সেই প্রক্রিয়ার জন্য দরকার শুধু শিক্ষিত ও রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ক জনগণই নয়, নাগরিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন জনগণও। সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রের ত্রুটিহীনতা সাধন কমিউনিস্ট চৈতন্য গড়ে তোলার একটা পথ ও উপায় যোগায়। এই দ্বান্দ্বিক পরস্পরসম্পর্কের আরেকটি দিক এই যে খোদ গণতন্ত্রই নৈতিকতা শিক্ষা দেয় ও তা গড়ে তোলে। তা অর্জিত হয় ব্যাপক উন্মুক্ততা, জটিল সমস্যাগুলি নিয়ে অবাধ আলোচনা, তীক্ষ্ন প্রশ্নের মীমাংসার মধ্য দিয়ে, প্রকাশ্য ও অকপট সার্বজনিক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে।

সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষসাধনের সময়ে ন্যায়বিচার ও সমানতার নীতির সুসংগত রূপায়ণ, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতার বিশ্লেষণ পূর্বানুমিত। যে সমস্ত বাস্তব বিরোধ কমিউনিস্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক গঠনকাঠামোতেও বিকাশের উৎস, সেগুলি অতিক্রম করে এই কর্তব্যগুলিও সমাধা করতে হবে। সমাজতন্ত্রে বিরোধগুলি শোষণমূলক সমাজে যেমন হয় সেই রকম বৈরমূলক চরিত্রের নয়, শাসক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির স্থিরমস্তিষ্ক, বাস্তবসম্মত কর্মনীতির কল্যাণে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের রণনীতি ও রণকৌশল প্রণয়ন সম্পর্কে তার সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গি, মামুলি,

সেকেলে, ঐতিহাসিকভাবে নিঃশেষিত ধ্যানধারণার গণ্ডি অতিক্রম করার সামর্থ্যের কল্যাণে এই বিরোধগুলির মীমাংসা করা যায়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যাপক জনসাধারণ সার্বজনিক প্রক্রিয়াগুলির বিজ্ঞানসম্মত পথনির্দেশনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এই সমস্ত জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেকের প্রস্তুতি থাকতে হবে। পথনির্দেশনায় সমাজের প্রত্যেক সদস্যের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, আর এই সামাজিক ভূমিকা সম্পাদনে তার সামর্থ্যের মাত্রা — এই দুয়ের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধের মীমাংসা হতে চলেছে সার্বজনিক উৎপাদন বিকাশের কল্যাণে, সমাজের সকল সদস্যের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি, তাদের সাধারণ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্তর বৃদ্ধির কল্যাণে। সব কটি সমাজতান্ত্রিক দেশই রাষ্ট্রের কাজকর্ম নির্দেশনায় শ্রমজীবী জনগণকে টেনে আনার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে।

যে সমস্ত বিরোধ সমাজতন্ত্রের পক্ষে সারগত ও যেগুলি তার গতির উৎস সেই সমস্ত বিরোধ আর সমাজতন্ত্রের নীতিসমূহ ও তার পরক ব্যাপারগুলির মধ্যেকার বিরোধ — এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্যনির্ণয় করা অবশ্যকর্তব্য। প্রথমটি হল নিয়মিত, স্বাভাবিক, দ্বিতীয়টি হল অনিয়মিত, অস্বাভাবিক। প্রথম বিরোধগুলির উন্মূল্যায়ন অবশ্যম্ভাবীরূপে জন্ম দেয় দ্বিতীয় বিরোধগুলির, অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মানবিক চরিত্র আর মজুরি সমস্তর করা, অনর্জিত

আয়, আমলাতন্ত্র, সামাজিক মূল্যবোধহানি, ইত্যাদির মধ্যে বিরোধগুলির। এই ব্যাপারগুলি ঘটে সামাজিক চৈতন্য ও মানসিকতা সামাজিক সত্তার চেয়ে পিছিয়ে আছে বলে ততটা নয়, যতটা খোদ সামাজিক সত্তারই বিরোধগুলির দরুন, অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তিগুলির প্রগতিজনিত বিষয়গত চাহিদা থেকে পিছিয়ে আছে বলে, সমাজের সেকেলে কাঠামোগুলি টিকিয়ে রাখা হয় বলে। সামাজিক সম্পর্কের বৈপ্লবিক পুনর্নির্মাণ ঘটিয়ে, সমাজতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার বুনিয়াদে স্থাপিত বিষয়গত চাহিদা ও সম্ভাবনার সঙ্গে সেগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এই ব্যাপারগুলি নিশ্চিহ্ন করা হয়। এই সমস্ত বিরোধের মীমাংসা এক বিরাট ব্যবহারিক কাজের দ্বান্দ্বিক 'প্রাণকেন্দ্র', যে কাজের লক্ষ্য হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের নবায়ন, সমাজতন্ত্রকে এক আধুনিক চেহারা দেওয়া।

কিন্তু গণতন্ত্রীকরণ পুরনো বিরোধগুলির সমাধানই শুধু করে না, অবশ্যম্ভাবীরূপে নতুন নতুন বিরোধেরও জন্ম দেয়। তা থাকতে পারে তার বিকাশের উৎসস্বরূপ বিরোধগুলির আত্মপ্রকাশ ও সমাধানের এক নিরন্তর প্রক্রিয়া হিসেবেই।

সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি যত চলতে থাকে, কর্তব্যকর্মগুলি সহজতর হয় না, বরং আরও জটিল হয়ে ওঠে। যে সমস্ত সমস্যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতিকে বিঘ্নিত করে সেগুলি সমাধানের পাশাপাশি নতুন নতুন সমস্যা অবশ্যম্ভাবীরূপেই দেখা দেবে। সমাজতন্ত্রে সমাজপ্রগতির বিরোধগুলি সম্বন্ধে গভীর

উপলব্ধি এই স্বীকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত যে সমাজতান্ত্রিক সমাজকে বিকশিত, ত্রুটিহীন করা যায় একমাত্র এই বিরোধগুলির মীমাংসা করেই।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস আধুনিক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক শৈলী ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিজ্ঞান ও কর্মপ্রয়োগে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে তা উদ্দীপিত করে, এবং যে সমস্ত ভাবধারণা ব্যাপারসমূহের অন্তঃসারের আরও গভীরে প্রবেশ করতে অবধারণাকে সক্ষম করে তোলে, সেই সব ধ্যানধারণার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নির্বাচনে তা সহায়ক হয়। এটা সে অর্জন করে কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ দিয়ে, বিজ্ঞানে যে বিষয়গত প্রক্রিয়াসমূহ গবেষকদের দ্বান্দ্বিকভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে মুখ্যত সেগুলিরই আশ্রয় নিয়ে।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের সমস্যাগুলি বিজ্ঞানে ও কর্মপ্রয়োগে মনোযোগের কেন্দ্রী বিষয়। সেগুলিকে ব্যবহার ও বিশদ করা উচিত শুধু দার্শনিকদেরই নয়। জ্ঞানের যে কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিশেষজ্ঞের, শান্তি, গণতন্ত্র, সমাজপ্রগতি, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সংগ্রামীরই ডায়ালেকটিকসের মূল নীতি, নিয়ম ও প্রত্যয়গুলির শুধু বিচক্ষণ ব্যবহারই নয়, গভীরতরভাবে সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করার ও বহুবিধ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে প্রয়োগ করার সৃষ্টিশীল উপায়েরও সন্ধান করা উচিত।

প্রচলিত কয়েকটি দার্শনিক পরিভাষা

অংশ ও সমগ্র — দার্শনিক মূল প্রত্যয়, যা বিষয়সমূহের এক সাকল্য ও সেগুলির ঐক্যসাধক বিষয়গত সংযোগের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রকাশ করে এবং যার ফলে নতুন নতুন গুণ-ধর্ম ও সমানুবর্তিতা আত্মপ্রকাশ করে। এই সংযোগই সমগ্র হিসেবে, এবং বিভিন্ন বিষয়, তার অংশ হিসেবে পরিচিত। সমগ্রের গুণ-ধর্মগুলিকে তার অংশগুলির গুণ-ধর্মে পর্যবসিত করা যায় না। অজৈব সমগ্রগুলি (পরমাণু, কেলাস, প্রভৃতি) ও জৈব সমগ্রগুলি (জীববিদ্যাগত জীবাঙ্গগুলি, সমাজ) আত্ম-বিকাশমান।

অচেতন — ব্যাপক অর্থে, বিষয়ীর চৈতন্যে প্রতিফলিত নয় এমন সব মনোগত প্রক্রিয়া, ক্রিয়া ও দশার সামগ্রিকতা। কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বে,

অচেতনকে দেখা হয় মনের এক বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে, অথবা চৈতন্য ব্যাপারটি থেকে গুণগতভাবে পৃথক প্রক্রিয়াসমূহের এক প্রণালীতন্ত্র হিসেবে। যে সমস্ত একক ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত আচরণের প্রকৃত লক্ষ্য ও পরিণাম বিষয়ীদের দ্বারা উপলব্ধ নয়, সেগুলির চারিত্র্যনির্ণয় করার জন্যও কথাটি ব্যবহৃত হয়।

অজ্ঞাবাদ (Agnosticism, গ্রীক agnōstos: অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় থেকে) — যে দার্শনিক মতবাদে বিষয়গত জগৎ, তার সারমর্ম ও নিয়মগুলি অবধারণা করার সম্ভাবনা অস্বীকার করা হয় এবং বিজ্ঞানের ভূমিকাকে ব্যাপারসমূহের অবধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এর উদ্ভব ঘটেছিল প্রাচীনকালে (সংশয়বাদ): ডেভিড হিউম ও ইমানুয়েল কাণ্টের মতবাদের বৈশিষ্ট্য; অজ্ঞাবাদী প্রবণতাগুলি আজকের দিনের বুর্জোয়া দর্শনে কতকগুলি ধারার নমুনাসই (মাখবাদ, নব্য-দৃষ্টবাদ, প্রয়োগবাদ, অস্তিত্ববাদ প্রভৃতি)।

অদ্বৈতবাদ (Monism, গ্রীক monos: একাকী, এক-মাত্র থেকে) — মহাবিশ্বের বহুবিধ ব্যাপারকে একটিমাত্র উপাদানে (চূড়ান্ত সারপদার্থ) পর্যবসিত করা যায়, এই মতবাদ। অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদের (যা দুটি স্বতন্ত্র উপাদানের অস্তিত্ব ধরে নেয়) ও নানাত্ববাদের (যা উপাদানসমূহের নানাত্ব ধরে নেয়) বিপরীত। অদ্বৈতবাদের সর্বোচ্চ ও একমাত্র সুসংগত রূপ হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, যা এই মত পোষণ করে যে প্রকৃতির

সমস্ত বহুবিচিত্র ব্যাপার, সমাজ ও মানবচৈতন্য বিকাশমান বস্তুর উৎপাদ।

অধিবিদ্যা (Metaphysics, গ্রীক [ta] meta [ta] physika: পদার্থবিদ্যার পরে [কাজ] থেকে) — সত্তার ইন্দ্রিয়গোচরাতীত (অভিজ্ঞতার অনধিগম্য) নীতিসমূহ সম্বন্ধে এক দার্শনিক মতবাদ। মানসিকভাবে বোধগম্য সত্তার নীতিসমূহ সম্বন্ধে আরিস্টটলের রচনাটিকে রোডস-এর আন্দ্রোনিকাস (খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) যে নামে অভিহিত করেছিলেন সেখান থেকেই কথাটির উৎপত্তি। আজকের দিনের বুর্জোয়া দর্শনে, অধিবিদ্যা কথাটি দর্শনের সমার্থক হিসেবে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়; ২) যে দার্শনিক পদ্ধতি ডায়ালেকটিকসের বিপরীত এবং যা ব্যাপারসমূহকে গণ্য করে একটি থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করে এবং সেগুলির বিকাশের উৎস হিসেবে আভ্যন্তরিক বিরোধকে অস্বীকার করে।

অধিযন্ত্রবাদ (Mechanicism): বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির একপেশে এক নীতি, ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে উপস্থাপিত, তাতে সমাজ ও প্রকৃতির বিকাশকে ব্যাখ্যা করা হয় বস্তুর গতির যান্ত্রিক রূপের নিয়মগুলি দিয়ে। অধিযন্ত্রবাদ উদ্ভূত হয়েছে বলবিদ্যা বা যন্ত্রনির্মাণ-বিদ্যার নিয়মগুলিকে পরম করে তোলার মধ্য থেকে, যার ফলে পৃথিবীর এক আধিবিদ্যক চিত্র পাওয়া যায়। ব্যাপক অর্থে অধিযন্ত্রবাদ বলতে বোঝায় গতির কোনো

জটিল ও গুণগতভাবে পৃথক রূপকে এক সরলতর রূপে পর্যবসিত করা (সামাজিককে জীববিদ্যারূপে)।

অনাপেক্ষিক, পরম (Absolute, লাতিন absolutus: অ-শর্তসাপেক্ষ, সম্পূর্ণকৃত) ভাববাদী দর্শনে ও ধর্মে, সত্তার অ-শর্তসাপেক্ষ ও ত্রুটিহীন উৎস, যে কোনো সম্পর্ক বা শর্ত থেকে মুক্ত (আস্তিক্যবাদে ঈশ্বর, সর্বোচ্চ পরম সত্তা, নব্য-প্লেটোবাদে অনন্যসত্তা, ইত্যাদি)।

অনুমান — একক চৈতন্যের বৈশিষ্ট্যসূচক যুক্তিবুদ্ধির মানের ভিত্তিতে এক মানসিক ক্রিয়া, যা যুক্তিবিদ্যার নিয়মগুলির সঙ্গে অনেকখানি মেলে।

অবধারণা (Cognition) — সামাজিক-ঐতিহাসিক কর্মপ্রয়োগের বিকাশের দ্বারা নির্ধারিত চিন্তায় বাস্তবের প্রতিফলন ও পুনরুপস্থাপনের এক প্রক্রিয়া; বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া যার ফলে পৃথিবী সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান লাভ করা যায়।

অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism, গ্রীক empeiria: অভিজ্ঞতা থেকে) — যে দার্শনিক ধারা, যুক্তিবাদের বিপরীতে, সত্য জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসেবে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করে। ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদ (জর্জ বার্কলে, ডেভিড হিউম, এর্নস্ট মাখ, যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ) অভিজ্ঞতাকে সংবেদনের এক সমাহারে

সীমিত করে, বিষয়গত বাস্তবই যে অভিজ্ঞতার ভিত্তি সে কথা অস্বীকার করে'। বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ (ফ্রান্সিস বেকন, টমাস হবস, জন লক, ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদীরা) বিষয়গতভাবে বিদ্যমান বাহ্যিক জগৎকে দেখে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার উৎস হিসেবে। এর সীমাবদ্ধতার কারণ হল অভিজ্ঞতাকে, ইন্দ্রিয়জ অবধারণাকে অধিবিদ্যাগতভাবে পরম করে দেখা, এবং যুক্তিসহ অবধারণার (প্রত্যয়, তত্ত্ব) ভূমিকাকে খাটো করা।

অসীম ও সসীম — দার্শনিক মূল প্রত্যয়, তাতে বিষয়গত পৃথিবীর দুটি বিপরীত ও অবিচ্ছেদ্য দিক প্রকাশ পায়। অসীম সামগ্রিকভাবে বস্তুর চারিত্র্যনির্ণয় করে, তার অসৃজনীয় ও অবিনাশী চরিত্র, গভীরতায় বস্তুর পরিমাণগত অফুরন্ততা এবং তার গুণ-ধর্ম, সংযোগ, সত্তার রূপ ও বিকাশের প্রবণতাগুলি নির্ণয় করে। সসীম নির্ণয় করে যে কোনো মূর্ত ব্যাপার বা বিষয়কে, যেগুলি নির্দিষ্ট কোনো স্থানিক ও কালগত গণ্ডির মধ্যে বিদ্যমান। সসীম হল অসীমের বহিঃপ্রকাশের একটি রূপ, আর অসীম গঠিত হয় অসীম-সংখ্যক সসীম বিষয় ও ব্যাপার দিয়ে। সসীম সম্বন্ধে অবধারণার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান পৃথিবীতে অসীম সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান অর্জন করছে।

আত্ম-গতি — ব্যবস্থায় এক আভ্যন্তরিকভাবে আবশ্যিক ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন, তার বিরোধগুলির দ্বারা নির্ধারিত।

আপেক্ষিকতাবাদ, ব্যতিষঙ্গবাদ (Relativism, লাতিন relativus: সম্পর্কসাপেক্ষ থেকে) — একটি পদ্ধতিতত্ত্বগত নীতি, যার আসল কথা হল আমাদের জ্ঞানের আপেক্ষিকতা ও সাপেক্ষতাকে অধিবিদ্যাগতভাবে পরম করে তোলা, যার ফলে ঘটে বিষয়গত সত্য জানার সম্ভাবনা অস্বীকার, অজ্ঞাবাদ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ আমাদের জ্ঞানের আপেক্ষিকতাকে স্বীকার করে বটে, তবে বিষয়গত সত্যের নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ ঐতিহাসিকভাবে সীমিত।

আস্তিক্যবাদ (Theism, গ্রীক theos: ঈশ্বর থেকে) — যে ধর্মীয় মতবাদে ঈশ্বরকে দেখা হয় এমন এক তুরীয় চূড়ান্ত সত্তা হিসেবে যা পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে এবং পৃথিবীর কর্মবিষয়ে এখনও জড়িত। সর্বেশ্বরবাদের প্রতিতুলনায়, আস্তিক্যবাদ ঈশ্বরের তুরীয় প্রকৃতিতে বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বরবাদের প্রতিতুলনায় তা এই মত পোষণ করে যে ঈশ্বর পৃথিবীতে এখনও সক্রিয়। উদ্ভবগতভাবে সম্পর্কিত ধর্মগুলির — জুডাইজম, খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য।

ইচ্ছাবাদ, স্বতঃপ্রণোদনাবাদ (Voluntarism, লাতিন voluntas: ইচ্ছা থেকে) — ১) দর্শনে এক ভাববাদী ধারা, ইচ্ছাকে যা সত্তার সর্বোচ্চ নীতি বলে গণ্য করে। এক স্বতন্ত্র মতধারা হিসেবে তা প্রথমে রূপ পরিগ্রহ করে শোপেনহাউয়ারের দর্শনে; ২) যে ক্রিয়া-

কলাপ ইতিহাসের বিষয়গত নিয়মগুলিকে উপেক্ষা করে এবং যার বৈশিষ্ট্য হল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তরফ থেকে যথেচ্ছ সিদ্ধান্ত।

ইসলাম — সবচেয়ে বহুলপ্রচলিত ধর্মগুলির অন্যতম (খ্রীষ্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি), এর অনুগামীদের বলা হয় মুসলমান এবং খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এই ধর্ম আরব দেশে প্রবর্তন করেন মহম্মদ। আরবি রাজ্যজয়ের ফলে, এই ধর্ম মধ্যপ্রাচ্যে ও তার পরে দূরপ্রাচ্যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার কতকগুলি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের প্রধান নীতিসমূহ বিধৃত আছে কোরানে। তার প্রধান ধর্মমত হল পরম সত্তা হিসেবে আল্লাহ ও তার পয়গম্বর হিসেবে মহম্মদের উপাসনা। এর প্রধান দুটি ধারা হল সুন্নিবাদ ও শিয়াবাদ।

ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্রহ্মবিদ্যা (Theology) — ঈশ্বরের অন্তঃসার ও ক্রিয়া সম্বন্ধে ধর্মীয় মতবাদসমষ্টি, সেই ঈশ্বরকে কল্পনা করা হয় এমন এক ব্যক্তিগত ও পরম ঈশ্বর হিসেবে, যিনি দৈব রহস্যোদ্ঘাটনের ভিতর দিয়ে মানুষের কাছে নিজেকে জ্ঞাত করান। কঠোর অর্থে, ঈশ্বরতত্ত্ব সাধারণত প্রযুক্ত হয় জুডাইজম, খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের ক্ষেত্রে। ঈশ্বরতত্ত্বের কর্তৃত্বমূলক চরিত্র ও মতান্ধ অন্তর্বস্তু মুক্ত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার নীতিগুলির সঙ্গে তাকে বেমানান করে তোলে।

ঈশ্বরবাদ (Deism), লাতিন deus: ঈশ্বর থেকে) — একটি ধর্মীয়-দার্শনিক মতবাদ, তাতে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয় এক বিশ্ব-মন হিসেবে, প্রকৃতির 'যন্ত্রটির' স্রষ্টা হিসেবে, যিনি তাকে উদ্দেশ্য দান করেছেন, তার নিয়মগুলি স্থির করে দিয়েছেন এবং তাকে গতি দিয়েছেন; কিন্তু এই মতবাদে প্রকৃতির আত্ম-গতির সঙ্গে ঈশ্বরের আর কোনো সম্পর্ক বা হস্তক্ষেপ (অর্থাৎ, দৈব কৃপা, অলৌকিক ঘটনা, ইত্যাদি) অস্বীকার করা হয় এবং বলা হয় যে ঈশ্বরকে জানার একমাত্র পথ হল বিচারবুদ্ধির ব্যবহার। জ্ঞানালোকের চিন্তকদের মধ্যে ঈশ্বরবাদ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে মুক্তচিন্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

উপমা (Analogy, গ্রীক analogia: সমানুপাত, সাদৃশ্য থেকে) — বস্তু, ব্যাপার বা প্রক্রিয়াসমূহের কোনো কোনো দিক দিয়ে সাদৃশ্য। উপমামূলক অনুমান — কোনো বস্তু পরীক্ষা করে আহৃত ও অনুরূপ সারগত গুণ-ধর্ম ও গুণ-বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত একটি বস্তুতে স্থানান্তরিত জ্ঞান; এই ধরনের অনুমান বৈজ্ঞানিক প্রকল্পগুলির অন্যতম উৎস। সত্তা-উপমা — রোমান ক্যাথলিক স্কলাস্টিকদের একটি প্রধান নীতি, তাতে বলা হয় যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবধারণা করা যায় তাঁর সৃষ্ট জগতের অস্তিত্ব থেকে।

উপস্তর, আধার (Substratum, লাতিন substernere: তলায় বিস্তৃত হওয়া থেকে) — সমস্ত প্রক্রিয়া ও ব্যাপারের অভিন্ন বস্তুগত ভিত্তি।

কর্মপ্রয়োগ (Practice, গ্রীক praktikos: সক্রিয় থেকে) — মানুষের উদ্দেশ্যপূর্ণ বস্তুগত ক্রিয়াকলাপ; বিষয়গত বাস্তবকে আয়ত্ত ও রূপান্তরিত করা; সমাজ ও অবধারণার বিকাশের সার্বিক ভিত্তি। দুটি প্রধান ধরনের কর্মপ্রয়োগ হল বৈষয়িক মূল্য উৎপাদন ও জনসাধারণের সামাজিকভাবে রূপান্তরসাধক, বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ (শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজ বিপ্লব, সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ)। ধরন ও অন্তর্বস্তু উভয় দিক দিয়েই কর্মপ্রয়োগ এক সামাজিক ব্যাপার। তার গঠনকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হল প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, প্রেষণা, উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ, লক্ষ্যবস্তু, সাধিত্র ও ফল। অবধারণার ভিত্তি ও চালিকা শক্তি হিসেবে, কর্মপ্রয়োগ পরবর্তী তত্ত্বগত অধ্যয়নের জন্য বিজ্ঞানকে তথ্যগত উপকরণ যোগায়, এবং মানবচিন্তার গঠনকাঠামো, বিষয়গত আধেয় ও গতিমুখ নির্ধারণ করে। কর্মপ্রয়োগ হল সত্য জ্ঞানের মানদণ্ড। কর্মপ্রয়োগ সম্বন্ধে মার্কসীয় উপলব্ধি তার ভাববাদী ও সংশোধনবাদী ধারণা থেকে মূলগতভাবে পৃথক এইখানে যে মার্কসবাদ মানবচৈতন্য থেকে কর্মপ্রয়োগের লক্ষ্যবস্তুটির — বস্তুজগতের — স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে এবং জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে তা কর্মপ্রয়োগকে অন্তর্ভুক্ত করে সত্যের মানদণ্ড হিসেবে। তত্ত্বের সঙ্গে এক

দ্বান্দ্বিক ঐক্য গঠনকারী কর্মপ্রয়োগ হল সেই ঐক্যেরই ভিত্তি। তত্ত্ব ও কর্মপ্রয়োগের দ্বান্দ্বিক আন্তঃসংযোগই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এক অত্যাবশ্যক নীতি।

ক্রমবিকাশ (Evolution, লাতিন evolutio: পাক খোলা থেকে) — ব্যাপক অর্থে সমাজে বা প্রকৃতিতে পরিবর্তনের এক প্রক্রিয়া, তার গতিমুখ, পারম্পর্য, নিয়ম ও সমানুবর্তিতাগুলি; কোনো ব্যবস্থার পূর্ব-বর্তী দশায় অল্পবিস্তর দীর্ঘকালব্যাপী পরিবর্তন-সমূহের ফল হিসেবে পরিগণিত এক নির্দিষ্ট দশা; সংকীর্ণ অর্থে, বিপ্লবের বৈপরীত্যে, মন্থর ও ক্রমান্বিত পরিমাণগত পরিবর্তন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ক্রমবিকাশ ও বিপ্লবকে বিকাশের দুটি পরস্পর-নির্ভরশীল দিক হিসেবে গণ্য করে, এবং যে কোনো একটিকে পরম করে তোলার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

খ্রীষ্টধর্ম — বিশ্বব্যাপী প্রচলিত তিনটি ধর্মের অন্যতম (বৌদ্ধধর্ম ও ইসলামের পাশাপাশি)। তার তিনটি প্রধান শাখা আছে: রোমান ক্যাথলিকবাদ, অর্থোডক্সি ও প্রোটেস্টান্টবাদ। সমস্ত খ্রীষ্টান ধারা ও সম্প্রদায়ের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হল মানুষ-দেবতা হিসেবে যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস, যিনি বিশ্বত্রাতা ও পবিত্র ত্রয়ীর দ্বিতীয় পুরুষ। খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রধান সূত্র হল ধর্মশাস্ত্র (বাইবেল, বিশেষত তার দ্বিতীয় অংশ নিউ টেস্টামেণ্ট)। রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের একটি প্রদেশ প্যালেস্টাইনে নিপীড়িতদের ধর্ম হিসেবে

খ্রীষ্টধর্ম দেখা দিয়েছিল ১ম শতাব্দীতে। শাসক শ্রেণীগুলি ক্রমে ক্রমে একে তাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিল: ৪র্থ শতাব্দীতে তা হয়ে উঠেছিল রোমান সাম্রাজ্যে প্রাধান্যশালী ধর্ম; মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় গীর্জা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পবিত্রতা দান করেছিল; এবং ১৯শ শতাব্দীতে, পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায়, তা হয়ে উঠেছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যতম প্রধান অবলম্বন; সমাজতন্ত্রের প্রতি তা বৈরি মনোভাব গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির ফলে পৃথিবীতে পরিবর্তিত শক্তির ভারসাম্য খ্রীষ্টীয় গীর্জাকে বাধ্য করেছিল তার কর্মধারা পরিবর্তন করতে, তার গোঁড়া মতগুলিকে, ধর্মাচরণ, সংগঠন ও কর্মনীতির আধুনিকীকরণ শুরু করতে।

গঠনকাঠামো (Structure, লাতিন structura: নির্মাণ, বিন্যাস, বন্দোবস্ত থেকে) — একটি বিষয়ের সেই সমস্ত স্থায়ী সংযোগের সাকল্য, যেগুলি তার অখন্ডতা ও আত্মপরিচয়কে নিশ্চিত করে, অর্থাৎ, বিভিন্ন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক পরিবর্তন চলাকালে তার প্রধান প্রধান গুণ-ধর্ম ধারণ।

গঠনরূপ (Formation) — ডায়ালেকটিকসের একটি মূল প্রত্যয়, যে প্রক্রিয়ায় কোনো বস্তুগত বা ভাবগত বিষয় গঠিত হয় তাকে বোঝায়। যে কোনো গঠনরূপই বিকাশের ধারায় সম্ভাবনার বাস্তবে রূপান্তরকে পূর্বানুমান করে।

গতি (Motion) — বস্তুর অস্তিত্বের ধরন, তার প্রধান গুণ; ব্যাপকতম অর্থে, সাধারভাবে পরিবর্তন, বস্তুগত বিষয়গুলির যে কোনো মিথষ্ক্রিয়া। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে এই মত পোষণ করা হয় যে বস্তু ও গতি ঐক্যে স্থিত; গতি ছাড়া কোনো বস্তু নেই, ঠিক যেমন বস্তু ছাড়া কোনো গতি নেই। বস্তুর গতি অনাপেক্ষিক, পক্ষান্তরে যে কোনো বিরামই আপেক্ষিক ও গতির একটি উপাদান। (যেমন পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে যে বস্তুটি বিরামের অবস্থায় রয়েছে সেটি তার সঙ্গে একত্রে সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে, ইত্যাদি)। গতি হল বিপরীতসমূহের এক ঐক্য: পরিবর্তন ও স্থিতিশীলতা (পরিবর্তন যেখানে প্রধান ভূমিকা পালন করে), ধারাবাহিকতা ও ছেদ, অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিকের ঐক্য। গতির প্রধান রূপগুলির অন্তর্ভুক্ত হল যান্ত্রিক, পদার্থবিদ্যাগত (তাপ, বৈদ্যুত-চৌম্বক, অভিকর্ষীয়, পারমাণবিক ও আণবিক), রাসায়নিক জীববিদ্যাগত ও সামাজিক। বস্তুর গতির উচ্চতর রূপগুলি দেখা দেয় ঐতিহাসিকভাবে, আপেক্ষিকভাবে নিম্নতর রূপগুলির ভিত্তিতে এবং এগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিবর্তিত রূপে, সেগুলির নিজস্ব গঠনকাঠামো ও বিকাশের নিয়ম অনুযায়ী; বস্তুর উচ্চতর রূপগুলি নিম্নতর রূপগুলি থেকে গুণগতভাবে পৃথক এবং সেগুলিতে পর্যবসিত হতে পারে না।

গুণ (Quality) — একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, যা প্রকাশ করে একটি বিষয়ের সেই সারগত নির্ধারকতাকে যেটি তাকে সেই বিষয় করে তোলে। গুণ হল বিষয়সমূহের এক বিষয়গত ও সার্বিক চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য, সেগুলির গুণ-ধর্মের সামগ্রিকতার মধ্যে প্রকাশ পায়।

গুণ-ধর্ম (Property) — একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, যা বিষয়ের সেই দিকটিকে প্রকাশ করে যে দিকটি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তার প্রভেদ বা সাদৃশ্য নির্ণয় করে এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সেই বিষয়টির সম্পর্কের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

চিন্তা, চিন্তন (Thought, thinking) — মানুষের অবধারণায়, বিষয়গত বাস্তবের প্রতিফলনের সর্বোচ্চ পর্যায়। বাস্তব জগতের যে সমস্ত বিষয়, গুণ-ধর্ম ও সম্পর্ক অবধারণার ইন্দ্রিয়জ পর্যায়ে তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে মানুষকে তা সক্ষম করে তোলে। মানবচিন্তার এক সামাজিক-ঐতিহাসিক চরিত্র আছে এবং ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। চিন্তার রূপ ও নিয়মগুলি অধীত হয় যুক্তিবিদ্যা দ্বারা, এবং তার ব্যবস্থাপ্রণালী অধীত হয় মনোবিদ্যা ও স্নায়ু-শারীরবৃত্তের দ্বারা। সাইবারনেটিকস চিন্তাকে বিশ্লেষণ করে কোনো মানসিক ক্রিয়ার কৃৎকৌশলগত মডেলিং এর উদ্দেশ্য নিয়ে।

চেতনবাদ (Animatism, লাতিন anima: শ্বসন, আত্মা থেকে) — এক নৈর্ব্যক্তিক অতিপ্রাকৃত শক্তি প্রকৃতি বা তার বিভিন্ন অংশকে পরিব্যাপ্ত করে আছে, এই বিশ্বাস; আদিম ধর্মগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ। অনেক বিজ্ঞানী চেতনবাদকে ধর্মের বিকাশে তার আগেকার, প্রাক-সর্বপ্রাণবাদী পর্ব বলে মনে করেন। যেমন সোভিয়েত গবেষক শ্তের্নবের্গ ('মানবজাতি-বিজ্ঞানের আলোকে আদিম ধর্ম', ১৯৩৬) আদিম ধর্মীয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে তিনটি পর্যায় আলাদা করে দেখিয়েছেন: ১) এমন এক বিকীর্ণ অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস, যা সমগ্র প্রকৃতিকে চেতন করে (চেতনবাদ); ২) প্রকৃতিতে অ-বস্তুগত সত্তাসমূহ — 'অধ্যাত্মা' আবিষ্কার; ৩) একটি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস (সর্বপ্রাণবাদ)।

চৈতন্য (Consciousness) — দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের অন্যতম প্রধান ধারণা; চিন্তায় বাস্তবের এক ভাবগত পুনরুপস্থাপনা করার যে সামর্থ্য মানুষের আছে তাকে বোঝায়। মার্কসীয় দর্শনে, চৈতন্যকে দেখা হয় সত্তা সম্বন্ধে এক সচেতনতা হিসেবে, অত্যন্ত সংগঠিত বস্তুর এক গুণ-ধর্ম হিসেবে, বিষয়গত পৃথিবীর এক বিষয়ীগত ভাবরূপ হিসেবে, এবং বস্তুগতর বৈপরীত্যে ও তার সঙ্গে ঐক্যে ভাবগত হিসেবে; কথাটির সংকীর্ণ অর্থে, চৈতন্য হল মানসিক প্রতিফলনের চরম রূপ, যা সামাজিকভাবে বিকশিত মানুষের বৈশিষ্ট্যসূচক ও ভাষার সঙ্গে যুক্ত,

উদ্দেশ্যপূর্ণ শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপের ভাবগত দিক। চৈতন্য গড়ে উঠেছিল সামাজিক কর্মপ্রয়োগের ভিত্তিতে ও তার মধ্য দিয়ে। তার দুটি রূপ: একক (ব্যক্তিগত) ও সামাজিক। সামাজিক চৈতন্য হল সামাজিক সত্তার এক প্রতিফলন; তার রূপগুলির মধ্যে আছে বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা, নৈতিকতা, ধর্ম, রাজনীতি ও আইন।

ছায়াপথ (Galaxy) — বিভিন্ন ধরনের নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, ছায়াপথ সংক্রান্ত নীহারিকা, আন্তঃনাক্ষত্র গ্যাস ও ধূলি দিয়ে গঠিত এক প্রণালী, একটিমাত্র সমগ্রে গতিশীলভাবে সংযুক্ত। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা এই মত পোষণ করে যে নক্ষত্রগুলি ছায়াপথ জুড়ে অসমভাবে বণ্টিত। একটি প্রণালী হিসেবে ছায়াপথের আকৃতি একটা বিশাল উপবৃত্তের (চাকতি) মতো, প্রতিসাম্যের সমতলের দিকে চাপা (এক পাশ থেকে, চাকতিটি দেখা যায় আকাশগঙ্গা হিসেবে)। ছায়াপথের সর্পিল গঠনকাঠামো ও তার অক্ষপথে তার আবর্তন বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। এই আবর্তন জটিল ও কোনো ঘন বা তরল পদার্থের কোনো আদর্শ ধরনের আবর্তনে তাকে পর্যবসিত করা যায় না। ছায়াপথ যে সময়ে তার অক্ষপথে পুরো এক পাক ঘোরে সেই ছায়াপথীয় এক বছর সূর্যের নিকটস্থ অধিকাংশ পদার্থের পক্ষে স্থায়ী হয় প্রায় ১৯ কোটি বছর। এই গতিতে সূর্যের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ২৩০ কিলোমিটারে

পৌঁছয়। নক্ষত্রটির ধরন ও ছায়াপথীয় কেন্দ্র থেকে তার দূরত্ব সাপেক্ষে নক্ষত্রগুলির কক্ষপথীয় কালপর্বের পার্থক্য ঘটে।

আমাদের ছায়াপথ বহু ছায়াপথের বিশাল এক প্রণালীর তথাকথিত অধি-ছায়াপথের অংশ, তার অনুসন্ধান সবে শুরু হচ্ছে।

জাত (caste) — লোকেদের বদ্ধ মৌলিক গোষ্ঠী, সেগুলির সদস্যদের সুনির্দিষ্ট সামাজিক ক্রিয়া, বংশানুক্রমিক বৃত্তি বা পেশার দ্বারা পৃথকীকৃত (সেগুলির সদস্যরা নির্দিষ্ট নৃজাতিগত ও কখনও বা ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির অন্তর্গত হতে পারে)। বিভিন্ন জাত একটা সোপানতন্ত্রস্বরূপ, বিভিন্ন জাতের মধ্যে মেলামেশা কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ। প্রাচীন জাতগুলির (সামাজিক পদমর্যাদা-বিভাগ) অস্তিত্ব ছিল কোনো কোনো প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজে (প্রাচীন মিশর, ভারত, পেরু ও অন্যান্য দেশে)। ভারতে হিন্দুধর্মের ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন নীতির ভিত্তিতে সমাজের বর্গ-বিভাজন সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছিল। ১৯৪০-এর দশকে ভারতে ছিল প্রায় ৩,৫০০ জাত ও উপজাতি।

ভারত প্রজাতন্ত্রের ১৯৫০ সালের সংবিধানে সকল জাতের সমানাধিকার ও 'অস্পৃশ্যদের' আইনগত সমানাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

জাত বলতে অনন্যসংস্রব একটি সামাজিক

গোষ্ঠীকেও বোঝায়, যেমন ভূম্যধিকারী সম্ভ্রান্তজনের জাত বা বুর্জোয়া সমাজে অফিসারদের জাত।

জ্ঞান — বাস্তব সম্বন্ধে মানুষের অবধারণার ব্যবহারিকভাবে পরীক্ষিত ফল, মানবচিন্তায় তার সঠিক প্রতিফলন।

জ্ঞান-তত্ত্ব (Gnoseology বা epistemology, গ্রীক gnosis বা episteme: জ্ঞান থেকে) — দর্শনের যে বিভাগে অধ্যয়ন করা হয় অবধারণার সমানুবর্তিতা ও সম্ভাবনা, বিষয়গত বাস্তবের সঙ্গে জ্ঞানের (সংবেদন, পুনরুপস্থাপন, ধারণা) সম্পর্ক, অবধারণা প্রক্রিয়ার পর্যায় ও রূপগুলি এবং তার সত্যতা ও প্রামাণিকতার শর্ত ও মানদন্ড। জ্ঞান-তত্ত্বে ভাববাদ ও বস্তুবাদ হল দুটি প্রধান ধারা। ভাববাদ অবধারণাকে পর্যবসিত করে এক 'বিশ্ব অধ্যাত্মার' দ্বারা আত্ম-অবধারণায় (হেগেল) অথবা 'সংবেদনসমূহের এক সমাহার' বিশ্লেষণে (বার্কলে, মাখবাদ)। অস্বীকার করে বস্তুনিচয়ের অন্তঃসার বোঝার সম্ভাবনাকে (হিউম, কাণ্ট, দৃষ্টবাদ), বাতিল করে দার্শনিক বিজ্ঞান হিসেবে জ্ঞান-তত্ত্বকে (নব্যদৃষ্টবাদ, ভাষাতত্ত্বীয় দর্শন)। বস্তুবাদ ধরে নেয় যে জ্ঞান হল বস্তুজগতের এক প্রতিফলন (ডেমোক্রিটাস, বেকন, লক, ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদীরা)। প্রাক্-মার্কসীয় বস্তুবাদ (আধিবিদ্যক ও অনুধ্যানমূলক) অবধারণা-প্রক্রিয়ার দ্বান্দ্বিকতা উদ্ঘাটন করতে পারে নি। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের

জ্ঞান-তত্ত্ব সামাজিক-ঐতিহাসিক কর্মপ্রয়োগকে জ্ঞানের ভিত্তি ও সত্যের মানদণ্ড বলে গণ্য করে। আমাদের সমস্ত জ্ঞানই কর্মপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে উপলব্ধ বস্তুজগৎ, তার সংযোগ ও সমানুবর্তিতাগুলির এক প্রতিফলন। অবধারণা বিকশিত হয় 'জীবন্ত প্রত্যক্ষণ থেকে বিমূর্ত চিন্তায়, **এবং তাই থেকে কর্মপ্রয়োগে'** (লেনিন)। আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির (নিরীক্ষা, আদল-নির্মাণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ, প্রভৃতি) সামান্যীকরণ করে জ্ঞান-তত্ত্ব হয়ে ওঠে তার দার্শনিক-পদ্ধতিতত্ত্বগত ভিত্তি।

ডায়ালেকটিকস, দ্বন্দ্বতত্ত্ব, দ্বান্দ্বিকতা — ব্যাপারসমূহের বিকাশ ও আত্ম-গতির মধ্যে সেগুলি সম্বন্ধে অবধারণার তত্ত্ব ও পদ্ধতি; প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার বিকাশের সবচেয়ে সামান্য নিয়মগুলি সম্বন্ধে বিজ্ঞান; ডায়ালেকটিকস অধিবিদ্যার বিরোধী। ডায়ালেকটিকসের ইতিহাসে প্রধান পর্যায়গুলির মধ্যে আছে প্রাচীন চিন্তকদের (হেরাক্লিটাস) স্বতঃস্ফূর্ত, অতিসরল ডায়ালেকটিকস, নব্য প্লেটোবাদ-কর্তৃক (প্লোটিনাস, প্রোক্লাস) বিকশিত প্লেটোর ধারণার ডায়া-লেকটিকস; জোর্দানো ব্রুনো ও কুসার নিকোলাসের দ্বান্দ্বিক শিক্ষা; ক্লাসিকাল জার্মান দর্শনের (কাণ্ট, ফিখটে, শিলিং, হেগেল) ডায়ালেকটিকস; ১৯শ শতাব্দীর রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের (গের্ৎসেন, বেলিন-স্কি, চের্নিশেভস্কি) ডায়ালেকটিকস। আগেকার দার্শনিক

মতবাদগুলিকে সমালোচনাত্মকভাবে পুনর্বিচার করার ভিত্তিতে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসকে বিশদ করেন মার্কস ও এঙ্গেলস, এবং তাকে বিকশিত করেন লেনিন। ডায়ালেকটিকসের প্রধান প্রধান মূল প্রত্যয়ের মধ্যে আছে বিরোধ, গুণ ও পরিমাণ, আপাতিকতা ও আবশ্যিকতা, সম্ভাবনা ও বাস্তব, ইত্যাদি; এর প্রধান নিয়মগুলি হল বিপরীতসমূহের ঐক্য ও সংগ্রাম, পরিমাণের গুণে রূপান্তর, ও নিরাকরণের নিরাকরণ।

তত্ত্ব (Theory, গ্রীক theoria: পরীক্ষা, অনুসন্ধান থেকে) — জ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রে মূল ভাবধারণাগুলির এক প্রণালীতন্ত্র; বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একটি রূপ, যা বাস্তবের নিয়ম ও সারগত সংযোগগুলির এক অখণ্ড চিত্র উপস্থিত করে। তার সত্যতার মানদণ্ড ও তার বিকাশের ভিত্তি হল কর্মপ্রয়োগ।

থিসিস, উপপাদ্য (Thesis, গ্রীক thesis: প্রতিজ্ঞা, বক্তব্য থেকে) — ১) ব্যাপক অর্থে, যে কোনো যুক্তির ক্ষেত্রে কোনো তত্ত্বের উপস্থাপনা; সংকীর্ণ অর্থে, একটি মূল প্রতিজ্ঞা বা নীতি; ২) যুক্তিবিদ্যায়, প্রমাণসাপেক্ষ একটি প্রতিজ্ঞা।

দশা, অবস্থা (state) — বৈজ্ঞানিক অবধারণার একটি মূল প্রত্যয়, যা গতি-স্থিত বস্তুর বহুবিধ রূপে — যেগুলির সহজাত সারগত গুণ-ধর্ম ও সম্পর্ক সহ —

প্রকাশ করার ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে। দশা সংক্রান্ত মূল প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয় বস্তু ও ব্যাপারসমূহের পরিবর্তন ও বিকাশের প্রক্রিয়া প্রকাশ করার জন্য, যে পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত সেগুলির গুণ-ধর্ম ও সম্পর্কেরই পরিবর্তন। এই সমস্ত গুণ-ধর্ম ও সম্পর্কের সামগ্রিকতাই একটি বস্তু বা ব্যাপারের দশা নির্ধারণ করে। সেই জন্যই, বস্তুসমূহ ও সেগুলির ব্যাবস্থাপ্রণালীর দশার এক চারিত্র্যনির্ণয় সেগুলির অন্তঃসার বোঝার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দর্শন — সামাজিক চৈতন্যের একটি রূপ, বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, পৃথিবী সম্বন্ধে ও পৃথিবীতে মানুষের স্থান সম্বন্ধে ভাবধারণা ও অভিমতের এক প্রণালীতন্ত্র; পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের অবধারণামূলক, মূল্যগত, নীতিশাস্ত্রীয় ও নন্দনতাত্ত্বিক মনোভাবকে পরীক্ষা করে। মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন হল প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার বিকাশের সার্বিক নিয়মগুলির এক বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক অবধারণার এক সাধারণ পদ্ধতিতত্ত্ব। বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে, দর্শন শ্রেণী স্বার্থের সঙ্গে, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সামাজিক বাস্তব-নির্ধারিত বলে, তা সামাজিক সত্তার উপরে এক সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে, এবং নতুন নতুন আদর্শ, মান ও সাংস্কৃতিক মূল্য গঠন করতে সাহায্য করে। বাস্তবের প্রতি মানুষের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক মনোভাবের ভিত্তিতে স্থাপিত দর্শন বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্ক উদ্ঘাটন

করে। তার বুনিয়াদি প্রশ্নটি হল বস্তু ও অধ্যাত্মার মধ্যে, সত্তা ও চৈতন্যের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্ন, পৃথিবীর জ্ঞেয়তার প্রশ্ন, এবং ঐতিহাসিক-দার্শনিক প্রক্রিয়ার অন্তর্বস্তু হল বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংগ্রাম। ঐতিহাসিকভাবে রূপ পরিগ্রহ করা দর্শনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হল সত্তাতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ও নন্দনতত্ত্ব। বহুবিধ দার্শনিক সমস্যার সমাধানে গড়ে উঠেছে বিপরীত সব মতধারা: ডায়ালেকটিকস ও অধিবিদ্যা, যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ (অনুভূতিই সকল জ্ঞানের উৎস, এই দার্শনিক মত — অনুভূতিবাদ), প্রকৃতিবাদ ও অধ্যাত্মবাদ, নিমিত্তবাদ ও অ-নিমিত্তবাদ, ইত্যাদি। দর্শনের ঐতিহাসিক রূপগুলির মধ্যে আছে প্রাচীন ভারত, চীন ও মিশরের দার্শনিক মতবাদগুলি; প্রাচীন গ্রীসের দর্শন, বা দর্শনের ক্লাসিকাল রূপ (পারমেনিদস, হেরাক্লিটাস, সক্রেটিস, ডেমোক্রিটাস, ইপিকিউরাস, প্লেটো আরিস্টটল); মধ্যযুগীয় দর্শন — যাজকীয় দর্শন ও পরবর্তীকালে স্কলাস্টিক দর্শন; রেনেসাঁসের দর্শন (গালিলিও গালিলেই, বের্নার্দিনো তেলেসিও, কুসার নিকোলাস, জোর্দানো ব্রুনো); আধুনিক দর্শন (ফ্রান্সিস বেকন, রেনে দেকার্ত, টমাস হবস, বেনেদিক্ত স্পিনোজা, জন লক, জর্জ বার্কলে, ডেভিড হিউম, গটফ্রিড ভিলহেলম লেইবনিটস); ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদ (জুলিয়েন অফ্রয় দলা মেত্রি, দেনিস দিদেরো, ক্লদ আদ্রিয়েন হেলভেতিয়াস, পল আঁরি হলবাখ); ক্লাসিকাল জার্মান দর্শন (ইমানুয়েল কাণ্ট,

জন ফিখটে, ফ্রিডরিখ শেলিং, গিওর্গ হেগেল); লুডভিগ ফয়েরবাখের মতবাদ, মার্কস ও এঙ্গেলসের দার্শনিক অভিমত গঠনে যার প্রবল প্রভাব ছিল; রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের দর্শন (ভিস্সারিওন বেলিনস্কি, আলেক্সান্দর গের্ৎসেন, নিকোলাই চের্নিশেভস্কি, নিকোলাই দব্রোলিউবভ); আজকের দিনের বুর্জোয়া দর্শনের প্রধান প্রধান ধারা (ভাববাদের প্রকারভেদ): নব্যদৃষ্টবাদ, প্রয়োগবাদ, অস্তিত্ববাদ ব্যক্তিতাবাদ, প্রপঞ্চবাদ, নয়া-টমবাদ। মার্কস ও এঙ্গেলস-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও নতুন ঐতিহাসিক অবস্থায় লেনিন-কর্তৃক বিকশিত মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন হল দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, বৈজ্ঞানিক অবধারণার এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধক ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতিতত্ত্বগত ও বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিত্তি।

ধর্ম — এক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পৃথিবী সম্বন্ধে এক উপলব্ধি, এবং তদনুযায়ী আচরণ ও সবিশেষ ক্রিয়া (পুজা-তন্ত্র) যার ভিত্তি হল একজন ঈশ্বরের অথবা দেবতাবৃন্দের অস্তিত্বে, 'পরম পবিত্রের' অস্তিত্বে বিশ্বাস, অর্থাৎ কোনো ধরনের অতিপ্রাকৃততে বিশ্বাস; 'মানুষের মনে সেই সমস্ত বাহ্যিক শক্তির কাল্পনিক প্রতিফলন, যে শক্তিগুলি তাদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, যে প্রতিফলনে পার্থিব শক্তিগুলি অতিপ্রাকৃত শক্তিসমূহের রূপ পরিগ্রহ করে' (ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস)। ধর্মের আদিতম বহিঃপ্রকাশগুলি হল জাদু, টোটেমবাদ,

বস্তুরীতি, সর্বপ্রাণবাদ, ইত্যাদি। ধর্মের ঐতিহাসিক রূপগুলির মধ্যে আছে উপজাতীয়, জাতীয়-রাষ্ট্রিক (নৃজাতিগত) ও বিশ্বব্যাপী (বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম) ধর্ম। ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আদিম মানুষের অসহায়তা থেকে, এবং পরে, বৈরমূলক শ্রেণীবিভক্ত সমাজগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটায়, মানবজীবনে প্রাধান্যশালী স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক শক্তিগুলির সামনে তার অসহায়তা থেকে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা বলেছেন যে সমাজতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে ধর্ম ক্রমে ক্রমে লোপ পাবে, সমাজবিকাশের ফলে তা লোপ পেতে বাধ্য, শিক্ষা সেখানে একটা বড় ভূমিকা পালন করে।

ধারণা, প্রত্যয় (concept) — ১) চিন্তার একটি রূপ, তাতে প্রতিফলিত হয় বস্তু ও ব্যাপারসমূহের সারগত গুণ-ধর্ম, সংযোগ ও সম্পর্কগুলি। প্রত্যয়গুলির প্রধান যুক্তিগত ক্রিয়া হল সমস্ত একক বৈশিষ্ট্য থেকে বিমূর্তনের মধ্য দিয়ে এক শ্রেণীর বস্তুনিচয়ের অভিন্ন, সামান্য লক্ষণগুলি আলাদা করে বেছে নেওয়া; ২) যুক্তিবিদ্যায়, যে চিন্তার মধ্যে একটি শ্রেণীর অভ্যন্তরস্থ বস্তুনিচয়কে অভিন্ন ও বর্গীয়ভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষণগুলির ভিত্তিতে সামান্যীকৃত ও অন্যান্য বস্তু থেকে আলাদা করা হয়।

ধ্যান, গভীর চিন্তন (Meditation), লাতিন meditatio: অনুচিন্তন থেকে) — যে মানসিক ক্রিয়া

একজন ব্যক্তিকে অন্তর্দর্শন ও গভীর মনোনিবেশের দশায় উপনীত হতে সক্ষম করে। ধ্যানমগ্ন ব্যক্তিটির দেহ আত্তিমুক্ত, শিথিল থাকে, সে ভাবাবেগের কোনো চিহ্ন দেখায় না, এবং বাহ্যিক বিষয়সমূহ লক্ষ করে না। ধ্যানের পদ্ধতিগুলি বহুবিধ। ভারতীয় দর্শন ও ধর্মে, বিশেষত যোগে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; প্রাচীন গ্রীসে তা ব্যবহৃত হত পিথাগোরীয় মতবাদে, প্লেটোবাদে ও নব্যপ্লেটোবাদে; সুফি অতীন্দ্রিয়বাদের এবং কিছু পরিমাণে অর্থোডক্সি ও রোমান ক্যাথলিকবাদের বৈশিষ্ট্য। ধ্যান ও তার মনোভৈষজ দিকগুলিতে আগ্রহ হল মনোবিকলনের কয়েকটি ধারার (কার্ল গুস্টাভ ইয়ুং) বৈশিষ্ট্য।

নিমিত্তবাদ (Determinism, লাতিন determinare: স্থির করা, সীমা নির্দেশ করা থেকে) — সমস্ত ব্যাপারের বিষয়গত ও নিয়ম-শাসিত আন্তঃসংযোগ ও কার্য-কারণগত নির্ভরশীলতার দার্শনিক মতবাদ; বিশ্বজনীন কার্য-কারণ সম্বন্ধ যাতে অস্বীকার করা হয় সেই অ-নিমিত্তবাদের বিপরীত।

নিয়তিবাদ (Fatalism, লাতিন fatum: নিয়তি, ভাগ্য থেকে) — পৃথিবীতে সব ঘটনাই আগে থেকে স্থিরীকৃত, এই বিশ্বাস; এক নৈর্ব্যক্তিক নিয়তিতে বিশ্বাস (প্রাচীন স্টোয়িকবাদ) অথবা দৈব অদৃষ্টতে বিশ্বাস (বিশেষভাবে ইসলামের বৈশিষ্ট্য), ইত্যাদি।

নিয়ম — প্রকৃতি ও সমাজের ব্যাপারসমূহের মধ্যে এক আবশ্যিক, সারগত, স্থিতিশীল ও পুনঃসংঘটনশীল সম্পর্ক। নিয়মের ধারণাটি অন্তঃসারের ধারণার সমরূপ। নিয়ম হল 'সমানুবর্তিতার একটি রূপ' (এঙ্গেলস), কেননা তা এক নির্দিষ্ট ধরনের বা শ্রেণীর সকল ব্যাপারে সহজাত সামান্য সম্পর্ক ও সংযোগগুলিকে প্রকাশ করে। নিয়মগুলির তিনটি প্রধান গোষ্ঠী আছে: সুনির্দিষ্ট বা বিশেষ (যেমন বলবিদ্যায় বেগমাত্রার গঠনবিন্যাসের নিয়ম); বড় বড় গোষ্ঠীর ব্যাপারসমূহের সামান্য নিয়ম (যেমন শক্তি সংরক্ষণ ও রূপান্তরণের নিয়ম, বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম); ও সার্বিক নিয়ম (দ্বান্দ্বিকতার নিয়ম)। সামান্য ও বিশেষ নিয়মগুলির মধ্যে একটা দ্বান্দ্বিক আন্তঃসংযোগ আছে; সামান্য নিয়মগুলি ক্রিয়া করে বিশেষ নিয়মগুলির মধ্য দিয়ে, আর বিশেষ নিয়মগুলি হল সামান্য নিয়মগুলিরই বহিঃপ্রকাশ। নিয়মগুলি বিষয়গত এবং সেগুলির অস্তিত্ব মানবচৈতন্য-নিরপেক্ষ। নিয়মগুলি সম্বন্ধে অবধারণাই বিজ্ঞানের কর্তব্যকর্ম, তা মানুষের দ্বারা প্রকৃতি ও সমাজের রূপান্তরসাধনের ভিত্তি স্থাপন করে।

নিরীশ্বরবাদ (Atheism, গ্রীক atheos: নিরীশ্বর থেকে) — ঈশ্বরে অবিশ্বাস; একটি দেবতার অস্তিত্ব ও তাই ধর্মের অস্তিত্ব অস্বীকার। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নিরীশ্বরবাদী প্রচার শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট শিক্ষার একটি উপাদান।

পক্ষভুক্তি (Partisanship) — দলীয় অঙ্গীকারবদ্ধতা — ১) একটি রাজনৈতিকদলের সদস্যপদ; ২) এক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন, সামাজিক বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পের এমন এক ভাবাদর্শগত অভিমুখীনতা, যা নির্দিষ্ট শ্রেণীসমূহ বা সামাজিক গোষ্ঠীগুলির স্বার্থকে প্রতিফলিত করে এবং প্রকাশ পায় বিজ্ঞান ও শিল্পের সামাজিক প্রবণতাসমূহে তথা ব্যক্তিগত মনোভাব ও অবস্থানে। ব্যাপক অর্থে, তা মানবিক আচরণের নীতি, সংগঠনগুলির কাজকর্ম, এবং রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রামকে বোঝায়। দলীয় অঙ্গীকারবদ্ধতা হল বিকশিত শ্রেণীগত বিপরীতসমূহের ফল ও রাজনৈতিক অভিব্যক্তি; রাজনৈতিক পার্টিগুলির কাজকর্মের সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। দলীয় অঙ্গীকারবদ্ধতা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এক ইচ্ছাকৃত ও প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত নীতি, যা বোঝায় বাস্তবের এক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার এক সংমিশ্রণকে; সেই স্বার্থ অন্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থানুগ ও ইতিহাসের বিষয়গত ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কমিউনিস্ট পার্টি বিষয়ীমুখতা, অ-দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি, মতাদর্শ-লোপ, ও ভাবাদর্শগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সংক্রান্ত বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদী মতবাদগুলির বিরোধিতা করে এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শের দৃঢ়পণ সমালোচনা, ক্রিয়াকলাপের সকল ক্ষেত্রে এক পার্টিগত, শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির আহ্বান জানায়।

পদ্ধতি (Method, গ্রীক methodos: অনুসন্ধান, তত্ত্ব, মতবাদের পন্থা) — কোনো লক্ষ্য অর্জন বা একটি মূর্ত-নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের পন্থা বা প্রক্রিয়া; বাস্তবের ব্যবহারিক বা তত্ত্বগত আত্তীকরণে (অবধারণায়) ব্যবহৃত এক প্রস্ত কলাকৌশল বা ক্রিয়া। দর্শনে পদ্ধতি হল সেই প্রণালী, যার মধ্যে দার্শনিক জ্ঞানের এক প্রণালীতন্ত্র সূত্রবদ্ধ ও প্রতিপাদিত হয়। মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের পদ্ধতি হল বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস।

পদ্ধতিতত্ত্ব (Methodology) — ক্রিয়াকলাপের গঠনকাঠামো, যৌক্তিক সংগঠন, পদ্ধতি ও উপায় সম্বন্ধে এক মতবাদ; বিজ্ঞানের পদ্ধতিতত্ত্ব — বৈজ্ঞানিক অবধারণার নীতি, রূপ ও প্রণালীসমূহ সম্বন্ধে এক মতবাদ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল ঐতিহাসিক গবেষণার সাধারণ পদ্ধতিতত্ত্ব। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতিতত্ত্ব শুধু তত্ত্বগত অবধারণারই নয়, বাস্তবের বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনেরও হাতিয়ার।

পরম ভাব (Absolute idea) — ভাববাদী দর্শনে, এক অতি প্রাকৃত ও অ-শর্তসাপেক্ষ আধ্যাত্মিক নীতির ধারণা, এমন এক অন্তঃসার যা প্রকৃতির জন্মের আগে থেকেই ছিল, এক নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা যা জন্ম দেয় বস্তুজগতের: প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ ও মানবচিন্তার।

পরার্থবাদ (Altruism, ফরাসী altruisme থেকে) — অপরের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থ মনোযোগ।

অহংবাদের বিপরীত হিসেবে কথাটি প্রবর্তন করেছিলেন আউগ্যুস্ত কোঁত।

পরিমাণ (Quantity) — একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, যা প্রকাশ করে বিষয়টির বাহ্যিক নির্ধারকতা: তার আকার, ত্রৈমাত্রিক আয়তন, তার গুণ-ধর্মগুলির বিকাশের মাত্রা, ইত্যাদি; পরিমাণে পরিবর্তন একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় পেঁছলে, গুণে তা এক পরিবর্তন ঘটায়।

পুনরুপস্থাপন, প্রদর্শন (Representation) — ইতিপূর্বে দেখা একটি বিষয় বা ব্যাপারের ভাবরূপ (স্মরণ, অনুস্মৃতি) অথবা উৎপাদনশীল কল্পনা-সৃষ্ট এক ভাবরূপ; ইন্দ্রিয়জ প্রতিফলনের সর্বোচ্চ ভাবরূপবাহী রূপ।

পৃথিবীর ভূকেন্দ্রিক (টলেমীয়) প্রণালী — মহাবিশ্বের কেন্দ্র হিসেবে পৃথিবী সম্বন্ধে এক নৃবিদ্যাকেন্দ্রিক ধারণা, তা গড়ে উঠেছিল প্রাচীন গ্রীসে এবং স্থায়ী হয়েছিল মধ্যযুগের শেষ দিক পর্যন্ত। ভূকেন্দ্রিক প্রণালী অনুযায়ী, গ্রহগুলি, সূর্য ও অন্যান্য গাগনিক পদার্থ চক্রাকার কক্ষপথের এক জটিল ছকে পৃথিবীর চার পাশে ঘোরে। পৃথিবীর ভূকেন্দ্রিক প্রণালী শেষ পর্যন্ত সূর্যকেন্দ্রিক প্রণালীর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

পৃথিবীর সূর্যকেন্দ্রিক প্রণালী — সৌরজগতের গঠনকাঠামো সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল রেনেসাঁসের সময়ে (নিকোলাস কোপারনিকাস), তাতে সূর্যকে দেখানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় হিসেবে, গ্রহগুলি তার চারপাশে আবর্তিত হয়। সূর্যকেন্দ্রিক প্রণালী খ্রীষ্টীয় গীর্জা কর্তৃক প্রচারিত এই ধারণার উপরে আঘাত হেনেছিল যে পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র; প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশে তা বিপ্লব ঘটিয়েছিল।

প্রণালীতন্ত্র, ব্যবস্থাতন্ত্র, ব্যবস্থা (System, গ্রীক Systema: নানা অংশ দিয়ে গঠিত এক সমগ্র, এক সম্মিলন) — পরস্পর সম্পর্কিত ও আন্তঃসংযুক্ত উপাদানসমূহের এক সমষ্টি, যা এক অখণ্ড সমগ্র গঠন করে। প্রণালীগুলি বস্তুগত ও বিমূর্ত হতে পারে। প্রথমোক্তগুলি অজৈব (পদার্থগত, ভূতাত্ত্বিক, রাসায়নিক, প্রভৃতি) ও জৈবতে (সরলতম জীববিদ্যাগত প্রণালীতন্ত্র, জীবাঙ্গ, জনসমষ্টি, প্রজাতি, জীবপরিবেশ-প্রণালী) বিভক্ত; সামাজিক ব্যবস্থাগুলি (সরলতম পরিমেল থেকে সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনকাঠামো পর্যন্ত) বস্তুগত জীবন্ত প্রণালীতন্ত্রগুলির এক-এক বিশেষ শ্রেণী। বিমূর্ত প্রণালীতন্ত্রগুলির মধ্যে আছে ধারণা, প্রকল্প, বিভিন্ন প্রণালীতন্ত্র সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ভাষাগত আকারীকৃত, যুক্তিগত প্রণালীতন্ত্র, ইত্যাদি। আধুনিক বিজ্ঞানে, প্রণালীতন্ত্রগুলি অধীত হয় প্রণালীতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, প্রণালীতন্ত্রের বহুবিধ বিশেষ তত্ত্ব, সাইবারনেটিকস

প্রণালীতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রণালীতন্ত্র বিশ্লেষণ, প্রভৃতির কাঠামোর মধ্যে।

প্রণালীতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি (Systems approach) — প্রণালীতন্ত্র হিসেবে বিষয়সমূহের পরীক্ষাভিত্তিক বৈজ্ঞানিক অবধারণা ও সামাজিক কর্মপ্রয়োগের পদ্ধতিতত্ত্বের একটি শাখা; গবেষককে তা বিষয়টির অখণ্ডতা উদ্ঘাটন করার দিকে, তার ভিতরকার বহুবিধ ধরনের সংযোগ নির্ণয় করা ও এক একীকৃত তত্ত্বগত চিত্রের মধ্যে এগুলিকে একত্র করার দিকে অভিমুখী করে। প্রণালীতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত হয় জীববিদ্যা, জীবপরিবেশবিদ্যা, মনোবিদ্যা, সাইবারনেটিকস, প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, প্রভৃতিতে। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, তার মূলনীতিগুলিকে তা মূর্ত-নির্দিষ্ট করে।

প্রতিরূপ, ভাবরূপ (Image) — ১) মানবচৈতন্যে বস্তুজগতের বিষয় ও ব্যাপারসমূহের প্রতিফলনের এক ফল বা ভাবগত রূপ। অবধারণার ইন্দ্রিয়জ পর্যায়ে, প্রতিরূপগুলি সম্পর্কিত থাকে সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ও পুনরূপস্থাপনের সঙ্গে; এবং মানসিক পর্যায়ে, সম্পর্কিত থাকে প্রত্যয়, বিচারগত সিদ্ধান্ত ও অনুমানের সঙ্গে। ব্যবহারিক ক্রিয়া, ভাষা ও বিভিন্ন চিহ্ন-আদলের বস্তুগত রূপে প্রতিরূপগুলি মূর্ত হয়। আধেয়র দিক থেকে প্রতিরূপ হল বিষয়গত, কেননা বিষয়কে তা

যথোপযুক্তভাবে প্রতিফলিত করে; ২) শৈল্পিক ভাবরূপ — কলাশিল্পে বাস্তবের আত্মীকরণের একটি ধরন ও রূপ, যার মধ্যে ইন্দ্রিয়জ উপাদানসমূহ ও অর্থ পরস্পরগ্রথিত হয়।

প্রত্যক্ষণ (Perception) — এক অতি জটিল প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে জীবাঙ্গ তথ্য গ্রহণ ও প্রক্রিয়ণ করে, এবং যা লোককে বিষয়গত বাস্তব প্রতিফলিত করতে ও পারিপার্শ্বিক জগতে নিজের যথাস্থান খুঁজে পেতে সক্ষম করে। ইন্দ্রিয়জ প্রতিফলনের একটি রূপ হিসেবে, তার অন্তর্ভুক্ত হল প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বিষয়টির সনাক্তকরণ, তার পৃথক পৃথক দিকগুলি নির্ণয়ন, ক্রিয়ার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সমঞ্জস তার অর্থপূর্ণ আধেয় সনাক্তকরণ এবং লক্ষিত বিষয়টির এক ভাবরূপ গঠন।

প্রবণতা (Tendency) — ১) কোনো ব্যাপার বা ভাবের বিকাশের গতিমুখ; ২) কলাশিল্পে, ক) শৈল্পিক চিন্তার একটি অঙ্গ: একটি শিল্পকর্মে ভাবাদর্শগত ও ভাবাবেগগত অভিমুখীনতা, সমস্যাবলী ও চরিত্রগুলি সম্বন্ধে রচনাকারের অভিমত ও মূল্যায়ন, ভাবরূপের এক প্রণালীতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশিত; খ) সংকীর্ণ অর্থে, রচনাকারের সামাজিক, রাজনৈতিক বা নৈতিক পছন্দ-অপছন্দ যা ভাবরূপগুলিতে বিধৃত নয়, বাস্তবের এক বিষয়গত চিত্রণের লক্ষ্যে একটি বাস্তববাদী শিল্পকর্মে খোলাখুলি প্রকাশিত।

বস্তু (Matter) — 'এক দার্শনিক মূল প্রত্যয় যার দ্বারা বোঝায় সেই বিষয়গত বাস্তব যা... আমাদের সংবেদনগুলির দ্বারা প্রতিফলিত, অথচ সেগুলি থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান' (লেনিন); সারপদার্থ: পৃথিবীতে প্রকৃতই বিদ্যমান গতির সমস্ত গুণ-ধর্ম, সংযোগ ও রূপের আধার (ভিত্তি)। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ পৃথিবীর বস্তুগত ঐক্য ও চৈতন্যের ব্যাপারে বস্তুর মুখ্যতার নীতি থেকে শুরু করে। বস্তু অসৃজনীয় ও অবিনাশী, অসীম ও চিরন্তন। গতি হল বস্তুর এক সহজাত গুণ; বস্তুর বৈশিষ্ট্য হল আত্ম-বিকাশ ও বিভিন্ন দশার পরিবর্তন। স্থান ও কাল হল বস্তুর সার্বিক বিষয়গত রূপ, এবং প্রতিফলন তার সার্বিক গুণ-ধর্ম। আধুনিক বিজ্ঞানে নিম্নলিখিত ধরনের বস্তুগত ব্যবস্থাতন্ত্র ও বস্তুর তদনুযায়ী গঠনকাঠামোগত স্তরগুলির কথা জানা আছে: প্রাথমিক কণিকা ও ক্ষেত্র, পরমাণু, অণু, বিভিন্ন আয়তনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক পদার্থ, ভূতাত্ত্বিক ব্যবস্থাতন্ত্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ-অভ্যন্তরস্থ নক্ষত্রপুঞ্জ, ছায়াপথ, ছায়াপথের নক্ষত্রপুঞ্জ। বিশেষ বিশেষ ধরনের বস্তুগত ব্যবস্থাতন্ত্র: সজীব বস্তু (আত্মপুনরুৎপাদনক্ষম) ও সামাজিকভাবে সংগঠিত বস্তু (সমাজ)।

বস্তু (Thing) — বস্তুগত বাস্তবের আপেক্ষিকভাবে স্বতন্ত্র ও স্থিতিশীল এক বিষয়।

বস্তুবাদ (Materialism, লাতিন materia: বস্তু, ভৌত পদার্থ থেকে) — যে দার্শনিক ধারায় ধরে

নেওয়া হয় যে পৃথিবী বস্তুগত, তার অস্তিত্ব আছে বিষয়গতভাবে, চৈতন্যের বাইরে ও চৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে, বস্তুই মুখ্য, তা কারও দ্বারা সৃষ্ট হয় নি এবং আছে বাহ্যিকভাবে, চৈতন্য, চিন্তন হল বস্তুরই একটি গুণ-ধর্ম; পৃথিবী ও তার নিয়মগুলি জ্ঞেয়। বস্তুবাদ ভাববাদের বিরোধী, এবং তাদের সংগ্রামই ঐতিহাসিক-দার্শনিক প্রক্রিয়ার আধেয়। 'বস্তুবাদ' কথাটি ১৭শ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হয়েছিল প্রধানত বস্তু সম্বন্ধে পদার্থবিদ্যাগত ধারণাগুলির অর্থে, এবং ১৮শ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে তা ব্যবহৃত হয়েছে দার্শনিক অর্থে, ভাববাদের বৈপরীত্যে। বস্তুবাদের ঐতিহাসিক রূপগুলির মধ্যে আছে প্রাচীন প্রাচ্যের বস্তুবাদী মতগুলি, প্রাচীনকালের বস্তুবাদ (ডেমোক্রিটাস, এপিকিউরাস), রেনেসাঁস বস্তুবাদ (বের্নার্দিনো তেলেসিও, জোর্দানো ব্রুনো), ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর অধিবিদ্যক (অধিযন্ত্রবাদী) বস্তুবাদ (গ্যালিলিও গ্যালিলেই, ফ্রান্সিস বেকন, টমাস হবস, পিয়ের গাস্-সেন্দি, জন লক, বেনেদিক্ত স্পিনোজা), ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদ (জুলিয়েন অফ্রয় দলা মেত্রি, ক্লদ আদ্রিয়েন হেলভেশিয়াস, পল আঁরি হলবাখ, দেনিস দিদেরো), নৃবিদ্যাগত বস্তুবাদ (লুডভিগ ফয়েরবাখ), রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের বস্তুবাদ (ভিসসারিওন বেলিনস্কি, আলেক্সান্দর গের্ৎসেন , নিকোলাই চের্নিশেভস্কি, নিকোলাই দব্রোলিউবভ)। দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সৃষ্টি করেছিলেন ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মার্কস ও এঙ্গেলস এবং নতুন ঐতিহাসিক

পরিস্থিতিতে তাকে বিকশিত করেছিলেন লেনিন। বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিকাশের সমগ্র গতিধারাই দার্শনিক বস্তুবাদের সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন করে।

বস্তুরতি বা অচেতনপদার্থাদিতে অন্ধ ভক্তি (Fetishism, ফরাসী fétiche: বিগ্রহ, কবচ থেকে) — কুহকী গুণ-ধর্মের অধিকারী বলে পরিগণিত অচেতন পদার্থসমূহে ভক্তি। সমস্ত আদিম জনজাতির মধ্যে বস্তুরতি বহুল প্রচলিত ছিল, এবং আমাদের যুগে তার জেরগুলির মধ্যে আছে মন্ত্রপূত কবচ, তাবিজ, প্রভৃতিতে বিশ্বাস। আজকের দিনের ধর্মগুলিতেও তা দেখতে পাওয়া যায়: মক্কার কালো পাথর (ইসলাম) বা ক্রুশ ও দেহাবশেষের (খ্রীষ্টধর্ম) প্রতি ভক্তি। মার্কস বস্তুরতি কথাটি অর্থশাস্ত্রে ব্যবহার করেছেন।

বাস্তব — যা প্রকৃতই বিদ্যমান; দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিষয়গত বাস্তব, অর্থাৎ বস্তু, আর বিষয়ীগত বাস্তব, অর্থাৎ চৈতন্য, এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করে।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক — দার্শনিক মূল প্রত্যয়; বাহ্যিক সামগ্রিকভাবে বিষয়টির গুণ-ধর্ম এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে তার মিথষ্ক্রিয়াকে প্রকাশ করে, এবং আভ্যন্তরিক প্রকাশ করে বিষয়টির গঠনকাঠামো ও অন্তঃসার; অবধারণায় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিকের মধ্যে আন্তঃসংযোগ প্রথমোক্তটি থেকে শেষোক্তটির দিকে এক অগ্রগতি।

বিকাশ — বস্তু ও চৈতন্যের অমোঘ লক্ষ্যগত ও নিয়ম-শাসিত পরিবর্তন, সেগুলির সার্বিক গুণ-ধর্ম। বিকাশের ফলে দেখা দেয় বিষয়টির, তার গঠনবিন্যাস ও গঠনকাঠামোর এক নতুন গুণগত দশা। প্রকৃতি, সমাজ ও জ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিকাশ একটা সার্বিক নীতি। বিকাশের দুটি দ্বান্দ্বিকভাবে আন্তঃসংযুক্ত দিক আছে: ক্রমবিকাশমূলক, যার লক্ষণ হল বিষয়টিতে ক্রমান্বিত গুণগত পরিবর্তন, এবং বৈপ্লবিক, যার লক্ষণ হল বিষয়টির গঠনকাঠামোতে গুণগত পরিবর্তন।

বিকাশ পরিবর্তনশীল, আরোহী ধারায় হতে পারে, এবং প্রতীপগতিশীল, অবরোহী ধারায় হতে পারে। বিকাশের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী মতবাদ হল কমিউনিস্ট নীতিতে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনের তত্ত্বের দার্শনিক ও পদ্ধতিতত্ত্বগত ভিত্তি।

বিজ্ঞান — মানবিক ক্রিয়াকলাপের একটি ক্ষেত্র যার কাজ হল বাস্তব সম্বন্ধে বিষয়গত জ্ঞান আহরণ ও তত্ত্বগতভাবে প্রণালীবদ্ধ করা; সামাজিক চৈতন্যের অন্যতম রূপ; নতুন জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াকলাপ; ও একই সঙ্গে, এরূপ ক্রিয়াকলাপের ফল, জ্ঞানের সামগ্রিকতা, যা পৃথিবীর এক বৈজ্ঞানিক চিত্র গঠন করে; বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পৃথক পৃথক শাখা। তার আশু লক্ষ্যগুলি হল তার আবিষ্কৃত নিয়মগুলির ভিত্তিতে বাস্তবের প্রক্রিয়া ও ব্যাপারসমূহের বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও পূর্বাভাস করা। বিজ্ঞানের প্রণালীতন্ত্র

মোটামুটিভাবে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও কৃৎকৌশলগত প্রণালীতন্ত্রে বিভক্ত। দর্শন, ভাবাদর্শ ও রাজনীতির সঙ্গে বিজ্ঞান সংযুক্ত, তা সামাজিক বিজ্ঞানের পক্ষভুক্তি-মূলক চরিত্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিমূলক ভূমিকা নির্ধারণ করে। সমাজপ্রগতির প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে প্রাচীন পৃথিবীতে প্রথমে আত্ম-প্রকাশ করার পর, বিজ্ঞান গড়ে উঠতে শুরু করে ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে, ঐতিহাসিক বিকাশধারায় তা পরিণত হয় একটি উৎপাদনী শক্তিতে ও এক প্রধান সামাজিক প্রতিষ্ঠানে; সমাজের সকল ক্ষেত্রের উপর যার প্রভাব অনেক খানি। মার্কসবাদের আত্মপ্রকাশ সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশে এক বিপ্লবস্বরূপ। ১৭শ শতাব্দীর পর থেকে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের পরিমাণ (আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক তথ্য, গবেষণা কর্মীদের সংখ্যা) প্রতি ১০-১৫ বছরে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞানের বিকাশ হল বিস্তৃত ও বৈপ্লবিক কালপর্বগুলির এক পর্যায়ক্রম, যখন বৈজ্ঞানিক বিপ্লবগুলির ফলে তার গঠনকাঠামোতে, জ্ঞানের নীতিসমূহে ও মূল প্রত্যয় ও পদ্ধতিগুলিতে, তথা তার সংগঠনের রূপগুলিতেও পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল প্রভেদন ও সংবদ্ধতাসাধন প্রক্রিয়ার এক দ্বান্দ্বিক পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সময়ে, এক সংবদ্ধ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাতে প্রধান ভূমিকা পালন করে বিজ্ঞান। পুঁজিবাদে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বগুলিকে বেশির ভাগই ব্যবহার করা

হয় শাসক একচেটিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে। সমাজতন্ত্রে কমিউনিজমের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান একটা বড় ভূমিকা পালন করে, সামাজিক সম্পর্কগুলিকে ত্রুটিহীন করে, এবং গঠন করে নতুন মানুষ; বিজ্ঞান এখানে জাতিব্যাপী পরিসরে পরিকল্পিত।

বিপরীত (Opposite) —একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, তা একটি দ্বান্দ্বিক বিরোধের দিকগুলির একটিকে প্রতিফলিত করে।

বিমূর্তন (Abstraction, লাতিন abstractus: অপসৃত, প্রত্যাহৃত থেকে) — অবধারণার একটি রূপ, যার ভিত্তি হল একটি বস্তুর সারগত গুণ-ধর্ম ও সংযোগগুলির মানসিক একাত্মকরণ ও তার অন্যান্য, বিশেষ গুণ-ধর্ম ও সংযোগগুলি থেকে অপসারণ; বিমূর্তন-প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ এক সামান্য ধারণা; 'মানসিক' বা 'ধারণাগত' শব্দের সমার্থবোধক। প্রধান প্রধান ধরনের বিমূর্তনের মধ্যে পড়ে বিচ্ছিন্নকরণমূলক বিমূর্তন (যা নির্দিষ্ট ব্যাপারটিকে কোনো অখণ্ডতা থেকে আলাদা করে নেয়), সামন্যীকরণমূলক বিমূর্তন (যা ব্যাপারটির এক সামান্যীকৃত চিত্র উপস্থিত করে), এবং আদর্শীকরণ (যা বাস্তব অভিজ্ঞতামূলক ব্যাপারটির প্রতিকল্প করে এক আদর্শীকৃত পরিকল্পকে)। বিমূর্তকে মূর্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়।

বিরোধ, দ্বন্দ্ব (Contradiction) (আকারনিষ্ঠ যুক্তিবিদ্যায়) — একটি যুক্তি, বয়ান বা তত্ত্বে দুটি বক্তব্যের অস্তিত্ব, যার একটি অপরটিকে অস্বীকার করে; এই বক্তব্যগুলির একত্রমিলন বা তুল্যতার প্রমাণসাধ্যতা; ব্যাপকতর অর্থে, আপাতভাবে পৃথক বিষয়সমূহের ঐকাত্ম্য প্রতিষ্ঠা। এখানে বিরোধ যুক্তিটির হেত্বাভাস অথবা সেই যুক্তির প্রস্থানসূত্রগুলির গরমিল দেখিয়ে দেয়। তত্ত্ব ও প্রতিজ্ঞাগুলিকে এক বিরোধে পর্যবসিত করে সেগুলিকে খন্ডন করার জন্য, এবং পরোক্ষ প্রমাণ যোগানোর জন্যও এরূপ পরিস্থিতি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য বিরোধের অনুপস্থিতি একটা আবশ্যিক দাবি।

বিরোধ, দ্বন্দ্ব (দ্বান্দ্বিক) (Contradiction) — একটি বিষয় বা প্রণালীতন্ত্রের বিপরীত, পারস্পরিকভাবে পরিহারকর দিকগুলির মিথষ্ক্রিয়া, যে দিকগুলি একই সময়ে রয়েছে আভ্যন্তরিক ঐক্যে ও পরস্পর অনুপ্রবেশের অবস্থায়; এবং যেগুলি বিষয়গত পৃথিবী ও অবধারণার আত্ম-গতি ও বিকাশের উৎস। দ্বান্দ্বিক বিরোধের মূল প্রত্যয়টি বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রামের নিয়মের সারমর্মকে প্রকাশ করে এবং বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসে তা কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে। দ্বান্দ্বিক বিরোধ তার বিকাশে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়: পার্থক্য, মেরুপ্রান্তিকতা, সংঘর্ষ, বৈরভাব এবং বিপরীতসমূহের একটির

অপরটিতে রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সর্বোচ্চ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছয়; সেই পর্যায়ে দ্বান্দ্বিক বিরোধের নিরসন হয় এবং প্রণালীতন্ত্রটি একটি গুণগত দশা থেকে আরেকটি গুণগত দশায় যায়। দ্বান্দ্বিক বিরোধগুলি হতে পারে বুনিয়াদি ও অ-বুনিয়াদি, সারগত ও অ-সারগত, আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক (প্রণালীতন্ত্রের বিকাশের উপরে সেগুলির প্রভাবসাপেক্ষে), বৈরমূলক ও অ-বৈরমূলক।

বিলুপ্তি, ধ্বংসসাধন (Annihilation, লাতিন annihilare: নাস্তিতে পর্যবসিত করা থেকে) — পদার্থবিদ্যায় প্রাথমিক কণিকাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রতিক্রিয়া, যাতে একটি কণিকা ও তার বিরুদ্ধ-কণিকার সংঘর্ষ ঘটে অন্তর্হিত হয়ে যায়, শক্তি নিঃসৃত করে অথবা অন্যান্য কণিকায় পরিণত হয়, যেগুলির সংখ্যা ও ধরন শক্তির নিত্যতার নিয়মের দ্বারা সীমিত। যেমন, এক জোড়া ইলেকট্রন-পজিট্রনের বিলুপ্তি ফোটন নিঃসৃত করে, এবং এক জোড়া নিউক্লিয়ন ও অ্যান্টিনিউক্লিয়ন নিঃসৃত করে মেসন শ্রেণীর কণিকাসমূহ। বিপরীত প্রক্রিয়াকে বলা হয় জোড়া উৎপাদন।

বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্ববীক্ষা (World outlook) — বিষয়গত পৃথিবীতে ও সেখানে মানুষের স্থান সম্বন্ধে, পারিপার্শ্বিক বাস্তব ও নিজেদের প্রতি জনগণের মনোভাব সম্বন্ধে, সামান্যীকৃত অভিমতের এক প্রণালীতন্ত্র, এবং সেই সঙ্গে তাদের মতপ্রত্যয়, আদর্শ,

জ্ঞানের নীতিসমূহ ও এই সমস্ত অভিমত থেকে উদ্ভূত ক্রিয়াকলাপের এক প্রণালীতন্ত্র। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক-ঐতিহাসিক, কৃৎকৌশলগত ও দার্শনিক জ্ঞান ও তৎসহ এক নির্দিষ্ট ভাবাদর্শের ভিত্তিতে তা গঠিত; তার বাহক হল ব্যক্তিমানুষ ও সামাজিক গোষ্ঠী, যা বাস্তবকে দেখে এক নির্দিষ্ট বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির ত্রিশির কাচের মধ্য দিয়ে। তা বিরাট ব্যবহারিক গুরুত্বপূর্ণ, মানুষের আচরণের মান, মৌল আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ, কাজ ও দৈনন্দিন জীবনকে তা প্রভাবিত করে। শ্রেণীভিত্তিক সমাজে, বিশ্ব দৃষ্টভঙ্গির এক শ্রেণীগত চরিত্র থাকে, এবং সামাজিক স্থানমর্যাদা ও জীবনের অবস্থার পার্থক্যকে তা প্রতিফলিত করে। অন্তর্বস্তু ও গতিমুখের দিক দিয়ে তা বৈজ্ঞানিক অথবা অবৈজ্ঞানিক, বস্তুবাদী বা ভাববাদী, নিরীশ্বরবাদী বা ধর্মীয়, বৈপ্লবিক বা প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে। আজকের দিনের পৃথিবী কমিউনিস্ট ও বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এক তীব্র সংগ্রামের দৃশ্যপট। পৃথিবীর বৈপ্লবিক রূপান্তরের হাতিয়ার মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শন যার মর্মকেন্দ্র, সেই কমিউনিস্ট বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রাধান্যশালী হয়; শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপকতম অংশের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি গঠনই কমিউনিস্ট পার্টির ভাবাদর্শগত শিক্ষামূলক কাজের প্রধান উদ্দেশ্য।

বিশ্বাসবাদ (Fideism, লাতিন fides: বিশ্বাস থেকে) — একটি ধর্মীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, তাতে

যুক্তিতর্কের উপরে বিশ্বাসের প্রাধান্য দাবি করা হয়, ঈশ্বরবাদী ধর্মগুলির বৈশিষ্ট্য।

বিশ্লেষণ (Analysis, গ্রীক analyein: ভেঙে টুকরো করা থেকে) — ১) একটি সমগ্রকে বিভিন্ন উপাদানে মানসিকভাবে বা বাস্তবে ব্যবচ্ছেদ; বিশ্লেষণ সংশ্লেষণের (উপাদানসমূহের একটি সমগ্রে মিলন) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; ২) সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমার্থবোধক; ৩) আকারনিষ্ঠ যুক্তিবিদ্যায়, একটি যুক্তির যুক্তিবিদ্যাগত রূপের (গঠনকাঠামোর) নির্দিষ্টকরণ।

বিষয় — একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, বিষয়ীর বা প্রয়োজকের বস্তুগত কর্মপ্রয়োগ ও অবধারণামূলক ক্রিয়াকলাপে যা তার সম্মুখীন হয় তাকে প্রকাশ করে। মানুষ ও তার চৈতন্যনিরপেক্ষভাবে বিদ্যমান বিষয়গত বাস্তব হল ইতিহাসের ধারায় বিশদীকৃত বিভিন্ন রূপের ক্রিয়াকলাপ, ভাষা ও জ্ঞানে অবধারণাকারী ব্যক্তির পক্ষে একটি বিষয়।

বিষয়ী, প্রয়োজক (Subject, লাতিন subjectus: তলায় নিক্ষিপ্ত, নিচে নিহিত থেকে) — বস্তুগত কর্মপ্রয়োগ ও অবধারণার (একক বা সামাজিক গোষ্ঠী) বাহন, বিষয়ের দিকে চালিত ক্রিয়াকলাপের উৎস। বিষয়ীর সামাজিক-ঐতিহাসিক চরিত্র প্রদর্শন করে মার্কসবাদ দেখিয়েছে যে জনসাধারণই ইতিহাসের সত্যকার বিষয়ী বা প্রয়োজক।

বিষয়ীগত, বিষয়ীমুখ (Subjective) — বিষয়ীর বৈশিষ্ট্যসূচক, অথবা তার ক্রিয়াকলাপ থেকে উদ্ভূত কিছু; জ্ঞানের যে সমস্ত জায়গায় বিষয়টিকে ঠিক যথাযথভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে পুনরুপস্থাপিত করা হয় না, সেই রকম জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

বিষয়ীবাদ, বিষয়ীমুখিতা (Subjectivism) — বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির একটি ধরন, যাতে প্রকৃতি ও সমাজের বিষয়গত নিয়মগুলিকে উপেক্ষা করা হয়; ভাববাদের অন্যতম জ্ঞানতত্ত্বগত উৎস, রাজনীতিতে সংশোধনবাদ ও স্বতঃপ্রণোদনাবাদের দার্শনিক ভিত্তি।

বুর্জোয়া শ্রেণী (Bourgeoisie) — পুঁজিবাদী সমাজের শাসক শ্রেণী, উৎপাদনের উপায়ের মালিক, মজুরি-শ্রম শোষণ করে। তার আয়ের উৎস হল উদ্বৃত্ত-মূল্য। বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট পুঁজিপতিদের নিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী গঠিত, পুঁজিবাদী সমাজে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে বৃহৎ বুর্জোয়ারা। পুঁজিবাদের উঠতির সময়ে বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল একটি প্রগতিশীল শ্রেণী। ১৬শ-১৯শ শতাব্দীর বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছিল। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়েতের আত্মপ্রকাশ ঘটায় বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমেই বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, সাম্রাজ্যবাদের অবস্থায় তা পরিণত হয় সমাজপ্রগতির প্রধান

প্রতিবন্ধকে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এক দ্বৈত ভূমিকা পালন করে: সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু দেশে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠলে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশ চলে যায় আভ্যন্তরিক প্রতিক্রিয়ার পক্ষে। সমাজতন্ত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্বের সামাজিক-অর্থনৈতিক শর্তগুলি দূর করে।

বৈরভাব (Antagonism, গ্রীক antagonisma: প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংগ্রাম থেকে) — বৈরি শক্তি বা প্রবণতাগুলির এক অমীমাংসেয় সংগ্রামের দ্বারা চিহ্নিত বিরোধ। সমাজে বিপরীত শ্রেণীগুলির মধ্যে বৈরভাবের নিষ্পত্তি ঘটে শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

বৈরমূলক বিরোধ (Antagonistic contradiction) — শোষণমূলক শ্রেণীভিত্তিক সমাজগুলির উৎপাদন-প্রণালী ও সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যসূচক বিরোধের একটি রূপ; তার নিষ্পত্তি হয় সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে। বৈরমূলক বিরোধগুলি হল নিপীড়নকারী ও নিপীড়িতের, শোষক ও শোষিতের আপোসহীন স্বার্থের এক অভিব্যক্তি।

ভাবগত, আদর্শ (Ideal) — ১) চৈতন্যে প্রতিফলিত একটি বিষয়ের সত্তার ধরন (এই ক্ষেত্রে ভাবগতকে সাধারণত উপস্থিত করা হয় বস্তুগতর

বৈপরীত্যে); ভাবগতকরণের প্রক্রিয়ার এক ফল; একটি বিমূর্ত বিষয় যা পরীক্ষায় লব্ধ হয় না (যেমন 'ভাবগত গ্যাস' বা 'বিন্দু'); ২) একটা আদর্শের সঙ্গে মেলে এমন ত্রুটিহীন একটা কিছু।

ভাববাদ (Idealism, গ্রীক idea: রূপ বা মডেল থেকে) — যে সমস্ত দার্শনিক মতবাদে বলা হয় যে অধ্যাত্মা, চৈতন্য, চিন্তন, মানসিক হল মুখ্য আর বস্তু, প্রকৃতি, পদার্থগত হল গৌণ ও ব্যুৎপত্তিলব্ধ। সত্তা ও চৈতন্যের মধ্যে, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিকের মধ্যে সম্পর্ক — দর্শনের এই বুনিয়াদি প্রশ্নের উত্তরের ব্যাপারে ভাববাদ হল বস্তুবাদের বিপরীত। এই মতবাদ দেখা গিয়েছিল ২,৫০০ বছরেরও আগে, আর দর্শনে দুটি বিপরীত শিবিরের একটির পরিচায়ক হিসেবে 'ভাববাদ' কথাটি প্রথম দেখা দিয়েছিল ১৮শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ভাববাদের প্রধান রূপ দুটি: বিষয়গত ও বিষয়ীগত। প্রথমোক্তটির বক্তব্য এই যে মানবচৈতন্যের বাইরে ও তা থেকে স্বতন্ত্রভাবে এক চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক নীতি বিরাজ করে, আর শেষোক্তটি বিষয়ীর চৈতন্যের বাইরে কোনো বাস্তবের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, অথবা তাকে গণ্য করে তার ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত একটা কিছু হিসেবে। চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক নীতিকে কীভাবে বুঝতে বলা হয়, তদনুযায়ী ভাববাদের রূপ বহুবিধ: এক সার্বিক ধীশক্তি (Panlogism বা সর্বযুক্তিবাদ) অথবা সার্বিক ইচ্ছাশক্তি (ইচ্ছাবাদ) হিসেবে, একটি আধ্যাত্মিক

পদার্থ (ভাববাদী অদ্বৈতবাদ) অথবা বহু আধ্যাত্মিক উপাদান হিসেবে (নানাত্ববাদ), এক যুক্তিসহ ও যুক্তিগতভাবে জ্ঞেয় নীতি হিসেবে (ভাববাদী যুক্তিবাদ), সংবেদনসমূহের বৈচিত্র্য হিসেবে (ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদ ও ইন্দ্রিয়বাদ, প্রপঞ্চবাদ), কিংবা কোনো নিয়ম-শাসিত নয় এমন এক অযৌক্তিক শক্তি হিসেবে, যা বৈজ্ঞানিক অবধারণার একটি বিষয় হতে পারে না (অ-যুক্তিবাদ)।

শীর্ষস্থানীয় বিষয়মুখ ভাববাদীদের মধ্যে পড়েন: প্রাচীন দর্শনে প্লেটো, প্লোটিনাস ও প্রোক্লাস এবং আধুনিককালে ভিল্‌হেল্‌ম লেইবনিৎজ, ফ্রিডরিখ ভিল্‌হেল্‌ম শিলিং ও গিয়র্গ ভিল্‌হেল্‌ম ফ্রিডরিখ হেগেল। বিষয়ীমুখ ভাববাদ সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় জর্জ বার্কলে, ডেভিড হিউম ও জোহান গটলিব ফিখ্‌টের (১৮শ শতাব্দী) মতবাদে। আমাদের যুগে বুর্জোয়া দর্শনে যে সমস্ত ভাববাদী ধারা প্রাধান্যশালী সেগুলির মধ্যে আছে নব্য দৃষ্টবাদ, অস্তিত্ববাদ, প্রপঞ্চবাদ ও নব্যটমবাদ। মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের দার্শনিক ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, সর্বপ্রকার ভাববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিকশিত হয়েছে ও হচ্ছে।

ভাবাদর্শ — রাজনৈতিক, আইনগত, নীতিশাস্ত্রগত, ধর্মীয়, নান্দনিক ও দার্শনিক মত ও ধারণাতন্ত্র, যা বাস্তবের প্রতি মানুষের মনোভাবের প্রকাশ ও মূল্যায়ন ঘটায়। শ্রেণীভিত্তিক সমাজগুলিতে, ভাবাদর্শের একটা

শ্রেণীচরিত্র থাকে, তা নির্দিষ্ট শ্রেণীগুলির স্বার্থ প্রকাশ করে ও লক্ষ্য নির্ণয় করে; তা বিশদীকৃত হয় পূর্ববর্তী চিন্তকদের সঞ্চিত উপকরণের ভিত্তিতে সেই শ্রেণীগুলির ভাবাদর্শীবিদদের দ্বারা। একটি ভাবাদর্শের চরিত্র — বৈজ্ঞানিক অথবা অবৈজ্ঞানিক, সত্য বা ভ্রান্ত, অধ্যাসমূলক — সর্বদাই যুক্ত থাকে তার শ্রেণীগত উৎসের সঙ্গে: সামন্ততান্ত্রিক, বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া বা প্রলেতারীয়; সমাজতান্ত্রিক, মার্কসবাদী; বিপ্লবী বা প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতিশীল বা রক্ষণশীল। তা আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন এবং সমাজের উপরে এক সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে তার বিকাশকে ত্বরান্বিত অথবা বিঘ্নিত করে। সত্যকার বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ভাবাদর্শসমূহের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বা 'ভাবাদর্শবিলোপের' ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে।

ভাষা — ১) স্বাভাবিক ভাষা, মানুষের ভাবের আদানপ্রদানের উপায়। ভাষা চিন্তা থেকে অবিচ্ছেদ্য, এবং তথ্য সঞ্চয় ও স্থানান্তরিত করার এক সামাজিক বাহন, মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়। তা বাস্তবায়িত হয় ও বিদ্যমান থাকে বাচনে। গঠনকাঠামো, শব্দভাণ্ডার, প্রভৃতির দিক দিয়ে পৃথিবীর ভাষাগুলির পার্থক্য আছে, কিন্তু সব ভাষাই কতকগুলি অভিন্ন সমানুবর্তিতা দিয়ে, ভাষার এককগুলির এক প্রণালীবদ্ধ সংগঠন (যেমন সেগুলির মধ্যেকার প্রকৃতি-প্রত্যয় উদাহরণগত ও বাক্যগঠনবিধি

সংক্রান্ত সম্পর্ক), ইত্যাদি দিয়ে চিহ্নিত। কালক্রমে ভাষাগুলি পরিবর্তিত হয় ও কথিত ব্যবহার-বহির্ভূত হয়ে যেতে পারে (মৃত ভাষা)। ভাষার বৈচিত্র্য (জাতীয় ভাষা, সাহিত্যিক ভাষা, উপভাষা, ইত্যাদি) সমাজের জীবনে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে; ২) যে কোনো সংকেতপ্রণালী, যেমন গাণিতিক ভাষা, অঙ্গভঙ্গির ভাষা, চলচ্চিত্রের ভাষা, ইত্যাদি; ৩) শৈলীর সমার্থক (একটি উপন্যাসের ভাষা, সংবাদপত্রের ভাষা)।

মতান্ধতা (Dogmatism) — অধিবিদ্যাগতভাবে একপেশে, ছকে-বাঁধা ও শিলীভূত চিন্তা, যা কাজ করে অন্ধ মতগুলি নিয়ে। মতান্ধতার ভিত্তি হল কোনো কর্তৃত্বক্ষমতায় অন্ধ বিশ্বাস এবং অচল-সেকেলে প্রতিজ্ঞাগুলি সমর্থন, সাধারণত ধর্মীয় চিন্তায় চিহ্নিত। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে মতান্ধতার ফলে দেখা দেয় মার্কসবাদের বিকৃতিসাধন, দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ও রাজনৈতিক হঠকারিতা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মতান্ধতার মোকাবিলা করে তত্ত্বের সৃষ্টিশীল বিকাশ ও মূর্ত সত্যের দ্বান্দ্বিক নীতি দিয়ে।

মহাবিশ্ব (The Universe) — সমগ্র বিদ্যমান বস্তুজগৎ, কালে চিরন্তন, স্থানে অসীম এবং বস্তু-কর্তৃক তার বিকাশের ধারায় পরিগৃহীত রূপগুলিতে অন্তহীনভাবে বিচিত্র। জ্যোতির্বিদ্যা যে মহাবিশ্বের অধ্যয়ন করে, তা হল বস্তুজগতের একটি অংশ,

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যাগত সরঞ্জামাদি দিয়ে যার অনুসন্ধান করা যায় (মহাবিশ্বের সেই অংশটিকে প্রায়শই, অভিহিত করা হয় মেটাগ্যালাক্সি বা অধি-ছায়াপথ বলে)।

মানদণ্ড (Criterion) — একটি প্রলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য যার ভিত্তিতে কোনো কিছুর মূল্যায়ন, সংজ্ঞার্থনির্ণয় যা শ্রেণীবদ্ধকরণ হয়; বিচারের মান।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ — শ্রমিক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শ, দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক অভিমতের এক অখণ্ড ও বিকাশশীল মততন্ত্র। প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার বিকাশের বিশ্বজনীন নিয়মগুলি, সামাজিক উৎপাদন বিকাশের নিয়মগুলি সম্পর্কে এক বিজ্ঞান হিসেবে, সামাজিক ও জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েত ও অন্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের মুক্তি সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক কমিউনিস্ট নির্মাণকর্মের নিয়মগুলি সম্পর্কে এক বিজ্ঞান হিসেবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল অবধারণার এবং সমাজের নতুন ও উচ্চতর রূপগুলি বৈপ্লবিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতিতত্ত্বগত ভিত্তি।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকাতলে যে সমস্ত রূপান্তর ঘটেছে সেগুলি আজকের দিনের পৃথিবীর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব, সোভিয়েত ইউনিয়নে এক সমাজতান্ত্রিক

সমাজ নির্মাণ, সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায় গঠন ও তার বিকাশ, সামাজিক ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, এবং পুরনো সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের অর্জিত বিজয়গুলির সঙ্গে তা সম্পর্কিত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মানবজাতির বিকাশের উপরে ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করে।

মিথষ্ক্রিয়া (Interaction) — একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, বিষয়সমূহ একটি আরেকটির উপরে যেভাবে ক্রিয়া করে সেই প্রক্রিয়া, সেগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আরেকটির দ্বারা একটি বিষয়ের জননকে প্রতিফলিত করে। মিথষ্ক্রিয়া হল গতি ও বিকাশের এক বিষয়গত ও সার্বিক রূপ, তা যে কোনো বস্তুগত ব্যবস্থাপ্রণালীর অস্তিত্ব ও গঠনকাঠামোগত সংগঠন নির্ধারণ করে।

মূর্ত (concrete) — একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, তাতে বহুবিধ সমস্ত সংযোগ ও সম্পর্কসহ একটি বস্তুর ঐক্য ও অখন্ডতা প্রকাশ করা হয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে, কথাটি ব্যবহৃত হয় দুই অর্থে: একটি সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ সমগ্র হিসেবে এবং বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার্থগুলির এক প্রণালীতন্ত্র হিসেবে, যা বস্তুনিচয়ের সারগত সংযোগ ও সম্পর্ক ব্যাপারসমূহের বিকাশে সমানুবর্তিতা ও প্রবণতাগুলি প্রকাশ করে। মূর্ত হল বিমূর্তের বিপরীত; তত্ত্বগত অবধারণা হল বিমূর্ত থেকে মূর্ততে আরোহণ।

মূল প্রত্যয় (category, গ্রীক katēgoria: নিশ্চিত উক্তিকরণ থেকে) — সবচেয়ে সামান্য ও বুনিয়াদি প্রত্যয়সমূহ, যাতে বাস্তবের ব্যাপার ও অবধারণার সারগত ও সার্বিক গুণ-ধর্ম ও সম্পর্কগুলি প্রতিফলিত হয়। মূল প্রত্যয়গুলি অবধারণার সামাজিক কর্মপ্রয়োগের সত্যকার বিকাশের সামান্যীকরণের ফল। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রধান প্রধান মূল প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হল বস্তু, গতি, স্থান ও কাল, গুণ ও পরিমাণ, বিরোধ, কার্য-কারণ সম্বন্ধ, আবশ্যিকতা ও আপতিকতা, আধেয় ও আধার, সম্ভাবনা ও বাস্তব, অন্তঃসার ও বাহ্যিক রূপ, ইত্যাদি। বিষয়গত বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দ্বান্দ্বিক মূল প্রত্যয়গুলির ব্যবস্থাতন্ত্রও বিকশিত ও সমৃদ্ধ হচ্ছে।

রোমান ক্যাথলিকবাদ — খ্রীষ্টধর্মের অন্যতম প্রধান শাখা। ইতালি, স্পেন, পোর্তুগাল, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, অস্ট্রিয়া ও লাতিন আমেরিকায় প্রধান ধর্ম। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রোমান ক্যাথলিকদের প্রাধান্য আছে পোলান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া ও কিউবায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে রোমান ক্যাথলিকরা আছে বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলিতে (অধিকাংশই লিথুয়ানিয়ায়), বেলোরুশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে ও ইউক্রেনে। ১০৫৪ থেকে ১২০৪, এই কালপর্বে খ্রীষ্টীয় চার্চ রোমান ক্যাথলিক ও অর্থডক্স চার্চে বিভক্ত হয় ও ১৬শ শতাব্দীতে, প্রোটেস্ট্যাণ্টবাদ রোমান ক্যাথলিক ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে যায়। রোমান ক্যাথলিক চার্চ

কঠোরভাবে কেন্দ্রীভূত ও সোপানবিন্যস্ত; তার রাজতান্ত্রিক কেন্দ্র হল পোপ পদ, রোমের পোপ তার সার্বভৌম অধীশ্বর ও ভাটিকান পোপ পদের সদরদপ্তর। তার ধর্মমতের উৎস হল ধর্মশাস্ত্রসমূহ ও খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য। রোমান ক্যাথলিকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ হল (মুখ্যত, অর্থডক্সির তুলনায়) খ্রীষ্টীয় ধর্মমতে 'ফিলিওকভে' বা ঈশ্বরপুত্রের ধারণা সংযোজন (ট্রিনিটি বা ত্রয়ী: পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা, ঈশ্বরের এই তিন রূপ সংক্রান্ত ধর্মমত); কুমারী মেরী মাতা কর্তৃক মানুষের আদিমতম পাপ ছাড়াই গর্ভসঞ্চার ও তাঁর স্বর্গারোহণ, পোপের অভ্রান্ততা সংক্রান্ত মত; যাজক সম্প্রদায় ও অযাজকীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড প্রভেদ; এবং চিরকৌমার্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির ফলে রোমান ক্যাথলিকবাদ সমেত ধর্মের এক সংকট দেখা দেয়। ১৯৬০-এর দশকের পর থেকে রোমান ক্যাথলিক চার্চ তার ধর্মমতগুলিকে, উপাসনা সংক্রান্ত আচারপ্রথা, সংগঠন ও কর্মনীতিকে আধুনিক করে সেই সংকট কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে।

লাফ, উল্লম্ফন — বিকাশে এক আমূল অগ্রগমন, পরিমাণগত পরিবর্তনসমূহের ফলে একটি বিষয় বা ব্যাপারের গুণগত রূপান্তর। দুটি মোটামুটি নির্দিষ্ট ধরনের লাফ আছে: আকস্মিক (যেমন কোনো কোনো প্রাথমিক কণিকার অন্যান্য কণিকায় রূপান্তর) ও ক্রমান্বিত (যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতিতে গুণগত

পরিবর্তন)। সামাজিক জীবনে, প্রথম ধরনের লাফ হল বৈরভাবাপন্ন গঠনরূপগুলির বিশিষ্ট লক্ষণসূচক (সামাজিক সংক্ষোভ, বিপ্লব); এবং দ্বিতীয় ধরনের লাফ হল সমাজতন্ত্রের বিশিষ্ট লক্ষণসূচক, যেখানে সমাজে গুণগত পরিবর্তনগুলি সামাজিক স্বার্থের ঐক্যহেতু ক্রমান্বিত।

শর্ত (Condition) — যার উপরে অন্য কোনো কিছু নির্ভর করে; এক প্রস্ত বিষয়ের (বস্তুনিচয়, সেগুলির দশা বা মিথস্ক্রিয়া) সারগত অঙ্গীয় উপাদান, যার সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ব্যাপারের অস্তিত্ব আবশ্যিকভাবেই জড়িত।

সংবেদন — ইন্দ্রিয়গুলির উপরে অভিজ্ঞতা ও মস্তিষ্কের উত্তেজনের ফলস্বরূপ বিষয়গত বাস্তবের গুণ-ধর্মগুলির এক প্রতিফলন; মানুষের পৃথিবী-অবধারণায় যাত্রাবিন্দু। সংবেদনগুলি স্পর্শানুভূতিগত, দৃষ্টিসংক্রান্ত, শ্রবণগত, ঘ্রাণ সংক্রান্ত, স্পন্দন সংক্রান্ত, প্রভৃতি হতে পারে। বিভিন্ন সংবেদনের গুণগত সুনির্দিষ্টতাসমূহ সেগুলির প্রকারাত্মকতার মাত্রা বলে পরিচিত।

সংযোগ (Connection) — স্থানে ও কালে পৃথকীকৃত ব্যাপারসমূহের এক পরস্পরনির্ভরশীলতা। সংযোগগুলি শ্রেণীবদ্ধ করা হয় বস্তুর গতির রূপ দিয়ে, নির্ধারকতার রূপ দিয়ে (সরল, সম্ভাব্যতা ও

পরস্পরসম্পর্কগত), শক্তি দিয়ে (কঠোর অথবা সূক্ষ্ম কণিকাকার), ফল দিয়ে (জনন, রূপান্তর), কর্মফলের গতিমুখ দিয়ে (সরাসরি অথবা বিপরীত), নির্ধারিত প্রক্রিয়ার ধরন দিয়ে (কার্যিক, বিকাশগত, নিয়ন্ত্রণ), বিষয়ের আধেয় দিয়ে (যা পদার্থ, শক্তি বা তথ্যের এক স্থানান্তর নিশ্চিত করে।)

সংশ্লেষণ (Synthesis, গ্রীক syntithenai: একত্র করা থেকে) — বিভিন্ন উপাদানকে মানসিকভাবে ও বাস্তবে মিলিত করে এক সমগ্রে (প্রণালীতন্ত্র) পরিণত করা; সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ (বিভিন্ন উপাদানে ব্যবচ্ছেদ) থেকে অবিচ্ছেদ্য।

সজীব জড়বাদ (Hylozoism, গ্রীক hyle, জড়বস্তু ও zoe, জীবন থেকে) — সমস্ত জড়পদার্থ সজীব, এই দার্শনিক মতবাদ। গোড়ার দিকের গ্রীক দর্শনের (আইওনীয় ধারা, এম্পেডেক্লস), কিছুটা পরিমাণে স্টোয়িকবাদের, রেনেসাঁসের সময়কার প্রাকৃতিক দর্শনের (বের্নার্দিনো তেলেসিও, জোর্দানো ব্রুনো পারাসেলসাস), দেনিস দিদেরো সহ ১৮শ শতাব্দীর কয়েকজন ফরাসী বস্তুবাদীর, ফ্রিডরিখ শিলিংয়ের প্রাকৃতিক দার্শনিক ধারা, প্রভৃতির এটাই ছিল বৈশিষ্ট্য।

সত্তা (Being) — একটি দার্শনিক মূল প্রত্যয়, যার দ্বারা মানবচৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে বিষয়গত জগৎ, বস্তু ও প্রকৃতির অস্তিত্ব বোঝায় এবং সমাজে বোঝায়

বস্তুগত জীবনের প্রক্রিয়া। সত্তা ও চৈতন্যের পরস্পরসম্পর্ক দর্শনের বুনিয়াদি প্রশ্ন।

সত্তাতত্ত্ব (ontology, গ্রীক onto: সত্তা, অস্তিত্ব ও logos: শব্দ থেকে) — সত্তায় দার্শনিক তত্ত্ব (জ্ঞানতত্ত্বের প্রতিতুলনায়), তার বিবেচ্য হল সত্তার সার্বিক ও মূল নীতিসমূহ; তার গঠনকাঠামো ও নীতিগুলি)। ১৯শ শতাব্দী অবধি, সত্তাতত্ত্বের ভিত্তি ছিল বস্তুনিচয়ের অভ্যন্তরস্থ অন্তঃসার সম্বন্ধে আধিবিদ্যক ধ্যানধারণা, এবং তা ছিল দূরকল্পী চরিত্রের। সত্তাতত্ত্বের সেই উপলব্ধিকে মার্কসবাদ কাটিয়ে উঠেছিল এবং সত্তাতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যার আবশ্যিক সংযোগ ও ঐক্য প্রদর্শন করেছিল।

সত্য — অবধারণাকারী বিষয়ীর দ্বারা বাস্তবের বিষয় ও ব্যাপার সমূহের এক যথোপযুক্ত প্রতিফলন; সেগুলি বাইরে ও মানবচৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে যেভাবে বিদ্যমান, বিষয়ী সেগুলিকে সেইভাবেই পুনরুপস্থাপিত করে; মানবজ্ঞানের বিষয়গত অন্তর্বস্তু। বিষয়গত সত্য হল সেই সত্য যার আধেয় মানুষ বা মানবজাতির উপরে নির্ভর করে না (মানুষের মানসিক ক্রিয়াকলাপের ফলে সত্য আধেয়তে বিষয়গত, কিন্তু আধারে বিষয়ীগত); আপেক্ষিক সত্য হল সেই সত্য যা একটি বিষয়কে প্রতিফলিত করে শুধু আংশিকভাবে, ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে; অনাপেক্ষিক সত্য হল সেই সত্য যা অবধারণার বিষয়টিকে

সম্পূর্ণভাবে বিশদ করে, তা হল বাস্তবের কোনো কোনো দিক সম্বন্ধে চূড়ান্ত জ্ঞান। যেকোনো আপেক্ষিক সত্যের মধ্যেই থাকে অনাপেক্ষিক জ্ঞানের একটি উপাদান। সত্য হল আপেক্ষিক সত্যগুলির এক যোগফল। মূর্ত সত্য হল সেই সত্য যা বিষয়টির কোনো কোনো সারগত উপাদান প্রকাশ করে তার বিকাশের মূর্ত অবস্থাগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে (কোনো বিমূর্ত সত্য নেই, সত্য সর্বদাই মূর্ত)। কর্মপ্রয়োগ হল সত্যের মানদণ্ড।

সত্যের মানদণ্ড — জ্ঞানের সত্যতা স্থির করার ও ভ্রান্তি থেকে সত্যকে পৃথক করে বোঝার এক পদ্ধতি। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ধরে নেয় যে কর্মপ্রয়োগই বিষয়গত পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের একমাত্র প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং সেটাই অবধারণা ও সত্যের মানদণ্ডের একমাত্র ভিত্তি।

সর্বপ্রাণবাদ (Animism, লাতিন anima: শ্বসন, আত্মা থেকে) — আত্মা ও অধ্যাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, যে কোনো ধর্মের একটি আবশ্যিক উপাদান।

সারগ্রাহিতা (Eclecticism, বা eclectics, গ্রীক eklegein: বাছাই করা থেকে) — বহুবিধ ও প্রায়শই বিপরীত সব নীতি, অভিমত তত্ত্ব, শৈল্পিক উপাদান, প্রভৃতির এক যান্ত্রিক মিলন; স্থাপত্যে ও কলাশিল্পে নানাধর্মী শৈলীর মিলন অথবা গুণগতভাবে পৃথক

অর্থ ও উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ইমারত বা হস্তশিল্পের ডিজাইনিংয়ে যথেচ্ছভাবে শৈলী নির্বাচন (যেমন ১৯শ শতাব্দীর স্থাপত্য ও কলাশিল্পে ঐতিহাসিক শৈলীর ব্যবহার)।

সারপদার্থ (Substance, লাতিন substantia: অন্তঃসার, তলায় অবস্থিত থেকে) — ১) বিষয়গত বাস্তব; গতির সমস্ত রূপের ঐক্যে বস্তু; যা আপেক্ষিকভাবে স্থিতিশীল; যা স্বকীয়ভাবে বিদ্যমান ও অন্য কিছুর উপরে নির্ভর করে না; ২) বিরামরত জড়পিন্ডবিশিষ্ট (পরমাণু, অণু ও সেগুলির সম্মিলন) স্বতন্ত্র (এককভাবে পৃথক) উপাদানসমূহ নিয়ে গঠিত এক ধরনের বস্তু।

সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপ — যে ক্রিয়াকলাপ গুণগতভাবে নতুন কিছুর জন্ম দেয়, এবং সামাজিক ঐতিহাসিক দিক দিয়ে যা মৌলিক ও অনন্য। এটি বিশেষভাবেই মানবিক ক্রিয়াকলাপ, কেননা সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন হিসেবে একজন স্রষ্টা তাতে পূর্বানুমিত; প্রকৃতিতে বিকাশ আছে কিন্তু সৃষ্টিশীলতা নেই।

স্থান ও কাল (Space and time) বস্তুর অস্তিত্বের সার্বিক রূপ। স্থান হল বস্তুগত বিষয় ও প্রক্রিয়াসমূহের অস্তিত্বের রূপ, বস্তুগত ব্যাবস্থাপ্রণালীগুলির গঠনকাঠামো ও বিস্তৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে; কাল

হল ব্যাপারসমূহের পারম্পর্যের ও বস্তুর দশাগুলির একটি রূপ, সেগুলির স্থায়িত্বকালের বৈশিষ্ট্যনির্ণয় করে। স্থান ও কাল বিষয়গত, বস্তু থেকে অবিচ্ছেদ্য, তার গতির সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, এবং পরিমাণগত ও গুণগত দিক দিয়ে অসীম। কালের সার্বিক গুণ-ধর্মগুলি হল স্থায়িত্বকাল, অ-পুনঃসংঘটনশীলতা ও অপরিবর্তনীয়তা, এবং স্থানের সার্বিক গুণ-ধর্মগুলি হল ধারাবাহিকতা ও ছেদের বিস্তৃতি ও ঐক্য।

স্থূল বস্তুবাদ (Vulgar materialism) — ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের বুর্জোয়া দর্শনে একটি মতধারা, যার প্রতিনিধিরা (কার্ল ফগ্‌ট, লুডভিগ বুখনের, জাকব মলেশট) পৃথিবী সম্বন্ধে বস্তুবাদী অভিমতের সরলীকরণ ঘটিয়ে এক চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, চৈতন্যের সুনির্দিষ্টতাগুলি অস্বীকার করেছিলেন এবং তাকে বস্তুর সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন ('মস্তিষ্ক চিন্তা নিঃসরণ করে ঠিক যেমন যকৃৎ নিঃসরণ করে পাচকরস')। এঙ্গেলস 'Anti-Dühring' রচনায় স্থূল বস্তুবাদের সমালোচনা করেছেন।

স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদ (Spontaneous materialism) — প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বস্তুবাদ, একটি ঐতিহাসিক-দার্শনিক ধারণা, যা বোঝায় এক 'সহজ প্রবৃত্তিগত ... দার্শনিকভাবে অচেতন মতপ্রত্যয়, বাহ্যিক জগতের বিষয়গত বাস্তব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের

ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যা পোষণ করে' (লেনিন)। স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদ একপেশে, অধিযন্ত্রবাদী বস্তুবাদের কাঠামোর বাইরে যায় না। সেই সঙ্গে, এই বস্তুবাদ এমন বহু শীর্ষস্থানীয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর দার্শনিক অভিমতের বৈশিষ্ট্য, যাঁদের আবিষ্কারগুলি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিত

জ. বেরবেশকিনা, ল. ইয়াকভলেভা, দ. জেরকিন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী? ('সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ' গ্রন্থমালা)

আলোচ্য বইটির উদ্দেশ্য জনবোধ্য আকারে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণারর সারকথাকে পেশ করা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল বর্গসমূহ ও নিয়মাবলীর স্বরূপ উন্মোচন এবং রোজকার বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নানা অবস্থানের তাৎপর্যের প্রতি জোর দেওয়া।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বুনিয়াদী অবস্থানগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছুক পাঠকদের জন্যই বইটি লেখা হয়েছে।

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

কিরিলেঙ্কো গ., করশুনভা ল.। ব্যক্তিত্ব কী। (সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ)।

মানুষের নিয়তি ও মর্মবস্তু কী?

সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারটি অতীতে কীভাবে আলোচিত হয়েছে ও আজ কীভাবে দেখা হচ্ছে?

ব্যষ্টির ক্রিয়াকলাপের চারিত্র্য কী?

মানুষের অন্তর্জগৎ বলতে কী বোঝায়?

বিভিন্ন ধরনের বিশ্ববীক্ষা কীভাবে স্থাপিত হয়?

ব্যক্তির বৈষয়িক ও আত্মিক চাহিদা বলতে কী বোঝায়?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর আপনারা পেতে পারবেন এই বইয়ে।

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

সমাজবিদ্যার পাঠ-সংকলন। (সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ গ্রন্থমালা)

কার্ল মার্কস, ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস ও ভ. ই. লেনিনের মৌলিক প্রবন্ধাবলীর এই সংকলনে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের তিনটি উপাদান — বস্তুবাদী দর্শন, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং এইসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের দলিলপত্র অন্তর্ভুক্ত।

বইটি উন্নয়নশীল দেশের ব্যাপক পাঠকসাধারণের উপযোগী।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

31st July 1997

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-ক-খ

গ্রন্থমালায় আছে এই বিষয়ে বইগুলি:

- সমাজবিদ্যার পাঠ-সংকলন
- মার্কসবাদ-লেনিনবাদ
- অর্থশাস্ত্র কী
- দর্শন কী
- বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম
- দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী
- ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?
- পুঁজিতন্ত্র কী
- সমাজতন্ত্রে কী বোঝায়
- কমিউনিজম কী
- শ্রম কী
- উদ্বৃত্ত-মূল্য কী
- সম্পত্তি-মালিকানা কী
- শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম কী
- বিপ্লব কী
- উত্তরণ পর্ব কী
- ট্রেড ইউনিয়ন কী
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব কী
- ব্যক্তিত্ব কী
- সমাজবিদ্যার সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ

ISBN 5-01-001402-5